সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাট

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোৎস্না, মমতা, প্রীতি, সাবিত্রী,
শেফালি আর রেখাকে—

ঘাট থেকে উঠে আসা কর্কশ, আবিল শব্দে তার ঘুম ভাঙল। যে দুটো কণ্ঠস্বর পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত একটা তার মা ভবানীর, অন্যটা সৎমা চন্দ্রার। লেপের মধ্যে কুঁকড়ে থাকা শরীরটাকে তুলে জানলার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দিয়ে সীতা দেখল ঘাটে ছোটখাটো একটা ভিড়। অবশ্য ভিড়টা ভবানী ও চন্দ্রার কাজিয়া শোনার জন্য ওখানে জড়ো হয়নি। তার নিজের দুই ভাই গৌরাঙ্গ ও অনন্ত মাঘের শীতের এই সকালে নিত্যদিনই ঘুম থেকে উঠে ঘাটের ভাঙা বেদিতে বসে কিছুক্ষণ রোদ্দুর পোহানোর পর প্রাত্যহিকতায় তৎপর হয়।

তার ছোট বোন পুতুল এবং দুই সৎভাইবোন মালা আর পল্টু—সকলেই এই সময় ঘাটের কাছাকাছিই থাকে। কেউ হয়তো নিমের দাঁতন চিবিয়ে চিবিয়ে ছাতু করে ফেলছে, কেউ দুই হাঁটু জড়ো করে বসে জলে মাছের ঘাই মারা দেখছে তো দেখছেই। পুতুলকে আজ দূরের কুলটা বিলের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখল সীতা। শীতটা জমিয়ে পড়তে সেখানে এসে নেমেছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিনদেশি পাখি, সাদা-গোলাপি, বেগুনি-কালো, শুধু হলুদ, শুধু সাদা—গ্রামের মাথার দিকে বিলটার এখন বাহার কী! কাছাকাছি গেলে পাখির ডাকে কানে তালা লেগে যাবে! পাখিগুলো এক দণ্ড স্থির থাকতে পারে না, দূর থেকে দেখলে মনে হয় সারাক্ষণ তোলপাড় হচ্ছে একটা। বহু-বহু যুগ আগে কে এক কুলভ্রষ্টা এই বিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এর জলকে কলঙ্কিত করেছিল বলে এই বিলের নাম সেই ইস্তক 'কুলটা বিল'। সেই বিলই এখন গ্রামের মাথার মুকুট। এই শীতে শহর থেকে লোকে বাসে করে এসে দেখে যাচ্ছে বিদেশি পাখিদের। ছবি তুলছে। ভুবন চক্রবর্তীর আমবাগানে পিকনিক করছে, আবার চলে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ভুবন চক্রবর্তীর ছেলেরা এবার আমবাগানখানা বেচেই দেবে শহরের কোনও প্রমোটারকে। সে লোকটা হোটেল টোটেল বানিয়ে ব্যাবসা ফেঁদে বসবে এখানে!

নিজের ভাইবোনদের ছাড়াও সীতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখতে পেল ঘাটে। আঙুলের গুড়াকু মুখে পুরতে পুরতে বিষ্ণুদি বালতি নিয়ে জলে নেমে যাচ্ছে। এখন শেষ ধাপটায় বসে কাপড় কাচবে, গা মলবে, গুনগুন করে গানও গাইবে, "অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে, ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি...!" সে বিষ্ণুপ্রিয়াকে জিজ্ঞেস করেছে কতবার, "এই শীতে যে এত সকালে স্নান করো তোমার ঠান্ডা লাগে না বিষ্ণুদি?"

না, বিষ্ণুপ্রিয়ার ঠান্ডা লাগে না, বোধহয় রসের গান উত্তাপ জোগায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বিষ্ণুপ্রিয়া বড়ই কৃষ্ণপ্রেমে মজে থাকা মেয়ে; এই যে ভবানী আর চন্দ্রা ভোর হতে না হতে ঝগড়ায় নেমে পড়ল কোমর বেঁধে, বিষ্ণুদির তা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই, কানই দেবে না!

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, তার আপন ও সৎমা দু'জনেই বহু লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই বাকবিতণ্ডায় অগ্রসর হয়। কিন্তু যখন চারপাশে বাইরের লোক কেউ নেই, এ পক্ষ বা ও পক্ষের ছেলেমেয়েরাও কেউ নেই, তখন তার গর্ভধারিণী ভবানী বা বাবার দ্বিতীয় পক্ষ চন্দ্রা—এই দুই কলহপ্রিয়া সতিন এমন চুপ করে যায় যে, সন্দেহ জাগে উভয়ে তারা বাড়িতে উপস্থিত কি না, তা নিয়ে। এমনকী সন্ধে

উত্তীর্ণ হওয়া এক দিনের এক মুহূর্তে উঠোনে পা দিয়ে ঘর থেকে ভেসে আসা চাপা কান্নার শব্দ শুনে সীতা যখন নিঃসাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দরজায়, দেখেছিল উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে কাঁদছে চন্দ্রা আর চন্দ্রার পিঠের ওপর হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ভবানী! তাকে দেখতে পেয়ে ভবানী তৎক্ষণাৎ সরে গিয়েছিল। সীতার মনে হয়েছিল দু'জনের মধ্যে এক গূঢ় সম্পর্ক আছে এবং চন্দ্রা বা ভবানী কেউই তা প্রকাশ্যে আনতে চায় না! সে দিন রাতেই তো ভাত বাড়া নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল ওদের, ভবানী নাকি পল্টু, মালার থালায় সব সময় কম ভাত দেয়। রাগের চোটে নিজের ভাত, ডাল, তরকারি ভবানী উলটে দিয়ে এল কুয়োতলায়, ভুলো কুকুর সঙ্গে সঙ্গে এসে খেতে লাগল সেগুলো! কিন্তু সে দিন সীতা মায়ের পক্ষ নিয়ে আর একটা কথাও বলেনি চন্দ্রাকে, তারপর থেকে পারতপক্ষে বলেনি বলা যায়! তবে চন্দ্রা আর ভবানী দিনরাত এত কাজিয়া করে যে, সেই সন্ধেরাতের দৃশ্য আজ সীতা ভাবে বোধহয় চোখের ভুল।

এই সতেরো ছুঁই ছুঁই বয়েসে ভবানী ও চন্দ্রার ভিতরকার সম্পর্কের রহস্যটা কী, তাই নিয়ে সীতার আগ্রহ অনেক ফিকে এখন।

লেপ সরিয়ে তক্তাপোশ থেকে নেমে পড়ল সীতা। আলনায় ফেলে রাখা গরম চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে নিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দালানে পৌঁছে বড়সড় হাই তুলল একটা, তারপর দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো তাক থেকে মাজন আর ব্রাশ নিয়ে উঠোন পার হয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে নেমে গেল পুকুরঘাটে। সীতা গিয়ে দাঁড়াতেই ভবানী তার আপাদমস্তক রাগত চোখ বুলিয়ে বলল, "কী, মহারানির ঘুম ভাঙল?" উত্তরের অপেক্ষা না করে সদ্য ধোয়া এক বালতি কাপড় নিয়ে উঠে আসতে লাগল ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে এবং এই সময় চন্দ্রা এসে দাঁড়াতে চন্দ্রাকে পাশ কাটাতে কাটাতে থুঃ করে থুতু ফেলল একেবারে চন্দ্রার পায়ের কাছে। লাফিয়ে উঠে শাসাল চন্দ্রা ভবানীকে, "এই থুতু যদি আজ ভাতের থালায় ফেরত না দিয়েছি তো আমার নাম চন্দ্রা নয়!" ভবানী একটিও বাক্য ব্যয় না করে খিড়কির দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল বাড়ির ভিতর।

সীতা আর ক্ষণকালও দাঁড়াল না ওখানে, পুকুর ঘুরে বারোয়ারি টিউকল তলায়একবারও পিছনে না তাকিয়ে পৌঁছে গেল সে। মুখ ধুল, চোখে জলের ঝাপটা দিল, ব্রাশটা গুঁজে রাখল চুলে তারপর সটান এসে দাঁড়াল অঞ্জনদাদের বাড়ির উঠোনে। আসার পথে কঙ্কালীতলায় সাইকেল স্ট্যান্ডের গায়ে দাঁড়ানো বড়-বড় গাড়ি চোখে পড়ল তার, গাড়িভরতি সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা নারী, পুরুষ, শিশুর দল। কেশবের চায়ের দোকান থেকে চা খাচ্ছে তারা। পিকনিক পার্টি। সরস্বতী পুজোর দিন, ছুটি, বিলের পাখি দেখতে এসেছে এরা বিধুপুর। এখন বোধহয় আটটাও বাজেনি, আর একটু বেলা বাড়ল আরও দলে দলে আসবে।

অঞ্জনদাদের বাড়িটা এ পাড়ায় যে দু'-চারখানা ঝকঝকে বাড়ি আছে, তার মধ্যে একটা। তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে বিশাল বাঁধানো উঠোন। তারপর দোতলা দালানকোঠা, লাল সিমেন্টের মেঝে, তাতে কোথাও এতটুকু চিড়ফাট নেই, পরিচর্যায়-পরিচর্যায় সে মেঝে পুরনো হয়েও নিটোল, তেলতেলে। হালেই একবার রং করানো হয়েছে ঘরদোর, দরজা-জানলায় পিত্তি পিত্তি সবুজ রং। সমস্ত বাড়িতে একটা শান্তি ছড়ানো, অঞ্জনদাদের পুকুরটার জল সব সময় টলটলে পরিষ্কার, ঘেরা পুকুর, বাইরের লোকে ঢুকতে পারে না। বাড়ির সংলগ্ন

জমিটায় গাছগাছালি ভরা। মান্তুর মা সকালে এসেই বাগান ঝেঁটিয়ে তকতকে করে ফেলে। বাড়িটা সাজিয়েগুছিয়ে রাখায় সীতার অবদানও কম নেই। অঞ্জনদার মা সুপ্রভা, যাঁকে জেঠিমা ডাকে সীতা, তিনি কৃষ্ণনগরের মেয়ে। জেঠিমা বলে, 'কৃষ্ণনগরের মানুষ খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে।' ঘরগেরস্থালির যাবতীয় কাজকর্ম সে জেঠিমার কাছেই শিখেছে। পড়াশোনাটা তার কিছুতেই হল না; বাড়ির কাজকর্মই তাই মন দিয়ে শিখেছে সীতা, আর শিখতে শিখতে, জেঠিমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে করতে কবে যেন ভালবেসে ফেলেছে এই বাড়ি, উঠোন, কুয়োতলা, ঠাকুরঘর, ছাদের সিঁড়ি, শূন্য পাখির খাঁচাখানা পর্যন্ত সব! সে বাকি জীবনটা এ সবের মধ্যেই থাকতে চায়। কাজে অকাজে ঘুরে বেড়াতে চায় এ ঘর, ও ঘর।

মনশ্চক্ষে সে দেখেও তাই—পায়ে আলতা ও রুপোর নূপুর, হলুদ শাড়ির আঁচল কোমরে গোঁজা, তরতরিয়ে সে দোতলায় উঠে যাচ্ছে, তারপরেই নেমে যাচ্ছে রান্নাঘরে, তার ব্যস্ততা অশেষ! চায়ের জল ফুটছে উনুনে, অঞ্জনদার এই শীতে দাড়ি কামানোর জন্যে গরম জল চাই, মান্তুর মাকে মুড়ি-তরকারি, রুটি-তরকারি যা হোক কিছু দিতে হবে খেতে, জেঠিমার পুজো সারা, চায়ের জন্য বসে আছে হাপিত্যেশ করে, আর এই সব কিছু তাকে একাই সামলাতে হচ্ছে! তখন অবশ্য অঞ্জনদা আর অঞ্জনদা থাকে না তার মনে, জেঠিমাকে জেঠিমা নয়, মা বলে ডাকে তখন সীতা।

সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছে, তখন যা-যা করতে হবে তাকে তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু থাকবে না, সবই তো সে এখনই করছে। দায়িত্ব কিছু কম নেই এখন তার! ঘুম থেকে উঠে আসতে দেরি হলে অঞ্জনদা বলে, "কোথায় থাকিস বল তো? সাইকেলটা একটু মুছে দে না, বেরোব!" জেঠিমা বলে, "ও সীতা, পালংশাকগুলো তো এরপর নেতিয়ে পড়বে, শিগগিরি ধুয়ে ফ্যাল মা! কেটে বসিয়ে দে!" একদিন এমন আসবে, দিনান্তে এ বাড়ির মায়া কাটিয়ে সীতাকে আর ওই অশান্তি আর পাগলামির অগ্নিকুণ্ডে ফিরে যেতে হবে না, তখন রাত কাটবে তার অঞ্জনদার পুরুষালি বুকের ভিতর, নিরাপদ উষ্ণতায়!

তার এই সব আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা একমাত্র জানা আছে বিষ্ণুপ্রিয়ার, বয়েসে অনেক বড় হলেও বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যতীত জগতে সীতার দ্বিতীয় কোনও বন্ধু নেই। পুতুল তার মায়ের পেটের বোন, বয়েসে দেড় বছরের ছোট—কিন্তু পুতুলের সঙ্গে বরাবরই তার না-ঝগড়া না-ভাবের সম্পর্ক। সুপ্রভা জেঠিমার বাড়িতে সীতার যে এতখানি প্রবেশাধিকার, পুতুলকে যে জেঠিমা কখনও তেমন আদর ভালবাসা দেখায়নি, এই নিয়ে পুতুলের মনে উষ্মা আছে, হিংসে আছে, হয়তো কষ্টও আছে। কিন্তু তাতে সীতার কোনও হাত নেই। এক-একজন মানুষের এক-একজনকে মনে ধরে। সীতা তো সেই কোন ছোটবেলা থেকে জেঠিমার ন্যাওটা ছিল, জেঠিমাই তাকে কোলেপিঠে করে বড় করেছে বলা যায়। জ্যাঠামশাই তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টাও কম করেনি। তার পড়ায় মাথা নেই তাই! তারপর তো জ্যাঠা মারাই গেল। এবং ছোটবেলায় সীতা রাতেও বাড়ি ফিরত না। জ্যাঠার মৃত্যু ইস্তক সে জেঠিমার কাছে শুত, সারাদিন এ বাড়িতেই নাওয়াখাওয়া, ঘুম! অঞ্জনদার চড়থাপ্পড়ের ভয়ে একটু বই নিয়ে বসা। তারপর জেঠিমার বউদি এসে থাকল কিছু দিন, সীতার সামনেই বলেছিল, "যতই হোক, তোমার ঘরে কলেজে-পড়া ছেলে, সীতাকে মোটেও তুমি রাতে থাকতে দিয়ো না সুপ্রভা! পাঁচটা লোকে পাঁচ কথা বলবে!"

জেঠিমা হেসেছিল এ কথা শুনে, "ওমা, আসে যায়, কবে যে সীতা বড় হয়ে গেল চোখেই পড়েনি!"

কথাটা জানাজানি হতে চন্দ্রা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, "দ্যাখো, যার মেয়ে তার হুঁশ নেই। লোকে বলল, এখন ভাল লাগল তো?"

সে আজ চার বছর আগেকার কথা, তখন অঞ্জনদা জেলার কলেজে পড়তে যেত। পাশটাশ করে অঞ্জনদা এখন চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে!

উঠোনে পা রেখেই অঞ্জনদাকে দেখতে পেল সীতা। বগলে একটা বই, লাফিয়ে পেয়ারা পাড়ছে পেয়ারা গাছ থেকে, গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে অঞ্জনদার গালে, কাঁধে। ফরসা রঙে এ যেন সোনার ছোপ। সে মুগ্ধ হয়ে গেল। অঞ্জনদার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সীতা বলে উঠল, "একী, সরস্বতী পুজোর দিন বই পড়তে নেই তুমি জানো না?"

অঞ্জনদা তাকালই না তার দিকে, "তুই সরস্বতীর মর্ম কী বুঝবি রে? পড়াশোনা করলি জীবনে?"

সে গায়ে মাখল না কথাটা, বলল, "জানো, বিদ্যা পালিয়ে যায়?"

"ভাল হয়! মাতব্বরি করিস না তো!"

"মাতব্বরি করার অধিকার তোমার একারই আছে বুঝি?"

"খেয়ে যেন আর কাজ নেই আমার!"

"কী ব্যাপার? আজ যেন খুব খুশি খুশি মেজাজ?"

এই কথার জবাব দিল না অঞ্জনদা তবে মুখটা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অঞ্জনদা তাকে কখনও বলেনি 'ভালবাসি' এই কথাটা, তবে গত কয়েক বছরে অঞ্জনদার দৃষ্টি অনেক বদলেছে তার প্রতি। সে সাজগোজ করলে অঞ্জনদা যে লক্ষ করে তা সীতার জানা আছে। মনে মনে সীতা ভাবে, অঞ্জনদার চাকরি হয়ে গেলেই সুপ্রভা ভবানীর কাছে দু'জনের বিয়ের কথা পাড়বে! বিষ্ণুপ্রিয়াকে সে কতবার জিজ্ঞেস করেছে জমিদার বাড়ির ভাঙা সিঁড়িতে বসে, "বলো না, জেঠিমার মনে কী আছে? জেঠিমা তো তোমাকে সব কথা বলে!

বিষ্ণুপ্রিয়া বলেছে, "তোকে তো বলেছি কতবার, জেঠিমা সব সময় বলে 'সীতার একটা ভাল ঘর, বর হলে আমি খুব শান্তি পাই! সীতার মতো ভাল মেয়ে আর হয় না!' কিন্তু অঞ্জনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে এমন কথা আকারে-ইঙ্গিতেও কখনও বলতে শুনিনি জেঠিমাকে।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই কথা শুনে বারবারই দমে যায় সীতার মন, কিন্তু আশার তরীখানি তবু কিছুতেই ডোবে না।

সে আর দাঁড়াল না। চটপট দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার প্রথম কাজ অঞ্জনদার ঘরের বিছানা তুলে টানটান করে চাদর পেতে দেওয়া। চাদরের ওপর একটা প্ল্যাস্টিকের মাদুর। জেঠিমার নিয়ম, সব ঘরেই খাট, পালঙ্কের ওপর মাদুর বিছানো থাকে। অঞ্জনদার ঘর থেকে জেঠিমার ঘরের দিকে পা বাড়াল সীতা। দ্রুত হাতে মশারি, কম্বল পাট করে ফেলল। দুপুরের দিকে একটু দিবানিদ্রার অভ্যেস আছে জেঠিমার। সেও জেঠিমার পাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমোতে বড় ভালবাসে শীতকালে। জেঠিমার কম্বল নিয়ে টানাটানি করে। জেঠিমা ফড়ফড় করে নাক ডাকতে ডাকতে তখন ধমক দেয়, 'আহঃ, দেখো দেখি, কেমন জ্বালাতন!'

মনে মনে হাসতে হাসতে কম্বলটা পায়ের দিকে ভাঁজ করে রাখল সীতা। বাকি লেপ, মশারি তুলে দিল পালঙ্কের তলায় রাখা ইয়া বড় কাঠের বাক্সে। এই কাজটা করতে গিয়ে সীতার মনে পড়ল কাল বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মীপুজো। জেঠিমা ঠাকুরমশাই ডেকে পুজো করায় ঘটাপটা করে। পাঁচ-সাতজন এয়োকে পান, সুপুরি,

ফলমূলটা হাতে দেয়। সীতাই বিকেলে পাড়া ঘুরে খবর দিয়ে আসে পাড়ার বউঝিদের। ভবানী আর চন্দ্রাও আসে সাধারণত। তবে একসঙ্গে কদাচ নয়!

জেঠিমার লক্ষ্মীপুজো মানে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজো। সিন্নি হয়। পিতলের বাসন আজ দুপুরেই মেজে ফেলতে হবে, তেঁতুল ঘষে।

আগে এই কাজটা মান্তুর মা-ই করত, এখন মান্তুর মায়ের বয়েস হয়ে গেছে। নিজেই এ কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে সীতা। অঞ্জনদার ভাল জামাপ্যান্ট নিজের হাতে কেচে ইস্ত্রি করে সে। জেঠিমার ঠাকুরঘর মুছে দেয়। মান্তুর মাকে দিয়ে আর কোনও কাজই সুষ্ঠুভাবে, সময় মতো হয় না। ওই টুকুস টুকুস করে তরিতরকারি কাটে, রাতের রুটিটা করে।

"সীতা, সীতা!"

ওই, জেঠিমার পুজো হয়ে গেছে। হাতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল তার, তরতরিয়ে নেমে এল সে একতলার দালানে। জেঠিমা বেরিয়ে এসেছে ঠাকুরঘর থেকে। তাকে দেখে বলল, "বাসি জামা ছেড়েছিস?"

বাসি কাপড়ে প্রসাদ পাওয়া যায় না, রান্নাঘরে ঢোকা বারণ, সে বলল, "এই যাচ্ছি!"

তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র সব এ বাড়িতে থাকে জেঠিমার ঘরের একটা দেরাজ আলমারিতে। সীতা আবার লাফ দিয়ে দোতলায় গেল, একটা সালোয়ার কামিজ বের করল দেরাজ থেকে, ছাতের সিঁড়িতে ঝুলছে গামছা, নিয়ে দোতলার কলঘরে স্নান করে নিল চটপট, চুল আঁচড়ে নেমে এল দশ মিনিটে। দালানের চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে জেঠিমা, হাতে গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ের গ্লাস,অঞ্জনদাকে সে কোথাও দেখতে পেল না। জেঠিমা বলল, "সকালের চা-টাও নিজেকে বানিয়ে নিয়ে খেতে হল সীতা!" গলায় অভিযোগের সুর।

সে নিজের চা-টা নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, জুত করে বসল মোড়ায়। মোড়ায় তারই হাতের বানানো আসন পাতা, ফুল-লতাপাতা-কলকার কাজ। সে বলল, 'কেন, এই বুঝি সকালে প্রথম চা হল? অঞ্জনদা চা খায়নি?'

"সে তো মান্তুর মা বানিয়েছিল, আমি তো আর খাইনি! তোর হাতের চা খেয়ে খেয়ে আমার আর নিজের হাতের চা মুখে রোচে না, টক হয়ে যায় জিভটা!"

পাড়াপ্রতিবেশীর খবরাখবর নিয়ে রাখাটা জেঠিমার স্বভাব। হয়তো বলবে, "হ্যাঁরে, সীতা, হল কী, বিশ্বাসদের নতুন বউ তো ঘোমটা খুলে ভর সন্ধেবেলা পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়ছে?" কাছেপিঠে থাকলে অঞ্জনদাও যোগ দেয় কথায়, "তাতে তোমার কী মা? বিশ্বাসজেঠাদের কি চোখ নেই? এখন ঘোমটাটোমটা দেওয়ার চল আছে নাকি?"

"তোমার বউকে ঘোমটা টেনেই থাকতে হবে অঞ্জন! আমি যেটি বলব অক্ষরে-অক্ষরে সেটি পালন করতে হবে বলে দিলাম। সেখানে কারও কথা খাটবে না।"

এরকম কথার উত্তরে অঞ্জনদা ফাজিল হেসে বলে, "কলকাতায় চাকরি পেলে আমি তো বউ নিয়ে কলকাতায় কেটে পড়ব, বউ কি তোমার কাছে ফেলে রেখে যাব নাকি? তুমি হুকুম করবে আর সে বেচারি পরের মেয়ে খেটে খেটে মরবে?"

"ওঃ, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বেয়াদব ছেলে! মায়ের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় শেখোনি?"

মা আর ছেলের দ্যাখ না দ্যাখ ঝগড়া বেধে যায়। কিন্তু সে সবই অঞ্জনদার খুনসুটি, মাকে রাগানো, আসলে অঞ্জনদা মায়ের অত্যন্ত বাধ্য ছেলে। এই ঘরবাড়ি ফেলে, মাকে ফেলে জন্মেও কলকাতা পাড়ি দেবে কি না সন্দেহ!

আজ সরস্বতী পুজো, পাড়ায় প্যান্ডেল বেঁধে পুজো হচ্ছে। মেয়েরা শাড়ি পরে রওনা দিয়েছে ইস্কুলে, অঞ্জলি দেবে। একটাই ইস্কুল এখানে, ছেলেদের আর মেয়েদের দুটো আলাদা বিল্ডিং, হরিহর উচ্চ বিদ্যালয়, সীতাও সেখানেই পড়েছে ক্লাস এইট অবদি; বছরে তিরিশ টাকাও মাইনে নয়, বইখাতারও অসুবিধে ছিল না, জেঠিমা কিনে দিত কিছুটা, বাকিটা জোগাড়যন্ত্র করে হয়ে যেত, কিন্তু সীতার নিজেরই মোটে গরজ ছিল না লেখাপড়ায়। ইংরেজি, অঙ্ক কোনওটাই হজম হত না তার। জেদ করে ছেড়ে দিল। তবে হ্যাঁ, বাংলা সে ভালই পড়তে পারে, একটা-আধটা বই পেলে নেড়েচেড়ে দ্যাখে। আর একটা অদ্ভুত শখ আছে সীতার—গান টুকে রাখা! যে গান মনে ধরে তার কথাগুলো লিখে রাখে সে একটা নোট বইতে। খাতাটা সযত্নে রাখা থাকে জেঠিমার ঘরের দেরাজে। অবশ্য হাতের লেখা খারাপ বলে এই খাতাটা সীতা কাউকে দেখাতে চায় না!

আজ সীতা দেখল জেঠিমার উঠি উঠি ভাব। সে বলল, "অঞ্জনদাকে এখন কী খেতে দেব জেঠিমা?"

জেঠিমা একটু এদিক-সেদিক তাকাল, চালকলের দিক থেকে কাজ করতে আসে যে মেয়েটা সে এখন উঠোন ঝাঁটাচ্ছে, আর কেউ ধারেকাছে নেই; জেঠিমা বলল, "সে হবে ক্ষণে। শোন সীতা, তোর সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে!" সে অবাক হল না। অনেক গোপন কথাই জেঠিমা এ পর্যন্ত বলেছে তাকে, সে বলল, "বলো!"

"এখানে নয়, ওপরে চল!"

দু'জনে দোতলায় উঠে এসে জেঠিমার ঘরে ঢুকল, জেঠিমা বলল, "একটু পরেই আমি আর অঞ্জন বেরোব, এক জায়গায় যাব!"

জেঠিমা পারতপক্ষে কোথাও যায় না, কৃষ্ণনগরে এখন আর কেউ নেই বাপের বাড়ির, তারা সব কলকাতায় চলে গেছে।

"কোথায় যাবে জেঠিমা?" জানতে চাইল সীতা।

"শোন, তোকে বলি; ও গ্রামের রমানাথ ঘটক অঞ্জনের একটা ভাল সম্বন্ধ এনেছে, মুক্তারাম ইস্কুলের সেক্রেটারির মেয়ে। পাকা কথা হলেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তারামে অঞ্জনের চাকরি হয়ে যাবে, অঞ্জনকে ওঁর নাকি খুব পছন্দ। চাকরির দরখাস্ত জমা দিতে গিয়েছিল অঞ্জন মুক্তারামে। তখন দেখেছিলেন ভদ্রলোক। এই যে এখন স্কুলের চাকরিতে ঢুকতে গেলে পার্টি ফান্ডে লাখ টাকা ঘুস দিতে হয়—সেই টাকা আমি তো কখনও জোগাড় করতে পারব না, কলসির জল গড়িয়ে গড়িয়ে খেয়ে আমার সমস্ত সম্বল তলানিতে ঠেকেছে। এ দিকে অঞ্জনের ইচ্ছে মাস্টারি করবে। তা এ একরকম ভাল ব্যবস্থা, গ্রামের ছেলে গ্রামেই থাকল, সাইকেলে মুক্তারাম তো বিশ মিনিটের পথ! মেয়েটা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ, রমানাথ ছবি দেখাল, রংটা চাপা তবে মুখখানা বেশ, যদি কথাবার্তা বলে ভাল লাগে, তা হলে বুঝলি সীতা অমনিই ধানদুব্বো দিয়ে আশীর্বাদ করে আসব, বেশি দেরি করে লাভ নেই। অঞ্জনের তো দেখলাম প্রস্তাবটা দিব্যি মনে ধরেছে। ধরবে না-ই বা কেন, সেক্রেটারির জামাই হলে মাস্টার থেকে হেডমাস্টার হতেও সময় নেবে না!"

এতগুলো কথা বলে জেঠিমা একটু দম নিল; বলল, "একটু জল গড়িয়ে দে, আজ আমার ভেতরটা খুব অস্থির রে সীতা, সব ভালয় ভালয় হলে হয়!"

জেঠিমা জল খেল বুক ভিজিয়ে, "কাউকে কিছু বলিস না এক্ষুনি, কেমন?"

সে বেরিয়ে এল জেঠিমাকে একটা ভাল শাড়ি বের করে দিয়ে। জেঠিমা বলেছে এ বেলা মুক্তারামের সেক্রেটারির বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া, ফিরতে ফিরতে বিকেল, সীতা যেন নিজের মতো কিছু করে নেয়।

সত্যি কি সীতা জানত না একদিন এরকমই কিছু একটা হবে? কিন্তু জেঠিমা যখন কথা বলছিল তখন সে টের পাচ্ছিল পরিষ্কার, তার পায়ের তলায় মাটি নেই। তার ধিক্কার উঠছিল ভিতরে, এত অন্যায্য, এত আকাশসুকুম কল্পনা এত দিন ধরে মনে মনে পোষণ করেছিল বলে। সেই যে সেবার জ্যাঠামশাইয়ের বাৎসরিক কাজের দিন খালি গায়ে ধুতি পরে বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সীতা অঞ্জনদাকে—আপাদমস্তক টালমাটাল করে উঠেছিল তার; আর মনে হয়েছিল এ গ্রামে চাষবাস করে খায় বেশিরভাগ লোক, অঞ্জনদার মতো আর একজনও নেই! বিকেল হলেই তো ছাত্রছাত্রীতে ভরে যায় বাড়ি, অঞ্জনদা তাদের পড়ায়, ধমকধামক দেয় গলা ভারী করে, ছুটির দিন দুপুরে গান শোনে, বই পড়ে। অঞ্জনদার সে কোনও দিকে যোগ্য নয়, হাতে হাতে সব এগিয়ে দিয়ে, ঘর গুছিয়ে দিয়ে, জেঠিমার পা টিপে দিয়ে সে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে চেয়েছিল। যখন এ বাড়িতে একা থাকতে হত তাকে সে ওড়না মাথায় জড়িয়ে টহল দিয়ে বেড়াত সর্বত্র আর ভাবত এ সব তারই—একদিন হবে! এই তো ক'দিন আগে অঞ্জনদা ঠাট্টা করেছিল তার সঙ্গে, 'তুই আর কদ্দিন? তোকে এবার শিগগিরি গ্রামছাড়া করা হবে!'

জেঠিমা বলেছিল, "আহা, ওভাবে বলিস না, মনে দুঃখ পাবে!"

"দুঃখ পাবে?" হেসে উঠেছিল অঞ্জনদা, "মনে খই ফুটতে শুরু করে দিয়েছে দ্যাখো!"

না, অঞ্জনদা কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি সীতাকে যে তার প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আছে তার। সেই একবারই সন্ধেবেলায় তাকে পুকুরে সাঁতার কাটতে দেখে জলে নেমে এসেছিল অঞ্জনদা, ভয় দেখাচ্ছিল ডুবিয়ে দেবে, আর তার মনে হয়েছিল অঞ্জনদার হাত একটু অন্যভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত...অথবা সে শুধুই মনের ভুল। আসলে তার শরীর, তার মন মুক্তারামের সেক্রেটারির মেয়ের সামনে তুচ্ছ বস্তু ছাড়া কিছু নয়।

লজ্জায় সীতার সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠতে লাগল। অঞ্জনদার ঘর দ্রুত পায়ে পার হতে হতে সে বুঝে গেল যে—না, মুক্তারামের সেক্রেটারির মেয়ের সামনে এ বাড়িতে স্বাভাবিক থাকতে পারবে না সে কখনও, এ বাড়িতে সে রান্না করে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর মোছে—সব নিজের বাড়ি মনে করে করে। কিন্তু মুক্তারামের সেক্রেটারির মেয়ের সামনে সে মান্তুর মা হয়ে যাবে। দয়া, অনুগ্রহ এত বছর নিঃশেষে কুড়িয়েছে সীতা জেঠিমার কাছ থেকে। ভাব দেখিয়েছে, এ সব তার প্রাপ্য। সত্যিই অনেক দিয়েছে তাকে জেঠিমা, আশ্রয় দিয়েছে। সব থেকে বড় কথা, তার অতগুলো ভাইবোন যখন ভাত নিয়ে মারামারি করেছে তখন সকলের বড় হয়েও দু'বেলা পেট ভরে খেয়েছে সীতা, কারও কথা ভাবেনি, নিজেদের সংসারটাকে নরক নামে অভিহিত করে এড়িয়ে থেকেছে; কিন্তু তাই বলে এ কথাটা তো মিথ্যে নয় যে, অঞ্জনদাকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে সে? এই টুলের ওপর আয়না রেখে দাড়ি কামাচ্ছে এখন যে—ইস্কুল মাস্টারের চাকরি, বিবাহ—আসন্ন এ সব স্বপ্নে এখন বিভোর—তাকেই ভাল যে বেসেছে এ তো সত্যি!

তার সতেরো বছরের হৃদয় থরথর করে কাঁপছে সমানে, ভীষণ অভিমান আছড়ে পড়বে যেন চোখের ওপর। কেউ তাকে অপমান করেনি তবু অপমানে খোলামকুচির মতো কোথায় ছিটকে পড়েছে সীতা। এক মুহূর্ত, আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না তার। সে খেয়াল করছে না কখন গা থেকে খসে যাচ্ছে চাদরখানা। সীতা একতলার উঠোন ছুটে পার হয়ে বাগানের ভিতর ঢুকছে গিয়ে—কেউ কোথাও নেই, সে কেঁদে উঠছে ফুঁপিয়ে আর মুখ চাপা দিচ্ছে দু'হাতে এবং সে জন্যেই দেখতে না পেয়ে আমগাছের গুঁড়িতে হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটির ওপর, পায়ের নখ উড়ে যাচ্ছে তার এই দুর্ঘটনায়, কনুই ছুড়ে রক্তপাত ঘটছে—সমস্ত যন্ত্রণা মিলেমিশে অঝোরে কাঁদিয়ে ছাড়ছে তাকেও। চোখের জলের সঙ্গে অতলে চাপা দিয়ে রাখা সমস্ত স্বপ্ন তখন গলে বেরিয়ে আসছে নিঃশেষে সীতার!

এবং বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে তারও, অঞ্জনদার সামনে সে আর কক্ষনও দাঁড়াবে না, কক্ষনও দাঁড়াবে না। যেন সে, এইভাবেই বুঝিয়ে ছাড়বে অঞ্জনদাকে এই আঘাত কতখানি মারাত্মক হয়ে বেজেছে বুকে সীতা নামের মেয়েটার। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ হয়ে এই দুঃখ তাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দূরে, দূরে। সে এক দুঃখী মেয়ে, গৃহের নিরাপত্তা সে এইখানে দেখেছিল, কৈশোর পেরোতে না পেরোতে আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে পুনর্জন্ম খুঁজেছিল নির্বোধের মতো—এবার তার এ বাড়ি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার পালা!

একটু পরে রিকশা ডেকে আনল অঞ্জনদা। জেঠিমা আর অঞ্জনদা রওনা দিয়ে দিল। হতবাক ভাবটা কাটার পর সীতার প্রথম যে কথাটা মনে হল সেটা হচ্ছে 'বাড়ি যাব!' জীবনে প্রথমবার এই ইচ্ছেটা হল তার বোধহয়। নইলে সে যে সাতসকালে বিছানা মাদুর যেমনকার তেমন ফেলে রেখে উঠে চলে আসে এ বাড়িতে, না তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয়, না প্রয়োজন পড়ে। এই ব্যবস্থা এত বছরের পুরনো যে, তাকে নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না ও বাড়িতে। অবশ্য ভবানী ছাড়া আর আছেই বা কে মাথা ঘামানোর? এই পরিস্থিতিতে রাতটুকুতে কোনওমতে ও বাড়ির বিছানার একটা অংশ দখল করতে হয় সীতাকে।

কিন্তু বাড়ি যাওয়ার পক্ষে এটা অসময় সীতার। জেঠিমারা তার জিম্মায় বাড়ি রেখে বেরিয়েছে। ওরা ফিরে না আসা অবদি সে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না। তা ছাড়া সে চলে গেলে জেঠিমা অবাক হবে, কারণ দিনেরবেলা ও বাড়ি ফিরতে হয় সীতাকে একমাত্র তখনই যখন হঠাৎ উদয় হয় ললিত নিরুদ্দেশ থেকে।

ললিত সীতার বাবা। ললিত এক অদ্ভুত পাগল, বিচিত্র তার স্বভাব। আদতে চুপচাপ উন্মাদ ললিতের খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই, ঘুম নেই, কোনও কিছুর প্রতি কোনও অভিযোগ নেই, রাগ, রিরংসা নেই। সে কক্ষনও খেপে ওঠে না। সে শুধু চুপচাপ বসে থাকে আর কাঁদে! কোন আঘাত, কোন যন্ত্রণা থেকে ললিত এমন নিঃশব্দে অশ্রুপাত করে চলে তা কেউ জানে না। সবাই শুধু এটাই জানে যে, ললিত এমনটা কোনওকালে ছিল না। তার রোগলক্ষণ দেখা দিয়েছে চন্দ্রাকে বিয়ে করে আনার পরে! কেউ বলে স্বামীকে নিজের বশে রাখতে গিয়ে তুকতাকের আশ্রয় নিয়ে হয় ভবানী নয় চন্দ্রা ললিতকে উন্মাদ বানিয়ে ফেলেছে। দুই সতিনও পরস্পরকে এই বলেই দোষারোপ করে থাকে।

শুধু একান্তে বসে কাঁদলে না হয় চলত কিন্তু ললিতের প্রধান পাগলামি হল মাঝে মাঝেই কাউকে কিছু না বলে হারিয়ে যাওয়া। হারিয়ে যায়— আবার মাস দেড়-দুই বাদে ফিরে আসে, কিংবা কেউ ফিরিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু তখন ললিতকে আর চেনা যায় না! সমস্ত শরীরে নোংরা, পোশাক তেলচিটে কালো, একমুখ দাড়ি, ভয়

পাওয়া অসহায় দুটো চোখ, হাতেপায়ে কাটা দাগ, মনে হয় মারধরও খেয়েছে লোকের হাতে। ললিতের মতো নিরীহ পাগলকে প্রহার করে কেন লোকে? ললিতকে এ সব জিজ্ঞেস করে কোনও উত্তর পাওয়া যায় না, কারণ সে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করে না কখনও। দু'-দশ দিন সে ভাল মানুষের মতো বিধুপুরের আম-কাঁঠালের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয়, তারপর আবার তার অসহ্য লাগে গ্রামের জল, বাতাস, মানুষ, পরিবার, পরিজন—সে হারিয়ে যায় নিজের মতো করে!

দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ললিত ফিরলে সীতার ডাক পড়ে এ বাড়িতে। গৌরাঙ্গ বা অনন্ত এসে ডেকে নিয়ে যায় তাকে। কারণ এতগুলো লোকের মধ্যে সীতাকেই যেন একটু বিশ্বাস করে ললিত। সীতা গিয়ে বাবাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘাটে, গলা জলে দাঁড় করিয়ে ছোট ছেলের মতো স্নান করিয়ে দেয়। কাচা জামা, প্যান্ট পরিয়ে দেয়, ভাত মেখে খাইয়ে জামার পকেটে গুঁজে দেয় বিড়ির প্যাকেট। ললিত তখন জুলজুল করে তাকিয়ে থাকে মেয়ের মুখের দিকে।

এই বেলা দুটো-আড়াইটে নাগাদ ও বাড়ির অবস্থা ঠিক কেমন তা জানা আছে সীতার। সকাল থেকে ঝগড়া করে করে ভবানী আর চন্দ্রা দু'জনেই এখন নির্জীব। তারপর হয়তো ভাঁড়ারও শূন্য, ভাতের হাঁড়িতে হাতা ঘাঁটলে ঠক ঠক করে আওয়াজ উঠছে, ভেঙে পড়া, হতাশ গলায় চন্দ্রা সেই সহস্রবার আওড়ানো কথাগুলোই হয়তো বলছে আবার, "মাথার ওপর যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থাকেন তা হলে জেনে রাখো তোমাকেও একদিন ওরকম পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। ভিক্ষে করে খেতে হবে! এই আমি শিবপদ দাসের মেয়ে, বলে রাখছি কথাটা! সতিন শায়েস্তা করতে গিয়ে নিজের স্বামীকে ন্যালাখ্যাপা বানিয়ে দিলে? এবার খুব শান্তি হয়েছে তো? হে ভগবান, এরপর কেঁদে কেঁদে মানুষটা যদি অন্ধ হয়ে যায় তা হলে তো চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না! পথেঘাটেই মরে পড়ে থাকবে, জানতে পর্যন্ত পারবে কেউ?" এই বিলাপ শুনে ভবানী বলবে, "অন্ধ হয়ে গেলেও বোবা তো আর হয়ে যাবে না, তোর কথা মনে পড়লেই আবার বাড়ি ফিরে আসবে, পাগল হোক আর যাই হোক তোর গতরের টানে ফিরে আসবে ঠিক দেখিস!"

এ কথা বলার পিছনে যুক্তি আছে যথেষ্ট। ললিত তো সেই কবেই পাগল হয়ে গেছে, তবু পল্টুর পরও চন্দ্রা গর্ভবতী হয়েছিল একবার, ঘাটে পা পিছলে পড়ে গর্ভের সন্তান গর্ভেই মারা যায়!

নিঃশেষিত প্রাণশক্তি নিয়ে চন্দ্রা চিল চিৎকার করতে করতে নেমে যাবে উঠোনে, কুয়ো থেকে ঘটাং ঘটাং শব্দে জল তুলতে শুরু করে দেবে খামোকা, "ওই হিংসেতেই তো এত বড় সর্বনাশটা করেছ তুমি! দিব্যি হাসিখুশি, রোজগেরে মানুষটাকে পাগল ছাগল বানিয়ে ঘরের বার করে ছাড়লে। দেখলে চিনতে পর্যন্ত পারে না সে এখন আমাদের!"

এই চলবে অহোরাত্র। গৌরাঙ্গ, অনন্ত সাইকেল স্ট্যান্ডে বসে তাস খেলবে, বিড়ি খাবে, পুতুল ঘুরে ঘুরে বেড়াবে পাড়ায়, যার তার সঙ্গে মিশবে, মালা আজন্ম রুগ্ণ, দশ বছর বয়েস হয়নি, দাওয়ায় বসে হাঁ করে গিলবে মা আর সৎ মায়ের ঝগড়া আর মাঝে মাঝে খেতে চাইবে! এই অসময়ে সীতা গিয়ে দাঁড়ালে চন্দ্রা খিলখিল করে হেসে উঠে বলবে "কী, তাড়িয়ে দিল?"

পাড়ার প্যান্ডেলে গান বাজছে সজোরে। সীতা উড়ে যাওয়া নখটার শুশ্রূষা করতে করতে কাঁদছিল। আজ জেঠিমারা ফিরে এলে সে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে যাবে, তার ভিতরটা ভয়ংকর ছটফট করছে। এখন কি অঞ্জনদা মুক্তারামের সেক্রেটারির মেয়ের হাতের কাজ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ চাউনি মেলে তাকাচ্ছে মেয়েটার দিকে?

জেঠিমার কি ধানদুব্বো দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়ে গেল? স্থির হয়ে গেল বিয়ের দিন আজই? কোনও কারণ নেই তবু সীতার মনে হল মুক্তারামের সেক্রেটারির মেয়েটা ভীষণ অহংকারী! ধরাকে সরা জ্ঞান করে। জেঠিমার তাঁবে সে কক্ষনও থাকবে না!

এই সময় সে কড়া নাড়ার শব্দ পেল বাইরের দরজায়। বুকটা ছলাৎ করে উঠল সীতার, জেঠিমা আর অঞ্জনদা কি ফিরে এল? মেয়ে পছন্দ হয়নি? ঢুকতে ঢুকতে জেঠিমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে উঠবে, “বাব্বাঃ, রমানাথ ঘটক আর একটু হলেই গছিয়ে দিয়েছিল আর কী পচা কাঁঠাল। কোনওমতে পালিয়ে এসেছি। ও সীতা, তুই শিগগিরি আমাদের জন্য যা হোক ডালেচালে চড়িয়ে দে!”

সে ছুটল দরজা খুলতে। নাহ্, জেঠিমারা নয়, মালা!

“কী হয়েছে?” জানতে চাইল সীতা।

“চাল চেয়েছে বড়মা!” মালা এক মাথা নোংরা চুল চুলকাতে চুলকাতে বলল।

অন্য দিন হলে সীতা বিরক্ত হত, চাল চাওয়ার আর অন্ত নেই যেন, কিন্তু আজ তার মালার খড়ি ওঠা শুকনো মুখ দেখে মায়া হল কেমন, একটা দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বের হয়ে এল, মনে হল হঠাৎ সে যেন এক লাফে অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে! সীতা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মালার মুখের দিকে, “ভাত খাবি?”

জ্বলজ্বল করে উঠল মালার চোখ, কিন্তু মুখে মেয়েটা কোনও সম্মতি জানাল না। বেচারি, নিজের খাওয়ার থেকে বাড়িতে চাল পৌঁছোনোটাই ওর কাছে এখন বেশি প্রয়োজনীয়। সে বলল, “চাল দিয়ে ফিরে আয়, তোকে ভাত দেব!” মালা মাথা নাড়ল চটপট।

পরাজয়ের দুঃখের সঙ্গে আজ তার মনে এসে মিশেছে দীনহীনের রাগও যেন বা, সীতা দেখল অতিরিক্ত চাল ভরে ফেলল সে নিজেই সিদ্ধেশ্বরী স্টোর্স লেখা প্লাস্টিকের ব্যাগে। মালা অবাক চোখে তাকাল তার দিকে। তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না, চলে গেল। এবং ফিরে এল না আর ভাত খাবে বলে। নিজেও আর ভাতের পাতে বসল না সীতা। মান্তুর মা খেয়ে বাসনকোসন মেজে শুতে গেল। গানের খাতাটা দেরাজ থেকে বের করে বাগানের রৌদ্রছায়ায় চুপটি করে গিয়ে বসল সীতা। অপেক্ষা করতে লাগল অঞ্জনদাদের ফিরে আসার। একজোড়া ফিঙে বেড়াতে লাগল তার কাছে কাছেই, উইয়ের ঢিবি থেকে সার দিয়ে বেরিয়ে আসা উইপোকাগুলো পথ পালটে চলে গেল অন্য দিকে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল ধবল মেঘ, জেঠিমার বাড়ি পাহারা দিতে দিতে দুঃখভোগ করতে লাগল সীতা। মনে হল চারপাশে সবাই হাসছে—‘মনোবাসনা পূরণ হল না সীতা?’ এই বলে হাসছে আর হাসছে!

এত দুঃখের দিন আগে ছিল না ললিত অধিকারীর। এত কাঙাল ভাব আগে ছিল না সীতাদের। স্টেশনের লাগোয়া জমিদার বাজারের সবচেয়ে বড় দোকান ‘নিউ ভ্যারাইটি’ বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ছিল ললিত। চেহারাও ছিল কার্তিকের মতো। আয়পত্তর ভালই ছিল। জটাই বিশ্বাস ছিল ওই দোকানেরই এক সামান্য কর্মচারী। গলা খাঁকারি দিয়ে ছোটখাটো ত্রুটিপূর্ণ জিনিসও দিব্যি গছিয়ে দিতে পারত পাঁচটা গ্রামের মানুষকে। ভবানী জটাই বিশ্বাসেরই মেয়ে। ভবানী অবশ্য তখন নিখুঁত যৌবনবতী। চোখেমুখে বুদ্ধির ঝলক। একটাও পয়সা না নিয়েই ভবানীকে বিয়ে করে এনেছিল ললিত। বন্ধুদের সে বলত, “ভবানীর সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ!”

তা সুখই ভেবেছিল সবাই, কিন্তু সাত-আট বছর পরে দূরের কোন এক গ্রামে যাত্রা দেখতে গিয়ে যাত্রায় সখীর পার্ট করা চন্দ্রাকে বিয়ে করে এনে হাজির হল ললিত। এসে ভবানীর পা জড়িয়ে ধরেছিল ললিত, যেন না বুঝে বিরাট একটা ভুল করে ফেলেছে। ভবানী বলেছিল "যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, সিঁদুর তুলে ফিরিয়ে দিয়ে এসো!" কিন্তু চন্দ্রা সাত ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে, সে এক পা নড়ল না, কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ভয় দেখাতে লাগল। পাড়ার লোকজন বোঝাল ভবানীকে, ললিত চোরের মতো ঘুরতে লাগল ভবানীর পায়ে পায়ে। সীতা তখন অনেক ছোট, মাকে চোখের জলে ভেসে যেতে দেখেছে সে। মেনে নিয়েছিল চন্দ্রাকে ভবানী। কয়েক মাস ঘুরতে না ঘুরতে পেটে বাচ্চা এল চন্দ্রার, জায়গা পাকা হয়ে গেল। দুই সতিনে দক্ষযজ্ঞ শুরু হল রোজ।

এর কিছুদিনের মধ্যেই পাগল হয়ে গেল ললিত!

পাগল ললিতকে আর কাজে রাখেনি মালিকরা। এতগুলো পেট নিয়ে এত বছর নিজের বুদ্ধির জোরেই কোনওমতে দিন চালিয়ে এসেছে ভবানী, গয়না বিক্রি করে সে তিনটে রিকশা কিনেছিল। স্টেশন বাজারের রিকশা স্ট্যান্ডে রিকশা এক মুহূর্ত দাঁড়াবার ফুরসত পায় না—এত সওয়ারি! তবু সেই উপার্জনে যে এতগুলো লোকের গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। বাড়ির সংলগ্ন জমিতে যে সবজি ফলে বা হাঁস-মুরগি ডিম পাড়ে তা প্রায়ই গৌরাঙ্গকে দিয়ে রেলের বাবুদের কোয়ার্টারে বিক্রি করতে পাঠায় ভবানী। এতগুলো ছেলেমেয়ে, তাদের অসুখবিসুখ হলেই সবচেয়ে আতান্তরে পড়ে সে। এই পরিস্থিতিতে রাশ আলগা দিয়ে সে নিজেই সীতাকে এগিয়ে দিয়েছিল অঞ্জন আর সুপ্রভার মনের দখল নিতে, প্রকারান্তরে সেই শিখিয়েছিল, 'জেঠিমার সেবা করবি, হাতে হাতে সব কাজ করে দিবি!' মেয়ে পরের বাড়ির কুটনো কুটছে, ঘর মুছছে দেখেও দেখেনি ভবানী। এবং সুপ্রভা যে এত বছর টানল সীতাকে—ভেবে দেখলে নিজের উদ্দেশ্যে ভবানী অনেকটাই সফল।

কিন্তু আজ সীতা জানে জেঠিমার মন দখল করা আর অঞ্জনদার মন দখল করা এক বিষয় নয়!

সন্ধে হব হব সময়ে বাড়ি ফিরল ওরা। জেঠিমা তাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিল দোতলায়। সে দেখল বাড়ি ঢুকেই উঠোন থেকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল অঞ্জনদা। তাকে কাছে টেনে বসিয়ে খোসমেজাজে জেঠিমা বলে উঠল, 'ওরা বলছিল অঘ্রানে, কিন্তু অঘ্রানে তো তোর জ্যাঠা মারা গিয়েছিলেন, আমি ছেলের মা, বললাম তা হলে বছরটা ঘুরে যাক, শুনে ওরা এই বৈশাখেই বিয়ের দিনক্ষণ পাকা করে ফেলল! এই রোববার প্রতাপ ঘোষাল আমাদের ঘরবাড়ি দেখতে আসছে। বেশ সাজিয়েগুছিয়ে রাখিস কিন্তু সীতা, তোর হাতেই সব!'

সে শুনল চুপচাপ, বলল, "অঞ্জনদা কোথায় বেরোল জেঠিমা?"

"বোধহয় কাশীর বাড়িতে গেল! একটা ছবি এনেছে সুমিত্রার। কাশীকে দেখাতে গেল বোধহয়!"

কাশীদা অঞ্জনদার বাল্যবন্ধু। অঞ্জনদার আজ আহ্লাদের দিন!

জেঠিমা বাইরের কাপড় বদলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল, "তুই একটু চা বসা, আমি আহ্নিকটা সেরে নি। আর শোন, হাত খালি থাকলে ভবানীকে একটু আসতে বলিস, ওর সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে পরামর্শ করব?"

সে বলল, "মালাকে চাল দিয়েছি একটু জেঠিমা!"

"বেশ করেছিস, ও আর বলার কী আছে?"

জেঠিমা নামতে লাগল একতলায়, পিছন পিছন সে। দালানের আলো জ্বেলে দিল সীতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও— জেঠিমা যেন তার মুখের দিকে না তাকায়, "তোমাকে চা করে দিয়ে আমি একটু কালীর বাড়ি যাব, ইস্কুলের ঠাকুরটা একটু দেখে আসব!"

না, জেঠিমা তাকাল না তার দিকে, ঠাকুরঘরের শিকল খুলে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "আজ সরস্বতী পুজোর দিন, তুই একটু সাজগোজ করলি না, শাড়ি পরলি না কেন সীতা?" সে উত্তর দিল না এ কথার।

বেরিয়ে সীতা কালীর বাড়ি গেল না, পিছনের পাড়া ঘুরে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি পৌঁছোল। বিষ্ণুপ্রিয়ারা জাতে বৈষ্ণব। তবে কাজকারবারের দিক থেকে যাকে বলে গোয়ালা। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সেই রমরমে ব্যাবসা আর নেই। বিষ্ণুপ্রিয়া মা-বাবার একমাত্র সন্তান এবং সে ছোট থেকে কৃষ্ণভজনায় আকৃষ্ট। সে বিয়ে করেনি, অসুস্থ মাকে নিয়ে তার সংসার। যে ক'টা গোরু এখনও আছে তাদের পরিচর্যা করা, দুধ দুইয়ে বিক্রি করার জন্যে বহাল আছে অন্য লোক। এরই মধ্যে বছরে একবার গুরুভাইদের সাহায্য নিয়ে হরি সংকীর্তনের আসর বসায় বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়িতে, সাত দিন সাত রাত বিরামহীন নামগান চলে। বয়েস তার কাছাকাছি ত্রিশ বছর। কিন্তু সীতার সঙ্গে সে প্রায় একটা সমবায়েসি মেয়ের মতো মেশে। ভবানীর সঙ্গেও তার খুব হৃদ্যতা। সুপ্রভাও খুব পছন্দ করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে, মাঝে মাঝেই সীতাকে দিয়ে ডেকে পাঠায় গল্প করার জন্যে, গান শোনার জন্যে!

সীতা যেই বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ির গেট খুলে ঢুকল অমনি কারেন্ট চলে গেল। সারা দিন আজ কারেন্ট ছিল বিধুপুরে, পাড়ার সরস্বতী পুজোর মণ্ডপ থেকে ভেসে এসেছে গান। এখন ঝপ করে চারপাশ অন্ধকার হয়ে যেতে বিষ্ণুপ্রিয়াদের গোরুগুলো হাম্বা-হাম্বা করে ডাকতে লাগল খুব। এ বাড়িতে যেমন মশা, তেমন মাছি। ঢুকলেই নাকে এসে লাগে-গোবরের গন্ধ, তবে সন্ধে হলেই গোয়ালে ধুনো জ্বালানো হয় নইলে মশাগুলো অতিষ্ঠ করে মারে গোরুগুলোকে। বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘাটে বসে অনেকক্ষণ ধরে সিঁড়ির ভাঙা অংশে পা ঘষে। হাতে বড় বড় নখ, তাতে নেলপালিশ লাগানো। পরিপাটি করে শাড়ি পরে, চুল বাঁধে। এ গ্রামে বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়েসি মেয়েদের চুল বাঁধার সময় নেই, তারা সংসারের রাশি রাশি কাজে সর্বদা ব্যস্ত, জল ঘেঁটে ঘেঁটে তাদের শাড়ি রাতদিনই ভেজা, গায়ে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ, পায়ে কাদা। বিধুপুরের মাটি চ্যাটচেটে এঁটেল মাটি, ভীষণই কাদা ওঠে। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া এক অসাধারণ নারী বললে অত্যুক্তি হয় না।

সীতা এগোতেই হ্যাজাক জ্বলে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়াদের বাড়ির ভিতর। বিষ্ণুপ্রিয়ার গলা পাওয়া গেল, 'কে রে?' সে গিয়ে দাঁড়াতে দেখল ঘরে বিষ্ণুদি আর জেঠিমা ছাড়াও আর একজন ভদ্রলোক। প্রথমে সে চিনতে না পারলেও পর মুহূর্তে বুঝতে পারল মানুষটা অন্য কেউ নয়, বিরূপাক্ষ জ্যাঠা! সে বলে উঠল, "জ্যাঠা তুমি কবে এলে?"

বিরূপাক্ষ জ্যাঠা বলল, "কী রে সীতা, তুই? এই তো আমি তোদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এলাম, এতক্ষণ তোর মায়ের সঙ্গেই কথা বলছিলাম। এসেছি কালই!" বিরূপাক্ষ জ্যাঠা ওদের সকলেরই গ্রামতুতো জ্যাঠা। কলকাতায় থাকে, চাকরি করে, একা মানুষ, বিয়ে-থা করেনি। গ্রামে কিছু জমিজমা আছে, ভাইরাই ভোগ করে জমির স্বত্ব। অবস্থা কারওই ভাল নয়, জ্যাঠা সাধ্যমতো সাহায্য করে ভাইদের।

সে বলল, "থাকবে?"

“থাকব বলতে, নিরঞ্জনের তো এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা, তাই পরীক্ষার আগে একটু ঘুরে গেলাম! ইচ্ছে আছে হায়ার সেকেন্ডারির পর ওকে কলকাতায় নিয়ে যাব।”

সে তক্তপোশের ওপর বসে পড়ে বলল, “হ্যাঁ, নিরঞ্জন ভালই তৈরি হয়েছে বলছিল অঞ্জনদা। অঞ্জনদার কাছে তো ভূগোল দেখাতে আসে প্রায়ই!”

বিরূপাক্ষ জ্যাঠার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, “নিরঞ্জনের তো মাথাটা পরিষ্কার, আর পড়ছেও দেখলাম খুব! দেখা যাক, পড়াশুনোটা না ছাড়লে তোরও এ বছর মাধ্যমিক দেওয়া হত?”

সে মাথা নিচু করল, “নাহ্, সামনের বছর!” কথাটা বলার সময় তার আফশোসের শেষ থাকল না যেন। এই প্রথম তার মনে হল পড়াশোনাটা ছেড়ে দিয়ে সে যারপরনাই অন্যায় করেছে নিজের সঙ্গে।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে লক্ষ করছিল অনেকক্ষণ ধরে, এবার বলল, “তোর চোখমুখ ভার ভার কেন রে? কেঁদেছিস? এই মেয়েটাকে নিয়ে আর পারা গেল না!”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না সীতা। সকালে মনে যে ঝড় উঠেছিল তার, এখন তা অনেকটা থিতিয়ে গিয়েছে, শুধু বুকের ভিতরটা পাথরের মতো ভারী!

জ্যাঠা বলল,“এই মেয়েটা ওর মায়েরই মতো হয়েছে, অসীম সহ্যশক্তি। যতক্ষণ বসেছিলাম চন্দ্রা গালাগালি করে গেল ভবানীকে। ভবানী শুনে গেল চুপচাপ!”

এই কথায় বিষ্ণুপ্রিয়া আর সীতা চোখ চাওয়াচাওয়িকরল। সত্যিটা অন্য। একসময় হয়তো ভবানী যতটা পেরেছে চুপ করে থেকেছে কিন্তু এখন ভবানী আর চন্দ্রার আচরণের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা যাবে না, দু’জনেই কথায় কথায় রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করে; চন্দ্রা চ্যালাকাঠ ছুড়ে মারলে ভবানীও গরম জল নিয়ে তেড়ে যায়। কিন্তু বিরূপাক্ষের সামনে আর চন্দ্রার প্ররোচনায় পা দেয়নি ভবানী। এ দিকে চন্দ্রা জানে গ্রামের লোকজন বেশিরভাগই ভবানীর পক্ষে, তাই চন্দ্রার খুব রাগ তাদের ওপর। যেমন সুপ্রভা ভুলেও কখনও একটির বেশি দুটি কথা বলে না চন্দ্রার সঙ্গে, চন্দ্রাও দু’চক্ষে দেখতে পারে না সুপ্রভাকে।

খুব যত্ন করে মুড়ি মেখেছে বিষ্ণুপ্রিয়া—ঘি, নারকেল কোরা, চিনি, বাদাম সব দিয়ে। এ বাড়িতে পেঁয়াজ, রসুন, মাংস ওঠে না। দুটো পাত্র ভরে মুড়ি এনেছে সে। স্টিলের বাটিটা বিরূপাক্ষ জ্যাঠাকে এগিয়ে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া, সানকিটা থেকে এক মুঠো মুড়ি তুলে মুখে দিয়ে সীতাকে বলল, “নে, এটা থেকে তুই-ও খা, আমিও খাই!” তারপর চা আনতে গেল।

দুপুরে কিছু খায়নি সীতা, এখন খুব খিদে পেয়েছে তার; কিন্তু প্রবল দুঃখবোধের সঙ্গে খাওয়া ব্যাপারটা একদম যায় না। মনে হয় খেলে দুঃখ নষ্ট হয়ে যাবে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই এবার একমুঠো মুড়ি তুলে নেয় সে, মুখে দেয়, চিবোয়। আর গিলতে গিয়ে টের পায় এখন সব কিছুর ওপর তার টসটসে অভিমান। না, কেউ দেখতে পাচ্ছে না এখন তার কত কষ্ট! এবং হঠাৎ তার ইচ্ছে হয় অঞ্জনদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, “সত্যি বলো, অঞ্জনদা—তুমি কি কখনও বুঝতে পারোনি আমি তোমাকে ভালবাসি?”

চা নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া ফিরে এলে বিরূপাক্ষ জ্যাঠা বলল, “চৌধুরীদের বাড়িতে দেখলাম এসি মেশিন বসিয়েছে বিষ্ণু!”

“এসি মেশিন? টিভিতে যেটা দেখায়?”

"হ্যাঁ, ঘর ঠান্ডা করার যন্ত্র। কলকাতায় তো সব বাড়িতেই এখন ঠান্ডা করার মেশিন। ইট-কাঠ-পাথরের জঙ্গল, গরম খুব! তা আমাদের এই অজ গাঁয়েও এসি মেশিন?"

চৌধুরীরা এখানকার বড়লোক, চালকল আছে, স্টেশন বাজারে অনেকগুলো দোকান, দুটো সিনেমা হল, সুধা টকিজ আর ঝুলন!

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, "আমার গড়পাড়ের দিকে অনেক দিন যাওয়া হয়নি, তাই চোখে পড়েনি! চৌধুরীদের একটা মেয়ে তো এখন কলকাতায় থাকে, কলেজে পড়ে। দুর্গাপুজোয় এসেছিল, খুব ভদ্র। ওদের বড় বউয়ের মতো, সব্বার সঙ্গে ডেকে কথা বলে, হাসি লেগেই আছে মুখে। বাকিরা সব নাক উঁচু, অহংকারী! অবশ্য হবে নাই বা কেন?"

গল্পে গল্পে রাত আটটা বেজে গেল। তখন উঠে পড়ল জ্যাঠা, সীতা বলল, "আমিও যাই এবার, জেঠিমা হয়তো চিন্তা করছে!" জ্যাঠা বলল, "চল, তোকে পৌঁছে দিয়ে আমি বউদির সঙ্গে একটু দেখা করে আসি!"

বাধ সাধল বিষ্ণুপ্রিয়া। বলল, "না জ্যাঠা, তুমি এগোও, আমার একটু সীতার সঙ্গে কথা আছে!"

জ্যাঠা চলে যেতে বিষ্ণুপ্রিয়া চেপে ধরল তাকে, "বল কী হয়েছে?"

সীতা ভাবতে পারেনি নিজেকে একটুও সামলাতে পারবে না বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে ওড়নায় মুখ ঢেকে, "বিষ্ণুদি, অঞ্জনদার বিয়ে দিচ্ছে জেঠিমা, দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে, বৈশাখে!"

বিষ্ণুপ্রিয়া তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, "চুপ কর সীতা, এখন আর এ সব নিয়ে কান্নাকাটি করিস না। লোকের চোখে পড়বে, তার ওপর চন্দ্রা তো রয়েইছে। ঠাট্টা তামাশা করে তোকে পাগল করে দেবে, এতদিন তুই ও বাড়ির মেয়ের মতো থেকেছিস, তুই সেরকমই থাক, মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখ, আজ বাদে কাল তোর বিয়ে হয়ে যাবে, সব ভুলে যাবি!"

সীতা আগের মতো কাঁদতেই থাকল। বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, "এ আমি বরাবর জানতাম, তোকে বলেছিলাম! তুই-ই বুঝতে চাইতিস না!"

সীতা আবার হু হু করে কেঁদে উঠল, "আমি পারব না বিষ্ণুদি, অঞ্জনদার বউকে আমি সহ্য করতে পারব না, আমার বুকটা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে যাবে!"

"অঞ্জনকে তো তুই ভালবাসিস সীতা?"

"অঞ্জনদাকে আমি ভীষণ ভালবাসি বিষ্ণুদি, অঞ্জনদার জন্যে আমি সব করতে পারি!"

"তা হলে তোকে একটা কথা বলব, কাউকে কখন ও বলবি না কথাটা, আগে দিব্যি কেটে বল?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার বলার ভঙ্গির মধ্যে কী একটা ছিল, সীতা অবাক হয়ে তাকাল মুখের দিকে, "তোমার দিব্যি, কাউকে বলব না কক্ষনও!"

"বেশ অনেক দিন আগে অঞ্জনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল তোকে নিয়ে। আমিই বলেছিলাম হাসতে হাসতে, 'সীতা যে তোকে ভালবাসে তা কি তুই জানিস?' অঞ্জন চুপ করে গেছিল, আমি বলেছিলাম, 'কী রে লজ্জা পেলি নাকি?' অঞ্জন বলল, 'না, লজ্জার কী? আমি জানি সীতা আমাকে ভালবাসে, সীতার জন্যে আমার মনেও অনেক মায়া, অনেক ভালবাসা। কিন্তু কী বলো তো বিষ্ণুপ্রিয়াদি, সেই টানটা নেই! সীতা আমার বড্ড

চেনা, বড্ড জানা, জন্ম থেকে দেখছি—এই আমাদের একঘেয়ে গ্রামের মতো, নতুনত্ব কিছু নেই। একটা নতুন মেয়ে মানে একটা নতুন মন, আমার কাছে সেটা খুব জরুরি!"

এই কথার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল নিঃশব্দে, একসময় চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, "উঠে পড়লি? বাড়ি যাবি?"

সে বলল, "যাই এবার!"

"এরকম হয় সীতা, মেনে নিতে হয়!"

সীতা মুখ ঘুরিয়ে নিল, হাঁটতে লাগল, বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, "চল, তোকে এগিয়ে দিই!" সে হাত দিয়ে বাধা দিল বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

বিষ্ণুপ্রিয়া জড়িয়ে ধরল তাকে, "শেষে তুই আমার ওপর রাগ করলি?"

"তুমি আগে বলোনি কেন অঞ্জনদার এই ব্যাপারটা?"

"বলব বলব করে বলা হয়ে ওঠেনি! বা বলতে পারিনি তোকে...প্রাণে ধরে।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে লাগল সীতা, মাথার ভিতরটা দপদপ করছে রাগে। সুমিত্রার মনটাই সবচেয়ে নতুন মন হয়ে গেল অঞ্জনদা? যার বাবা চাকরি দেবে, হেডমাস্টার বানিয়ে দেবে তার মনই অমনি তোমার সেই নতুন মন? তুমি ঠিক জানো এমন মনের সন্ধানই তুমি করেছিলে কি না?

ইচ্ছে করছিল সোজা বাড়ি চলে যায় কিন্তু জেঠিমাকে না বলে চলে গেলে জেঠিমা চিন্তা করবে, এখনই হয়তো চিন্তা করছে দেরি দেখে। নিজেকে দমন করতে করতে খর পায়ে সীতা ও বাড়ির পথ ধরল, যাবে, দাঁড়াবে না এক লহমাও, 'বাড়ি চললাম গো', বলেই বেরিয়ে আসবে, জেঠিমা বলবে 'খেলি না?' 'খেয়েছি অনেক কিছু বিষ্ণুদির বাড়িতে' বলে দেবে। কিন্তু বাড়ি ঢোকার মুখে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বিরূপাক্ষ জ্যাঠার—আবার! জ্যাঠা ডেকে দাঁড় করাল তাকে, "বউদি বসে আছে তোর জন্যে, বলে যাসনি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি যাবি?"

"তুমি বলে দিয়েছ?"

"বললাম তো সেই কথা, নইলে অঞ্জনকে তোর কোন বন্ধুর বাড়ি খুঁজতে পাঠাচ্ছিল, বলল মেয়েটা তো এত রাত অবদি বাইরে থাকে না!"

"কে বলেছে?" বলে উঠল সীতা, "আমি আর বিষ্ণুদি মাঝে মাঝে অনেক রাত অবদি ঘাটে বসে গল্প করি!"

"আসলে সব অন্ধকারে ডুবে রয়েছে, কারেন্ট নেই, তাই হয়তো ভাবছে!"

সে হাসল, "তুমি তো থাকো না জ্যাঠা, তাই জানো না, কোনও দিনই রাতে কারেন্ট থাকে না। এ তো বারো মাসের ব্যাপার, দিনেও এই যাচ্ছে এই আসছে।"

"যাই হোক, তুই এবার চলে যা, আমি বাড়ি যাই।"

হঠাৎ কী মনে হল সীতার, সে বিরূপাক্ষ জ্যাঠার হাত চেপে ধরল, বলল, "জ্যাঠা শোনো, তুমি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারো না?"

বিরূপাক্ষ জ্যাঠা ঘাবড়ে গেল তার প্রস্তাবে, "কলকাতা? কলকাতায় বেড়াতে যেতে চাস?"

"না, বেড়াতে নয়, থাকতে, কাজ করতে যেতে চাই!"

"কাজ?" ধোঁয়াশার মধ্যে হেসে উঠল জ্যাঠা, "কী কাজ করবি? তুই কী কাজ জানিস?"

"কেন, ঘর মোছার কাজ, বাসন মাজার কাজ? তুমিই তো বলছিলে একটু আগে কলকাতায় কাজের লোকের ভীষণ অভাব, বাচ্চা রাখার লোকের জন্যে চাহিদা খুব, স্বামী-স্ত্রী অফিসে চলে যায়, বাচ্চা ধরার কেউ নেই, তোমাকে দেখলেই বলে 'গ্রাম থেকে একটা ভাল মেয়ে এনে দিন না দাদা, বড় উপকার হয়!' কী, বলছিলে না?"

বিরূপাক্ষ জ্যাঠার চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলে উঠল, রাগত স্বরে বলে উঠল, "আমাদের ললিতের মেয়ে কলকাতায় গিয়ে ঝি খাটবে? এইটুকু মেয়ে পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াস, এখন কলকাতায় যাওয়ার বাই উঠেছে তাই?"

চাপা স্বরে সেও চিৎকার করে উঠল, "বাই নয়! তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমাদের বাড়ির কী অবস্থা? কেউ ভাল করে খেতে পায় না, মালাটার চিকিৎসা হয় না, একটা ভাইবোন পড়াশোনা করল না, আমাকে জেঠিমা এত বছর টেনেছে, কিন্তু আর কতদিন? অঞ্জনদার বউ এলে সে কি আমাকে বাজে খরচ ভাববে না? আর মায়ের পক্ষে আর একটা পেট টানা যে কী কঠিন ব্যাপার তা যদি তুমি বুঝতে? এই গ্রামের গরিব ঘরের মেয়েরা তো আগেও কলকাতায় গেছে গতর খাটাতে, দিল্লি, বম্বেও গেছে, তুমি আমাকে কলকাতায় একটা কাজ জুটিয়ে দাও, রাতদিনের কাজ, অনেক টাকা মাইনে দেয় বলছিলে? মাইনের টাকা আমি মাকে পাঠিয়ে দেব, আমাদের সংসারে আয় বলতে কিছুই নেই এখন জ্যাঠা, গৌরাঙ্গরা বড় হয়ে কাজে লাগলে না হয় ফিরে আসব আমি গ্রামে? আমি তো সবার বড়, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে..."

"তুই বুঝতে পারছিস না সীতা, ঝিয়ের কাজ করার মতো বাড়ির মেয়ে তুই নোস, ললিতের তো একটা পরিচয় আছে?"

"কোনও পরিচয় নেই!" চোয়াল শক্ত করে বলল সীতা, "ললিত অধিকারী এখন এক বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া কিছু নয়, যে পথেঘাটে পড়ে থাকে, উলঙ্গ ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে খায়, হুঁশহীন একটা মানুষ—এই এখন তার ঠিক পরিচয়, যা চাপা দিয়ে কোনও লাভ নেই আমাদের কারও, বলো, কোনও লাভ আছে?"

জ্যাঠা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "শোন সীতা, আজ তোর মনটা খুব তেতে আছে, আমি তো এখন দিন তিনেক আছি, তুই ছেলেমানুষ, এ সব কথা তুই ভবানীকে বল, ভবানী যদি আমাকে বলে... না, না, ললিতের মেয়েকে আমি গ্রাম থেকে নিয়ে গিয়ে রাতদিনের কাজে লাগাব, আমাকে লোকে ছি ছি করবে রে মা!"

জ্যাঠা তার মাথায় হাত রাখল, "তার চেয়ে তুই বরং আমার সঙ্গে কলকাতায় চল, ক'দিন ঘুরে-বেড়িয়ে আবার ফিরে আসবি, কোথাও তো কখনও যাসনি!"

সীতার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, "তাই তা হলে নিয়ে চলো আমাকে জ্যাঠা, খুব ভাল হয়, বিশ্বাস করো এ গ্রামে এখন আর আমার একটুও থাকার ইচ্ছে নেই!"

আকাশের দিকে কিছুক্ষণ নিথর, নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে রইল চুনি। তারপর বলল, "কলকাতার আকাশের তারাগুলো আমার ঠিক ঠাউর হয় না! কেমন যেন ম্যাটমেটে। আমাদের গ্রামের আকাশ এরকম নয়। সব

কেমন পরিষ্কার দেখা যায়! কালপুরুষ, ধ্রুবতারা সব ঝকঝক করছে!" চুনির গলাটা উদাস হয়ে গেল এরপর, "গ্রামে আমি কত বছর যাইনি। তবু সব মনে আছে। এখনও এত টান!"

'টান' কথাটায় বুক কেঁপে উঠল চপলার। এক মাস পার হয়ে গিয়েছে সে কলকাতায় পা রাখার পর। গ্রামের প্রতি টান কই অনুভব করেনি তো? সেই কোন যোলো-সতেরোতে বিয়ে হয়ে বাপের বাড়ির গ্রাম জামবেলিয়া পিছনে ফেলে চপলা কুমিরমারি গিয়েছিল বঙ্কিমের হাত ধরে। তার বিয়ে হতে না হতেই জন্ডিস হয়ে মারা গেল বাপটা, বছর তিনেক হল জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরেনি বড়ভাই নিমাই। বাঘে নিল কি সাপে কাটল—কোনও হদিশ নেই। ছোটভাই ষষ্ঠীটা বরাবরের বদমেজাজি। চপলার সঙ্গে কোনও দিন বনত না। তবু মায়ের কাছে বছরে দু'বার নদী-নালা ঘুরে গিয়ে পৌঁছোত সে ঠিকই। সম্পর্ক বলতে ওইটুকুই ছিল বাপেরবাড়ির সঙ্গে। কিন্তু আট পার হয়ে নয় বছরের বিবাহিত জীবনেও শ্বশুরের ভিটে যে তার নিজের জায়গা হয়ে ওঠেনি তা চপলা বুঝল। বঙ্কিমকে যমে টানার পরের মুহূর্তেই প্রায়। ষষ্ঠীকে তার দুই ভাশুর একযোগে জানিয়ে দিল, যুবতী বিধবা সে, ভাশুরদের সংসারে তার ঠাঁই নেই। দানাপানি জোগাবে কে? মেয়েছেলে পাহারা দেবে কে? ষষ্ঠী তো রেগে অগ্নিশর্মা, "দেখি তোর ঘর থেকে তোকে কে তাড়ায়? গ্রামে আইনকানুন নেই? সমাজ নেই? লোকাল কমিটি নেই?"

কিন্তু চপলার নিজেরই ভরসা হয়নি, শুধু একটা দরমার ঘর আঁকড়ে পড়ে থেকে তার কী লাভ? মেজ ভাশুর লোকটা গুন্ডা। তাকে তাড়াবার জন্যে বড়-মেজ—দুই জায়েরই এখন গলায় গলায় ভাব। উনিশ দিনের কোণঠাসা বিধবাকে ডেকে শ্বশুরটাই শেষে পথ বাতলে দিল বাঁচার। কাশতে কাশতে বুড়ো বলল, 'মহেন্দ্রকে ধরে কলকাতায় চলে যা চপলা। একটা কাজ যদি জুটে যায় তা হলে খেয়েপরে তোর চলে যাবে। এখানে তোর ভবিষ্যৎটা কী?'

ভবিষ্যৎ? বঙ্কিমের রোজগারপাতি কিছুই তেমন ছিল না। মন বসাতে পারত না কোনও কাজে। নেশাভাং করত না ঠিকই কিন্তু ওই, মাসে দশ দিন কাজ করে ফেলল তো তারপর কেউ কাজে ডাকলেও আর যাবে না। তবু সেই বঙ্কিমই ছিল তার ভবিষ্যৎ! কখনও বাঁধের কাজ করছে, কখনও অন্যের জমির ফসল কাটছে, কখনও চড়ে বসছে জেলে নৌকোয়, ঘন পাটা জাল দিয়ে ধরছে বাগদার পোনা। দু'পয়সা এল তো এল, নইলে না এল— বঙ্কিম চলল গঙ্গাসাগর মেলায়! কিংবা বাঁক কাঁধে ছুটল শিবরাত্রি করতে। পুতুলনাচ আর লাঠিখেলা ছিল বঙ্কিমের শখ। বঙ্কিম তাকে মাথায় তুলে নাচতও না আবার হেলাছেদ্দাও করত না। চপলা ধরে নিয়েছিল ছেলেপুলে হল না তার তাই হয়তো এমন আলগা ভাব বঙ্কিমের। কিন্তু তাই বা জোর দিয়ে বলা যায় কি? সে কত যেতে চাইত সাতবিবির থানে, রাধাবল্লভজিউর মন্দিরে, বাবন পিরের মাজারে। তেলপড়া, জলপড়া, বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারে দলবেঁধে নৌকোয় চড়ে বনের ধারে গিয়ে বনবিবির নামে মোরগ মানত— এ সব করতে চাইত চপলা। কিন্তু বঙ্কিমের কোথায় ছিল তাতে উৎসাহ?

সেই বঙ্কিম— টগবগে, ছটফটে যুবক, চাঁদ মোল্লার দলের সঙ্গে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল হাঁড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে। আর চরে আটকে গিয়েছিল নৌকো। নৌকো ঠেলে তুলবে বলে লাফ দিয়ে জলে গিয়ে পড়েছিল বঙ্কিম। তখনই হাত পিছলে যায় ওর। হাত পিছলে গিয়ে মাথাটা সজোরে ধাক্কা খায় নৌকোর খোল বাঁধাই করার লোহার পটিতে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায় বঙ্কিম, মাথা ফেটে রক্ত ছোটে স্রোতের মতো! সেই জ্ঞান আর ফেরেনি। পনেরো দিন এই হাসপাতাল, ওই হাসপাতাল ঘুরে যে দিন কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে হাত-পা

ছেড়ে দিয়ে প্রায় মরার মতো শুয়ে থাকা অচৈতন্য মানুষটাকে—সে দিনই যাবতীয় দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে মৃত্যুর কোলে নিজেকে সঁপে দেয় বঙ্কিম! চপলা তখন স্বামীর পা ধরে বসে আছে গঙ্গারিডির হাসপাতালের মেঝেতে।

তবু শ্বশুরের কথাটা মনে ধরেছিল তার। গ্রামতুতো ভাই মহেন্দ্রর কাছে কথাটা পেড়েছিল শ্বশুরই। এ বাড়ির সঙ্গে মহেন্দ্রকাকার বহু বছরের সম্পর্ক। এ বাড়ির ব্যাবসার কাজেই আন্দামানে থাকত মাহেন্দ্রকাকা এককালে। খুব বিশ্বস্ত লোক ছিল মহেন্দ্রকাকা এদের কিন্তু শরীর রোগজর্জরিত হয়ে পড়ায় কাম কাজ ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল মানুষটাকে।

একটু গাঁইগুঁই করে পুরনো মনিবের চরণে অকালবিধবা চপলাকে নিয়ে এসে ফেলল মহেন্দ্রকাকা শেষমেষ। প্রায় আট-দশ বছরের সংসারের চৌহদ্দি পার হয়ে অচেনা নগরীর অচেনা পরিবেশে আরও অচেনা মানুষজনের গার্হস্থ্যের ভিতর প্রবেশ করল যখন চপলা, তখন পিছুটান বলতে তার এতটুকু কিছু ছিল না। এক মাস হয়ে গিয়েছে—গ্রামের জন্যে তার কোনও হা-হুতাশ নেই! যেমন রয়েছে এই মেয়েটার—চুনির!

ঠিক এক বছর আগে মারা গিয়েছিল এ বাড়ির বুড়োকর্তা। গতকাল ছিল তাঁরই বাৎসরিক। মেলা লোকজন, আত্মীয়বন্ধুর তাই সমাগম ঘটেছিল গতকাল বাড়িতে। বাড়ির সদর দরজার দু'পাশের মোটা থাম দুটোকে রজনীগন্ধার মালা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সাজানো হয়েছিল। বুড়োকর্তার ঘরটাকে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাদা ফুল দিয়ে। সাদা পদ্মফুল। বিরাট উঁচু পালঙ্কের ওপর সাদা ধবধবে চাদর টানটান করে পেতে তাকিয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছিল কর্তার সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো এই বড় ছবি। বাঘের মতো গোল মুখ কর্তা জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে ছবির মধ্যে দিয়ে। সকাল থেকে মাইকে স্তোত্রপাঠ করছিল কোনও এক আশ্রমের দুই প্রবীণ মহারাজ। বুড়োকর্তার তিন ছেলে, তিন বউ, তিন মেয়ে, তিন জামাই ব্যস্ত হয়ে আপ্যায়ন করছিল সাদা ধুতি, সাদা পাজামা পাঞ্জাবি কিংবা সাদা সাদা শাড়ি পরে আসা অতিথি অভ্যাগতদের। সে এক এলাহি ব্যাপার! পনেরো রকমের নিরামিষ রান্না, দশ রকমের মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হল নিমন্ত্রিতদের। ছাদে ম্যারাপ বেঁধে খাওয়ানো হল। বিরাট ছাদ, ছাদে মানুষ বাস করে এমন ঘরের মতো বড় পাখির খাঁচা, তাতে কত জাতের পাখি। সেই সব পাখি দেখাশোনার কাজ আপাতত চপলার।

ব্যাপারস্যাপার যত দেখে চপলা অবাক হয়ে যায়। মরে হেজে যাওয়া মানুষের জন্যে এত কাণ্ড? এই যে চুনি, সে-ও তো রাতদিন 'দাদু দাদু' করে অস্থির।

কাল ধুমধাম করে বাৎসরিক সম্পন্ন হল কর্তার এ বাড়িতে। আর আজই আবার সকালবেলা বাড়িসুদ্ধ সব লোক চলে গেল মাথাভাঙা বলে মনিবদের যে দেশ, সেখানকার গ্রামে। বুড়োকর্তার নামে সেখানে একটা ছেলেদের ইস্কুল খোলা হয়েছে। তারই উদ্বোধন। চাকরবাকর একদল গিয়েছে সঙ্গে, একদল বাড়িতে থেকে গিয়েছে। চুনিকে বুড়োকর্তা যতটা ভালবাসত কর্তার ছেলেবউরা ততটা গ্রাহ্য করে না। চুনিকে তাই হয়তো নিয়ে যাওয়া হয়নি!

অদুরেই প্রিয়া সিনেমা হল। নাইট শোয়ের লোকজন জমতে শুরু করেছে হলের সামনে। বাড়িটা দেশপ্রিয় পার্কের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, পার্ক, সিনেমা হল সবই পরিষ্কার দেখা যায়। আজ শনিবার তাই রাতের শোয়-এ হলের সামনে এত ভিড়। এক মাস থেকেই চারপাশটা বেশ জেনে গিয়েছে চপলা। পরশুদিন তো সে একাই বেরিয়ে গড়িয়াহাটের হকার্স কর্নার থেকে নিজের জন্যে সায়া, ব্লাউজ কিনে এনেছিল। বড়মামি মানে

বাড়ির বড়বউ হুকুম ঝেড়েছিল—পুজোর কাজকর্ম করতে হবে তাই শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ সব আনকোরা নতুন পরতে হবে। একটা ঝুল বেশি হলুদ সায়ার শখ ছিল চপলার সেই কবে থেকে। কিনে ফেলল ষাট টাকা দিয়ে। টাকা তো বড়মামিই দিয়েছে।

চুনি আর সে, দু'জনে ঝুঁকে পড়ল ছাতের আলসের ওপর। পার্কের ভিতরটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে এখন। ফুচকা, আলুকাবলিওয়ালা কখন চলে গিয়েছে পশরা গুটিয়ে। কানঢাকা টুপি, মাফলারে চাপানো একদল বৃদ্ধ পরস্পর গল্প করতে করতে বেরিয়ে আসছে পার্কের গেট দিয়ে। এ বাড়ির পাশেই একটা গাড়ি সাজানোর জিনিসপত্র বিক্রির দোকান। কাচের দরজাটরজা দেওয়া ঝকঝকে— যাকে বলে শোরুম।চপলা দেখল দোকানটার অল্পবয়েসি মালিক ছেলেটা বেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তার এ পাশে কোমরে হাত দিয়ে। কর্মচারীরা দোকানের ঝাঁপ ফেলে বড় বড় তালা মেরে দিল। ছেলেটাকে আগেও দু'-তিনবার দেখেছে চপলা। সকালে দোকান খোলার সময়। দেখতে খুব সুন্দর, লম্বা, ফরসা। বড় গাড়ি নিজে চালিয়ে আসে। চোখে কালো চশমা থাকে তখন। ছেলেটা অনায়াসে সিনেমার নায়ক হতে পারত।

চুনিও যে ছেলেটাকেই দেখছে বোঝা গেল ওর কথায়, "দারুণ দেখতে, তাই না চপলাদি?"

তার লজ্জা লাগল খুব, অস্ফুটে বলল, "হ্যাঁ!"

"তুমি তো বড়মাসির ছেলেকে দেখনি। আরও দুর্দান্ত দেখতে। আমেরিকায় থাকে তো, পুরো সাহেব বনে গেছে। আমার সঙ্গে ছোটবেলায় খুব খেলত। টনি আর আমি তো একবয়েসি। এখন অবশ্য আর কথা বলে না!"

বড়মাসি মানে বুড়োকর্তার বড় মেয়ে। চপলা ভাবল এ বাড়িতে সকলেই দেখতে দারুণ, টকটকে রং, লম্বাচওড়া গড়ন, মেয়েগুলো তো এক-একটা পরি। আর তেমনি সাজপোশাক। একদিন মেজমামার বড়মেয়ে নিম্মির ঘরে ঢুকে আয়নায় সে নিজেকে আর নিম্মিকে পাশাপাশি দেখেছিল, ভূত দেখার মতো চমকে গিয়েছিল চপলা সে দিন। জিরজিরে খাঁচা, ক্ষয়ধরা শরীর, কোটরে সেঁধিয়ে যাওয়া চোখ—এ কে? সে নিজে? তার ধারণা ছিল না তাকে এত খারাপ দেখতে! সে-ও মানুষ, নিম্মিও মানুষও?

চুনিকে সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এ বাড়িতে ছোট থেকে আছ?"

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল চুনি তার মুখোমুখি, "সেই দশ বছর বয়েসে এসেছিলাম পরানমামার হাত ধরে। তেরো বছর একভাবে আছি!" চপলা যারপরনাই অবাক হল। এত কথা সে জানত না চুনির সম্পর্কে। এত কথা কইবার সুযোগও পায়নি কখনও। রাতে একতলার ঘরে সে আর চুনি পাশাপাশি শোয় কিন্তু সারাদিনের খাটাখাটুনির পর বিছানায় শরীর পাতামাত্র ঘুমে ডুবে যায় উভয়েই।

সে বলল, "সেই দশ বছর বয়েসে বাপ মাকে ছেড়ে তুমি পরের বাড়িতে কাজ করতে লাগলে? বাব্বা!"

নিমেষে চুনির দু'চোখ ছলছল করে উঠতে দেখল চপলা, "আমার মতো মেয়ের মুখ বাপ মা-তেও দেখতে চায় না চপলাদি! কাছে রাখতে চায় না!"

সে চুনির মুখটা আবছা আলোয় খুঁটিয়ে দেখল। বেশ তো মুখখানা, বেশ একটা তেজ আছে চেহারায়, লালিত্য আছে। গ্রামের দিকে হলে তো চুনির পিছনে লাইন পড়ে যেত। কতটা চুল তার ওপর। এই মুখ বাপ-মা দেখতে চাইবে না কেন বুঝল না সে। "আমি কত অপয়া তা তো জানো না!" বলল চুনি নিজেই, "আমি যে দিন জন্মেছিলাম সে দিনই নদীতে ডুবে মারা গেছিল আমার বড় ভাই। চোদ্দো বছরের ছেলে, বাপ-মা'র

আশা-ভরসা। আর দুটো বছর কাটলেই যে বাপ মাকে রোজগার করে খাওয়াতে পারত! জন্মেই মরে যায় সে একরকম, অত বছর মুখের খাবার তুলে খাইয়ে বড় করা ছেলে মারা যাওয়া মানে গরিবের ঘরে বিরাট লোকসান, তাই না?" চপলা মাথা নাড়ল, "সে তা লোকসানই বটে!"

"তবে? তারপর আমার যখন দশ বছর বয়েস তখন আমারই দোষে মারা গেল আমার ষোলো বছরের দিদিটা! জলঙ্গির ধারে ঘর ছিল আমাদের, বেড়ার ঘর। খেতে দিতে পারত না বাবা কিন্তু দিদির তবু খুব আদর ছিল জানো? সুন্দর দেখতে ছিল তো। জমিজমাওয়ালা ঘর থেকে সম্বন্ধ এসেছিল একটা, বিয়ের তখন প্রায় ঠিক। সে সব দিনে আমরা একবেলাও খেতে পেতাম না, মা সকালে এক হাঁড়ি ভাত করত, রোদ ওঠার আগে তাই খেয়ে নিতাম সবাই, সারা দিনে আর কিছু খাবার জুটত না! একদিন হল কী, বেলায় ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম হাঁড়িতে একজনের মতো ভাত। বাবা-মা দু'জনেই গেছিল কাজের সন্ধানে, দিদি গেছিল নদীতে স্নান করতে। ভাত দেখেই আমার পেটে যেন আগুন ধরে গেল। ছোট ছিলাম তো—কার ভাত, কে খায়নি এ সব মনেও এল না। গোগ্রাসে গিলে ফেললাম সব ক'টা ভাত চপলাদি। দিদিই সে দিন খায়নি তখনও। স্নান করে এসে হাঁড়ির ঢাকা খুলে দিদি দেখল হাঁড়ি ফাঁকা। আমি ঘরেই ছিলাম, দিদি আমার দিকে তাকাল একবার। সেই দৃষ্টি আমি কোনও দিন ভুলতে পারিনি। থরথর করে কাঁপছিল দিদির শরীরটা, ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছিল, আমাকে বলল, 'তুই বেরো ঘর থেকে!' ভয়ে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম বাইরে। দিদি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি নদীর ধার ধরে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে গিয়ে বসে রইলাম। তারপর যখন ফিরলাম তখন বেলা মরে গেছে। দেখি আমাদের বাড়ির চাতালে লোকে লোকারণ্য। দিদিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মাটিতে, বাপ-মা আছাড়ি বিছাড়ি করে কাঁদছে। চালের বাঁশ থেকে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিল দিদি। আমার ওপর নাকি নিজের খিদের ওপরই রাগ করে, অভিমান করে আত্মহত্যা করে ফেলল দিদিটা। বাপ-মা আমাকে আর কাছে রাখল না! আমার দোষেই তো ঘটল এত বড় সর্বনাশটা? মামার হাত দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল আমাকে। মামা আমাকে এ বাড়িতে কাজে ঢুকিয়ে দিল। প্রথম চার-পাঁচ বছর মামা এসে নিয়ে যেত আমার মাইনেটা। তারপর হঠাৎ মামার আসা বন্ধ হয়ে গেল। কে জানে মরেটরে গেছে বোধহয়?"

"আর তোমার বাবা-মা?"

"কোনও খবরই জানি না। মামাই বলেছিল বাবা-মা আর ওই গ্রামে নেই, চক্রধরপুর না কোথায় চলে গেছে। তাদের খোঁজ আমি এখন কীভাবে পেতে পারি বলো?"

কথা বলতে বলতে আরও বেড়ে গিয়েছে রাত। রাস্তাঘাট একটু একটু করে এখন আরও ফাঁকা। চুনি বলল, "সত্যি কথা বলতে দাদু আমাকে এত ভালবাসত, দাদুর আশ্রয়ে আমি এত নিশ্চিন্তে ছিলাম এত বছর যে বাবা-মা'র খোঁজ নেওয়ার কথা আমার মনেও আসেনি চপলাদি! বরং বলতে পারো বাবা-মা'র ওপর আমার নিজেরই কম রাগ নেই। হয়তো দেখা হলে আমি নিজেই মুখ ঘুরিয়ে নিতাম। কিন্তু এখন দাদু মারা যাওয়ার পর মনটা কেমন কু গায়, ভয় ভয় করে। কতদিন যে এ বাড়িতে থাকতে পারব তা জানি না। দাদু তো আমার নামে বেশ কিছু টাকা রেখে গেছে। আমার বিয়ের টাকা। আমার খালি মনে হয় মামারা আমাকে ফাঁকি দেবে। দাদু তো বারবার বলে গেছিল আমার জন্যে যেন ছেলে দেখা হয়। খরচপাতি করে বিয়ে দেওয়া হয়, কই মামারা তো উচ্চবাচ্যও করে না তা নিয়ে? কে জানে কী মতলব?"

"এদের কি টাকার অভাব চুনি যে তোমাকে ঠকাবে?" অবাক হয়ে বলল চপলা।

“কী জানি। কিন্তু মনে মনে আমার বড্ড চিন্তা। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস তো হল আমার। বিয়ের চেষ্টা করছে না কেন? খাটিয়ে খাটিয়ে আধবুড়ি করে তারপর বিয়ে দেবে নাকি? তখন কোন রাজার ছেলে এসে বিয়ে করবে আমায়? তুমি তো জানো না কিছু—দাদু মারা যাওয়ার পর থেকে মামাদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য চলছে, অনেক ঝগড়া বিবাদ হয়ে গেছে এর মধ্যে। বড়মামির সঙ্গে সৈকতের কথা নেই দ্যাখো না? মামির মুখে মুখে একবার সে কী আঙুল নেড়ে নেড়ে তর্ক! তোমাকে যে এত কথা বলে ফেললাম তুমি আবার কাউকে বলে দিয়ো না যেন? তা হলে আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে।”

“না, কাকে আবার বলতে যাচ্ছি?” বলল সে।

“আমার বিয়েটা হয়ে গেলে কত ভাল হত তুমি বলো দেখি? এই তো পাশের বাড়ির অন্তরা। ও-ও তো সেই কোন ছোট থেকে এ বাড়িতে ছিল। ওকে কেমন বিয়ে দিল দ্যাখো উদয়ন দত্তরা। কত কিছু দিয়েছে জানো? খাট, গদি, বরের সোনার আংটি, এক সুটকেস ভরতি শাড়ি। অন্তরা তো এখনও আসে মাঝে মাঝে। শাঁখা, সিঁদুর পরে ওকে কী মিষ্টি যে দেখায় তোমায় কী বলব? আমার যে কী হবে তাই ভাবি। কী আছে কপালে কে জানে? তোমার তো তবু মা বেঁচে। ভাই আছে একটা। বোন আছে। আমার যে কোথাও কেউ নেই!”

চপলা বিড়বিড় করে ওঠে, “আমারও কেউ থেকেও কেউ নেই চুনি। মা তো প্রায় চোখেই দেখে না। আর ভাই? সে একবেলাও দিদিকে ভাত দেবে কি না সন্দেহ!”

এ কদিনেই চপলা অনেক কিছু বুঝে গিয়েছে—যাকে বলে বাস্তব! নিজের সংসারে তাকে গতরে খাটতে হত ঢের, আর পেটপুরে খাওয়াও জুটত না। এখানে সেই তুলনায় যা কাজ তা তার গায়েই লাগে না, উপরন্তু ফ্যানের তলায় ঘুমোয়, ভাতের পাতে মিষ্টি দই খায়। এক মাসেই হাতে হাজার টাকা জমে গিয়েছে। টিকে থাকতে পারলে পাঁচ বছরে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা হবে তার? ভেবেই ঘাম ছুটে যায় চপলার। বঙ্কিম মরে ভাল হল না খারাপ এই প্রশ্নে দ্বন্দ্ব হয়! ছিঃ, ছিঃ। তার কি মন বলে কিছুই নেই নাকি?

মন ছিল, মন একশোবার ছিল—মাথার চোট পাওয়ার পর সে বঙ্কিমের মাথা কোলে করে দিনের পর দিন বসে থাকেনি? কেঁদে ভাসায়নি বুক? প্রার্থনা করেনি বরটা বেঁচে উঠুক? স্নান-খাওয়া মাথায় উঠেছিল তার তখন। তারপর স্বামীর মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছিল চপলা। হ্যাঁ, পাথর হয়ে বসে থাকলে অবশ্য চলত না। আসলে পরিস্থিতি। যার যেমন ভাগ্য! একই মায়ের পেটে জন্মে কই তার বোন শুভঙ্করীর জীবনটা তো এত সংগ্রামের নয়? অথচ চার বছরের ছোট বোন শুভঙ্করী ছিল কেমন একটা—ল্যালাভোলা মতো! বাপ-মায়েই ডাকত খেপি বলে। তার ওপর কুঁড়ের বাদশা। গরিবের মেয়ে অত কুঁড়ে হলে হয়? অত ঘুমকাতুরে হলে চলে? অত বেয়াড়া, অত লাজলজ্জাহীন হলে চলে?

অথচ সেই শুভঙ্করীর ভাগ্য দ্যাখো? চোদ্দোয় পা দিতে না দিতে কেমন যেচে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গেল এক সম্পন্ন ঘর থেকে। স্বামী বটে উপেন—কেমন তাংড়ে তাংড়ে রাখে পাগলি-ছাগলিকে। আদরে, ভালবাসায় অস্থির—যা চায় তাই পায় শুভঙ্করী। আবার এ দিক নেই সে দিক আছে মেয়ের। মাঝে মাঝে রাগ-ঝাগ করে দুমদাম এসে হাজির হয় জামবেলিয়ায়। তখন উপেন এসে এটা সেটা কিনে, লিপস্টিক, নেলপালিশ, কিনে উপহার দিয়ে, হাতেপায়ে ধরে সাধাসাধি করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায় বউকে।

এ বাড়িতে প্রাচুর্যের শেষ নেই। ঘরে ঘরে এসি চলে। কতগুলো গাড়ি। সে তো মন্মথর সঙ্গে লেক মার্কেটে বাজার করতে যায় গাড়ি চড়ে। আগে এদের জাহাজের ব্যাবসা ছিল। আন্দামানে জাহাজ চলত। এখনও আন্দামানেই বেশি কাজকারবার। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি বানানোর কাজ। তবে বড়মামির নজরদারির চোটে কিচ্ছুটি অপচয় করার উপায় নেই। কাজের লোকেদের জন্যে একটা মোটা চালের ব্যবস্থা আছে। সেই চালও সে থালা ভরতি করে খায় বলে হাসাহাসি করে বিপিনরা। তা হাসাহাসি করুক, পেটে তার অনেক বছরের জমানো খিদে। বড়মামি তো বলেই দিয়েছে, 'খেতে পারলে খাও, নষ্ট না করলেই হল!'

প্রতিদিনের মতো চুনি শুতে এসে চুল ছানতে বসল। আজ ওর মনটা ভার ভার। অন্যান্য দিন কাজের ব্যস্ততা থাকে, আজ নিজের কথা ভাবার সময় পেয়েছে মেয়েটা। চুনি বলল, "শ্বশুরবাড়ি হোক, বাপের বাড়ি হোক, তুমি চপলাদি গ্রামের সঙ্গে সম্পর্কটা রেখো। কেউ খোঁজ করুক না করুক তুমি খোঁজখবর কোরো, যোগাযোগ রেখো। ছুটি-টুটি করে বাড়ি যেয়ো মাঝে মাঝে। নইলে কিন্তু আমার মতো অবস্থা হবে।"

একটা অস্বস্তি হচ্ছে পেটের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে। চপলা ঠিক খেয়াল করেনি। এখন হঠাৎ খামচে উঠল তলপেটটা তার এমন যে এক হ্যাঁচকায় উঠে বসল চপলা বিছানায়। সে ককিয়ে উঠল 'মাগো!'

চুনি বলল, 'ও মা, কী হল তোমার হঠাৎ?'

চপলা জানে কী হল, জানে কী হচ্ছে, এবার কী হবে! খুব ভয় পেয়ে গেল সে; কিন্তু চুনিকে উত্তর দেওয়ার আগেই টের পেল চাক ভাঙছে ভিতরে। তাকে এক মুহূর্ত সময় দিল না তার শরীর। হুড়মুড় করে ছুটে এসে রক্তস্রোত কাপড়চোপড় ভাসিয়ে দিল তার। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল চপলা, পারল না। পেটের ভিতর যেন জাঁতা পেষা চলছে। যন্ত্রণা মাথায় চড়ে গেল একদম। বিছানায় শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল সে।

"কী হল? কী হল?" বলতে বলতেই চুনি দেখতে পেল রক্তে শাড়ি ভিজে উঠেছে চপলাদির। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে চাদরে, বিছানায়, ভীষণ ভয় পেয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল চুনি!

ছোটবেলা থেকেই এই রোগ চপলার। যে বয়েসে মেয়েদের মাসিক হয় সেই বয়েস পার করে একদিন হঠাৎ ঘটেছিল ঘটনাটা। শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে রক্তের বান ডেকেছিল। বাপ-মায়ে ভেবেছিল মেয়ে এবার ফল ধরতে তৈরি। কিন্তু না ছ'মাস সাত মাস কেটে গেল আর ঘটল না রক্তপাত। তারপর আবার একই কাণ্ড! ধীরে ধীরে বোঝা গেল চপলার শরীরের এইটাই ধরনধারণ, সাত-আট মাস, কখনও বছর ঘুরে গিয়ে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। যখন হয় আট দিন দশ দিন বিছানা থেকে উঠতে পারে না চপলা। তেলপড়া, জলপড়া, গুনিনটুনিন করেও এই বালাইয়ের হাত থেকে মুক্তি ঘটেনি তার। বিয়ের পরও কতবার ঘটেছে এমন। বঙ্কিম তার সেবা করেছে লোকে কী বলছে কানে না তুলেই! ছ'মাস আগে শেষবার মাসিক হয়েছিল চপলার, বঙ্কিমের মৃত্যুর পর এই প্রথম।

কোনওমতে চুনিকে চপলা বলল চুপ করতে, "চেঁচিয়ো না! আমার এরকম হয়। যেমনি যন্তন্না, তেমনি গলগলিয়ে রক্ত বেরোয়। আর ভাল লাগে না আমার। শরীরে এত রক্ত আসে কোথা থেকে তাই ভেবে পাই না আমি!"

চুনি গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখে একটা ঘেন্না ঘেন্না ভাব। খুব স্বাভাবিক। পৃথিবীসুদ্ধু লোক তো তার মা বা স্বামী নয়? চুনি বলে, "চাদরটাদর যে সব মাখামাখি হয়ে গেল চপলাদি?"

চপলা করুণ চোখে তাকাল, "জানি, আমি উঠছি, ধুয়ে দিচ্ছি সব। রাতটা আমাকে বোধহয় বাথরুমেই বসে থাকতে হবে! আমাকে একবারটি একটু ধরে বাথরুমে নিয়ে যাবে?"

চুনির মুখ দেখে মনে হল এইবার অসন্তুষ্ট হচ্ছে, তবু এগিয়ে এসে টেনে তুলে ধরল তাকে। বলল, "এ কী ঝামেলা বাধালে বলো তো চপলাদি তুমি?"

বাথরুমে পৌঁছে চপলা উপুড় হয়ে পড়ল। চুনি বলল, "এমন অসুখ আছে জানলে মামিরা তোমাকে রাখবে না!"

তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল, "রাখবে না?"

"কেউ রাখে?"

"আমি সব কেচে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি চুনি। তুমি কাউকে বোলো না! এ তো ন'মাসে ছ'মাসে হয়।"

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল চুনি, "তাই হয়? এ সব কথা কি চাপা থাকে? তার ওপর এ বাড়ির যা বাছবিচার! বড়মামি শুনলেই তোমাকে দেশে রওনা করিয়ে দেবে।"

নিজের রক্তের ওপর বসে পড়ে দু'হাঁটুর মাঝখানে মুখ গুঁজে ছিল চপলা, "ও কথা বোলো না চুনি! আমার অবস্থা তোমার অবস্থা কি আলাদা? তোমারও কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, আমারও কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই!"

চুনির অভিজ্ঞতা তার তুলনায় বেশি। পরের বাড়ি এত বছর একভাবে টিকে থাকা মানে অনেক কঠোর পথ পেরোনো, অনেক ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দেওয়া। অনেক চালাকচতুর না হলে, অনেক সহ্য ক্ষমতা না থাকলে কেউ অন্যের সংসারে প্রায় অশরীরীর মতো মিশে গিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, তাও এত দীর্ঘ সময়। দাদু তাকে ভালবাসত কি এমনি? কেমন বুদ্ধি করে দাদুকে হাত করে ফেলেছিল সে? সেই এগারো-বারো বছরের উঠি উঠি স্তন দাদু হিরের আংটি পরা হাত দিয়ে ঘেঁটেঘুটে কম দেখেছে? সে তো হজম করেছে চুপচাপ, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। কাউকে কিচ্ছুটি বলেনি, দাদুর সামনে থেকে পালিয়েও যায়নি। যত্ন করে পা টিপে দিয়েছে দাদুর রাত জেগে। তারপর তো দাদু অথর্ব হয়ে গেল স্ট্রোকে। তখন মাথার কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে হাজার গল্প কে করত দাদুর সঙ্গে? এই চুনি পবক! এ বাড়ির ঘরে ঘরে কোথায় কী ঘটছে সব খবরাখবর কার কাছে পেত বুড়ো? চুনিই না? মামা-মামিরা সে সব আঁচ করত বলেই তো তাকে অত পছন্দ করত না। কিন্তু ততদিনে দাদুর ওপর তার আর তার ওপর দাদুর বেশ মায়া পড়ে গিয়েছে। তাই সে দাদুকে ছেড়ে মামাদের দলে ভিড়তে পারেনি!

এই সব অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ চুনি। চপলার অশ্রু তাকে টলাতে পারল না। চুনি বলল, "তোষকে যদি রক্ত লেগে গিয়ে থাকে তা হলে কী হবে বলো তো? আমার কাছে যা আছে তোমাকে দিচ্ছি এনে। চাদরটা কেচে দিয়ো চপলাদি, আর আমি দোতলায় শুতে চললাম। বিপিন কিংবা ভবতোষদা যদি এ দিকে আসে কী লজ্জার কথা হবে তাই ভাবছি! বাব্বাঃ! এমন যে হতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না! এত রক্ত? আর কী আঁশটে গন্ধ বাপ রে! উঃ!"

রাতটা চপলার কাটল বাথরুমের মেঝেতে বসেই। চুনির উগ্র কথাবার্তা, ব্যবহার দেখে সে ভেবেছিল বিকেলে কর্তারা ফিরলেই তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়ে একতলার ঘরে শুয়ে রইল সে সারা দিন। তা ছাড়া তার ওঠার ক্ষমতাও ছিল না। সন্ধে নাগাদ সে ঘরে শুয়েই টের পেল মনিবরা দল বেঁধে ঢুকছে। নিঝুম বাড়িটা আবার প্রাণ পেল যেন কথাবার্তা, হাঁটাচলা, জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার শব্দে। বাড়ির সামনে কেউ গাড়ি রেখে চলে গিয়েছে। এই নিয়ে একচোট চেঁচামেচি করল সৈকত। সে ভয়ে ভয়ে শুয়ে রইল গুটিসুটি মেরে। কিন্তু রাতে তাকে চিড়ে, দুধ, কলা খেতে দিয়ে চলে গেল চুনি যে সেই একবার, এ ছাড়া কেউ এল না বা তার খোঁজ নিল না। মনে আশার সঞ্চার হল চপলার।

দিন চারেক পরে রক্ত সম্পূর্ণ ধরে গেল তার। সকালে উঠে স্নানটান সেরে কাচা শাড়ি, সায়া পরে ভয়ংকর ধ্বস্ত, ক্লান্ত শরীরটা টেনে টেনে চপলা, যখন দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, চুনি তার পথরোধ করে দাঁড়াল, "তোমাকে বলা হয়নি। বড়মামি তোমাকে জবাব দিয়েছে। আর দোতলায় উঠতে হবে না। তুমি নীচে গিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করো, আমি টাকাপয়সা হিসেব করে নিয়ে আসছি। বিপিন কিছুটা পথ তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে!"

সে থমকাল, তাকাল চুনির মুখের দিকে, দুর্বল শরীরের সব শক্তিটুকু জড়ো করে হাত চেপে ধরল চপলা চুনির, "আমি বড়মামির সঙ্গে কথা বলব, তুমি সরো তো, সরো!" রাগে, দুঃখে মাথা গুলিয়ে উঠল তার। চুনির মধ্যে কিন্তু কোনও ভাবান্তর হল না। একটা আলতো ঠেলায় চপলাকে দু'সিঁড়ি নামিয়ে দিল চুনি। ভুরুতে ভাঁজ, চোখে প্রচণ্ড বিরক্তি, একটাও অতিরিক্ত কথা খরচ করল না চুনি।

কুমিরমারি যাওয়ার কথা চপলা ভুলেও ভাবল না একবারও, বিপিন তাকে ক্যানিং-এ ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে লোক ধরে ধরে জিজ্ঞেস করে সে লঞ্চে উঠল জামবেলিয়া যাবে বলে। সন্ধে নাগাদ সে পৌঁছেও গেল বাপের বাড়ি। লঞ্চ থেকে নেমে নদী পারাপারের জন্যে খেয়ায় উঠল চপলা। তারপর শর্টকাটের রাস্তা ধরে পিছনের কাজিপাড়া দিয়ে ঘুরে বাড়ির চৌহদ্দির ভিতর প্রবেশ করল। অন্ধকার গ্রাম, দাওয়ায় কুপি জ্বলছে, গিয়ে দাঁড়াতেই খিলখিল হাসি শুনতে পেল সে—শুভঙ্করী! সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল যেন চপলার—ওঃ, প্রাণে আর আনন্দ ধরে না, না? সন্ধেবেলা হাসছে কেমন দ্যাখো! যেন শাঁকচুন্নি! ছোট ভাই ষষ্ঠীরও অমনি খ্যাঁকখ্যাঁকহাসির শব্দ পেল সে। হাসবেই তো, শুভঙ্করীর সঙ্গে তে বসে হাসিঠাট্টা করবেই। শালাকে উপেন সাইকেল কিনে দিয়েছে না? আর যে একটা মায়ের পেটের বোন, সে শোক থেকে উঠল কি উঠল না কত কত যোজন দূরে পরের বাড়ি ঝি খাটতে গেল, সে মরল কি বাঁচল—তার খবর তো তুই ভাই হয়ে একটাবার নিতে গেলি না? কী স্বার্থপর, কী পাষাণ হৃদয়! চপলার মনে হল এক্ষুনি কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিন্তু সে কিছুই তেমন করল না—ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল কুপির আলোর আওতার মধ্যে, থমথমে গলায় বলল, "শুভা কবে এলি?"

শুভঙ্করী আর ষষ্ঠী দু'জনেই চমকে উঠে দাঁড়াল তাকে দেখতে পেয়ে। ভাইকে খুব ভাল করে চেনে চপলা। সে অন্য কেউ আর একটা কথা বলে ওঠার আগেই শাল সরিয়ে ব্লাউজের ভিতর হাত চালিয়ে বের করে আনল বুকের ওমে গরম হয়ে থাকা এক বান্ডিল নোট। কড়কড়ে দু'হাজার টাকা! তার, চপলার রোজগার! টাকাটা ষষ্ঠীর দিকে বাড়িয়ে ধরে সে গম্ভীরভাবে বলল, "দু'হাজার আছে, ভাল করে রেখে দে, মায়ের কাছে রাখবি তো মায়ের কাছে রাখ, আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে আসছি!"

হাতে টাকা নিয়ে ষষ্ঠী কেমন আমতা আমতা করতে লাগল, "তুই হঠাৎ? কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলি? একাই এলি?"

দুটো বড় বড় ব্যাগ দাওয়ায় তুলে দিতে দিতে চপলা বলল, "বাড়িটা ভাল না, ব্যবহার ভাল না! ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ক'দিন থাকব, অন্য বাড়িতে কথা বলা কওয়া হয়ে আছে, ফিরে গিয়ে ঢুকব সেখানে!" কথাটা একদম মিথ্যে যে তা নয়। বিপিন বলেছে ঠিক দশ দিন পরে সন্ধে সাতটার সময় প্রিয়া সিনেমার সামনে চপলাকে দাঁড়াতে। গল্ফ গ্রিনের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে এক বৃদ্ধ আর তার বৃদ্ধা বোনের সংসার। ঝুটঝামেলা নেই। বিপিন চেষ্টা করবে চপলাকে সেখানেই কাজে ঢুকিয়ে দিতে। চোখের জল ফেলে বিপিনকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছে চপলা, কলকাতা শহরে যে করে, তোক একটা কাজ জোগাড় করে দেবে তাকে বিপিন।

সে কুয়োতলার দিকে এগোতে শুভঙ্করী কুপি হাতে এল তার পিছু পিছু পায়ে নূপুরের আওয়াজ তুলে। গা-টা রি রি করে উঠল চপলার। সে বলল, "কী রে, তোর বরের খবর কী? এখানে পড়ে আছিস যে বড়? ঝগড়া করে এসেছিস?"

কুপির আলো পড়েছে শুভঙ্করীর মুখে, চপলা দেখল চোখ দুটো চিকচিক করছে শুভঙ্করীর কৌতুকে, মজায় গা মটকে হেসে শুভঙ্করী বলল, "শাউড়িটার ভীষণ জ্বর, অসুখ। থাকলেই রাতদিন এটা কর, ওটা দে, রাঁধো রে, বাড়ো রে—তাই শরীর ম্যাজম্যাজ করছে বলে চলে এসেছি। ছেলে করুক মায়ের সেবা।"

হতভম্ব চপলা বলল, "একদিন উপেন তোকে আর ঘরে নেবে না, দেখিস! যা বাড় বেড়েছিস তুই, বুঝবি!"

আঁচল নাড়িয়ে শরীর দুলিয়ে হেসে উঠল বোন তার, "ইস, আমি কিনা ওর নেশা, আমাকে ছাড়া ও থাকতেই পারবে না!"

চার ঘণ্টার পথ পার হয়ে ট্রেনটা যখন হাওড়া স্টেশনে ঢুকল তখন বেলা দুটো। সীতা ট্রেনে উঠে চারপাশ দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজেই জানে না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল সে। দেখছিল বিষ্ণুপ্রিয়া অন্ধকার ঘাটে একটা গান গাইতে গাইতে অশ্রুবর্ষণ করে চলেছে। দু'চোখ আবেগে বোজা, দু'হাত তোলা আকাশের দিকে আর গানটার সুর, কথার অভিঘাতে উথালপাতাল করছে তার হৃদয়। সে চাইছে বিষ্ণুপ্রিয়া গান থামাক। আম-কাঁঠালের বাগান, ঝোপঝাড় পার হয়ে সে এগোবার চেষ্টা করছে ঘাটের দিকে কিন্তু কিছুতেই পৌঁছোতে পারছে না, কাঁটা ঝোপে হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে তার, রক্ত পড়ছে। অনেক কষ্টে কিছুটা এগোবার পর সে দেখল ঘাটে ওটা বিষ্ণুপ্রিয়া নয়, চন্দ্রা!

চন্দ্রাকে দেখামাত্র ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। চোখ মেলে তাকানোর পর দু'-এক মুহূর্ত লেগে গেল বুঝতে সে কোথায়! তখনই দেখল সীতা, জ্যাঠা মালপত্তর বের করছে সিটের তলা থেকে। জ্যাঠা তাকে বলল, "খুব ঘুম দিলি যা হোক! এবার ওঠ, হাওড়া স্টেশন এসে গেছে, নামতে হবে, খুব হুড়োহুড়ি হবে নামার সময়, আমার হাতটা চেপে ধরে থাকিস, কেমন?"

সে মাথা নাড়ল। বেশি ভাববার অবকাশ ছিল না, কান ফাটানো হইহট্টগোলে সচকিত হয়ে উঠল সীতা। কামরার ভিতর উঠে এসেছে কুলিরা, যাত্রীদের সঙ্গে দরকষাকষি করছে, ওঠানামার প্রক্রিয়ায় ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে খুব। স্রোতের মতো চলেছে লোকজন, কারও হাতে যেন এক মিনিট সময় নেই। পা মাড়িয়ে দিতে দিতে চলে যাচ্ছে ঠেলাগাড়ি। চেপে ধরা সত্ত্বেও হাত ছেড়ে গেল জ্যাঠার একবার। জ্যাঠা বলল, "এখানে হারিয়ে গেলে

আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু!" বলে এক মুখ হাসল জ্যাঠা। অমনিই এক ষণ্ডা মতো লোক তার বুকে কুনুইয়ের গুঁতো মেরে চলে গেল। ব্যথায় চোখে জল চলে এল সীতার। ভীষণ অপমানে লাল হয়ে গেল মুখ। সে বলে ফেলল, "কী অসভ্য লোক গো!"

বিব্রত হল জ্যাঠা, "ভিড়ের মধ্যে এসব খুব হয়, তুই ব্যাগটা এভাবে ধর!"

বেরিয়ে হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল জ্যাঠা তাকে নিয়ে। সে পেছন ঘুরে দেখল লাল বাড়িটাকে। এত বড় বাড়ি? সীতা হাঁ হয়ে গেল। আর এত লোক? কী একটা বাসের নম্বর পড়ে জ্যাঠা তাতে উঠে বসল তাকে নিয়ে, ফিসফিস করে বলল, "জানলা দিয়ে বাইরে তাকা, মা গঙ্গাকে দেখতে পাবি, প্রণাম করবি!"

বাসের লোকজনের মুখগুলোয় কেমন বিরক্তিমাখা, একজন-দু'জন ছাড়া বেশিরভাগ লোকই বেশ ছাপোষা ধরনের, জেলা সদরের উকিলবাবুদের মতো হাবভাব কয়েকজনের। কয়েকটা মেয়ে-বউয়ের কী চড়া সাজ। চুল কাটা, এবং এই বাসের ভিতরেও আর বাসের বাইরের যা যা—সব, নদী, ব্রিজ, যানবাহন, নারীপুরুষ, ঘরবাড়ি, দোকানপাট, জঞ্জাল, ধুলো, ধোঁয়া, যানজট সব অপলক দেখতে দেখতে শিয়ালদা বলে একটা জায়গায় যাত্রা শেষ হল তার। সীতা নেমে পড়ল বাস থেকে জ্যাঠার হাত ধরে।

বাস থেকে নেমে হাঁটতে লাগল জ্যাঠা। কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ি দেখিয়ে জ্যাঠা বলল, "পড় দেখি কী লেখা আছে?" সে পড়ল, "প্রাচী!"

"হ্যাঁ, প্রাচী সিনেমা হল, চিনে রাখ জায়গাটাকে। এর গা দিয়ে যে গলিটা, সেই গলিটা দিয়ে গেলে আমার বাড়ি। সবই চিনে রাখ ভাল করে সীতা।"

সে চারপাশটা লক্ষ করল ভাল করে। সামনেই একটা জুতোর দোকানে ভাল ভাল সব জুতো, তার জুতোটার অবস্থা খুব খারাপ, প্রতি মুহূর্তে ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় হচ্ছে। ছিঁড়ে গেলে জ্যাঠা নিশ্চয়ই কিনে দেবে একজোড়া জুতো। তার সঙ্গে কোনও টাকাপয়সা নেই, জেঠিমা দিয়েছিল দুশো টাকা, সীতা টাকাটা মা'র বাক্সে রেখে দিয়ে এসেছে, ভবানী জানেও না!

জায়গাটা দোকানপাটে ভরা, কত রকমের দোকানপসার, সিনেমা হলের সামনে নানারকম খাবার দোকান, চুড়ো করে সাজানো ভিজে ছোলা দেখে সীতার খুব ইচ্ছে করল একটু খায়। লোকটা দ্রুত হাতে ছোলা মাখছে আর বিক্রি করছে। একদঙ্গল তার বয়েসি মেয়ে, কাঁধে ব্যাগ, হাতে বই, ছোলামাখা কিনছে, হাসছে, কলকল করে কথা বলছে। সব দেখতে দেখতে সীতা হতচকিত। গলিতে ঢুকে পড়েছে জ্যাঠা। গলিটা ভীষণ সরু, তার মধ্যে দিয়েও অবিরাম যাতায়াত করছে লোকজন। গলি থেকে বাঁ দিকে আর একটা গলি, সীতা চলেছে বিরূপাক্ষ জ্যাঠার পিছন পিছন। জ্যাঠা বলল, "কী রে, কেমন লাগছে? গ্রামে গিয়ে সব গল্প করতে পারবি তো?"

এগোতে এগোতে গলির শেষে একটা বাড়ি, পুরনো, চুন-সুরকি খসে গিয়েছে গা থেকে, রংচটা, দরজাটাও যেন কোনওমতে আটকে আছে বাড়ির সঙ্গে, কড়া নাড়লেই খসে পড়বে। দরজার গায়ে টিনের ফলকে লেখা ২১/এ। কড়া নাড়ল না জ্যাঠা, বেল টিপল। বাড়ির ভিতর থেকে একটা কাশির শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল এ দিকে। জ্যাঠা চাপা স্বরে বলল, "সিধুবাবু, প্রণাম করবি। এ বাড়ির মালিক, আমি ভাড়া থাকি!"

দরজা খুলে ধরলেন যিনি তিনি এক জবুথবু বৃদ্ধ! বয়েসের ভারে পিঠটা প্রায় বেঁকে গিয়েছে। পরনে একটা ধুতি আর হাতাওলা গেঞ্জি। তার ওপর চাদর জড়ানো। সবই ভীষণ নোংরা। 'অ! তুমি!' বলে বৃদ্ধ সরে গেলেন

দরজা থেকে। জ্যাঠা ভিতরে ঢুকল, সে তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে, দরজার দু'পাশে কোমর-সমান উঁচু বারান্দা, তার ওপর রাখল সীতা দু'হাতের দুটো ব্যাগ, একটা ব্যাগ তার, অন্যটা জ্যাঠার। বিধুপুর থেকে আরও দুটো ব্যাগ ভরতি নারকেল এনেছে জ্যাঠা। সেই ভারী ব্যাগগুলো জ্যাঠাই বয়েছে।

বিরূপাক্ষ ভিতরে পা দিতে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "সঙ্গে এটি কে?"

"এর নাম সীতা সিধুবাবু। আমার গ্রামতুতো ভাইয়ের মেয়ে, ভাইটা পাগল, তার ওপর দুটো বিয়ে...!"

সে প্রণাম করল বৃদ্ধকে পায়ে হাত দিয়ে।

এ দিকে জ্যাঠা তখন বলেই যাচ্ছে, "ছ'টা ছেলেমেয়ে। সংসার তো প্রায় অচল। এই-ই বড়। মন-টন ভাল নেই মেয়েটার, বলল 'জ্যাঠা কলকাতায় যাব', তা যাবি চল, বলে নিয়ে এলাম...!"

বৃদ্ধ আর দাঁড়ালেন না। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে গেলেন। জ্যাঠার মুখে একটা বিগলিত হাসি, 'আয় সীতা, ভেতরে আয়' বলে কোঁচড় থেকে চাবি বের করল জ্যাঠা। সে এতক্ষণে বাড়ির ভিতরটা দেখার সুযোগ পেল। একটা চাতাল, তার তিন দিকে ঘর, বাঁ হাতের ঘরগুলোর পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে সিঁড়ি। সিঁড়িটা অন্ধকার, দেওয়ালগুলো মোটা মোটা। দোতলার টানা বারান্দাটার রেলিং-এর শিকগুলো অর্ধেক নেই। বড়সড় মানুষ গলে পড়ে যাবে ফাঁক দিয়ে। ডান হাতের দেওয়াল বরাবর একটা টিনের চালের কলঘর, বাইরে একটা বিরাট চৌবাচ্চা!

জ্যাঠার ডাকে ফিরে তাকাল সীতা। সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের তালা খুলে ফেলে মালপত্র ঢোকাতে ঢোকাতে জ্যাঠা বলল, "এই হল জ্যাঠার ঘর, এই ঘরটায় থাকি, পাশের ছোট ঘরটায় রান্না করি।" ঘরগুলোয় আলো ঢোকে না মনে হয়, গলির গলি তস্য গলিতে বাড়ি। জ্যাঠা আলো জ্বেলে দিতে সে দেখল ঘরে একটা তক্তাপোশ, তাতে পরিপাটি করে বিছানা পাতা, একটা টুলের ওপর একটা ট্রাঙ্ক, একটা আলনা—ব্যস, আর কিছুটি নেই, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন!

জ্যাঠা বলল, "তুই এ ঘরে ঘুমোস, আমি রাস্তার দিকের ঘরের চাবি চেয়ে নেব সিধুবাবুর কাছ থেকে। গেল বার তো শঙ্করের সঙ্গে ওর শালা এসে থেকে গেল প্রায় তিন সপ্তাহ, সিধুবাবু তখনও ঘর দিয়েছিলেন শুতে!"

বিধুপুরের লোকজন নানা সময়ে নানা কারণে কলকাতায় এসে বিরূপাক্ষ জ্যাঠার আশ্রয়ে ওঠে। শঙ্করকাকার কঠিন অসুখ হয়েছিল একটা, শঙ্করকাকা জ্যাঠার কাছে এসে থেকে চিকিৎসা করিয়েছিল কলকাতার বড় হসপিটালে, ভাল হয়ে বাড়ি ফিরেছিল মানুষটা। জ্যাঠার প্রতি কৃতজ্ঞতা জাহির করেছিল বারবার সবার কাছে। সীতা সে সব জানে।

"আয়, তোকে আগে বউদির কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি!"

"বউদি কে জ্যাঠা?" সে ভেবেছিল নিস্তব্ধ বাড়িটায় আর তৃতীয় কোনও মানুষ থাকে না।

"সিধুবাবুর স্ত্রী, তুই জেঠিমা বলে ডাকিস, কেমন? বহু বছর ধরে শয্যাশায়ী, নড়তে চড়তে পারে না!"

দোতলার যে ঘরটায় নিয়ে গেল তাকে জ্যাঠা সেই ঘরটা তুলনামূলকভাবে একটু আলোকিত। মাটি থেকে অনেক উঁচু একটা পালঙ্কে শুয়ে আছে জীর্ণ একটা শরীর। বুক অবদি কম্বল চাপা দেওয়া, পাকা চুলে বাসি সিঁদুর, চোখ বন্ধ। জ্যাঠা খুব নরম স্বরে ডাকল বৃদ্ধাকে, "বউদি!"

চোখ মেলে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হাসলেন বৃদ্ধা, "এসে গেছেন? গ্রামে সব ভাল তো?"

জ্যাঠা মাথা নাড়লেন, তারপর তার দিকে চোখ পড়ল বৃদ্ধার, "ও কে?"

জ্যাঠার ইশারায় সে কাছে এগিয়ে গেল বৃদ্ধার। জ্যাঠা আবার সবিস্তার দিতে লাগল সীতার পরিচয়। শুনতে শুনতে বৃদ্ধা তার বাহু চেপে ধরলেন, টেনে নিলেন কাছে। এমন দুর্বল চেহারার মানুষের হাতে এত জোর? সীতার ব্যথা লাগছিল। হঠাৎই আবার হাতটা ছেড়ে দিলেন উনি, হাতটা খসে পড়ল বিছানার ওপর, উনি এলিয়ে পড়লেন কেমন, চোখ বুজে ফেললেন।

জ্যাঠা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "আপনার কি শরীরটা আজ বেশি খারাপ বউদি?"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা, "একই রকম!"

"আমরা তবে নীচে যাই? রান্নাবান্নার একটু জোগাড় দেখি?"

তারা যখন বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে বৃদ্ধা বলে উঠলেন, "বেশ মেয়েটি! তুমি আবার পরে এসো, কেমন? গল্প করব!"

ব্যাগ থেকে জামাকাপড় বের করে ফেলল সীতা। কলঘরে ঢুকল স্নান সারতে। বেরিয়ে সে দেখল পাশের ঘরটায় কেরোসিনের স্টোভে ভাত বসিয়ে দিয়েছে জ্যাঠা। খুব রাগ দেখাল সে, "আমি করছি, তুমি সরো জ্যাঠা। যে ক'দিন আমি আছি, আমিই রান্নাবান্না করব!" খুশিই হল জ্যাঠা, উঠে গেল স্নান করতে।

কাঁচা আনাজ কিছুই নেই। চাল, ডাল, তেল, নুন, আলু রয়েছে। খুঁজেপেতে চটপট পোস্ত বেটে ফেলল সীতা। দেখতে দেখতে বেঁধে ফেলল আলুপোস্ত আর ডাল। ফোড়নের গন্ধে ম-ম করতে লাগল একতলাটা। জ্যাঠা বলল, "আচ্ছা সীতা, তুই ডালের বড়া ভাজতে পারিস? বেশ মুচমুচে করে? পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দিয়ে?"

হেসে ফেলল সে, "কেন পারব না? কী ডালের বড়া খেতে চাও বলো না? জেঠিমা তো আমাকে সব শিখিয়েছে। আবার ডাল বেটে বড়িও বানাতে পারি আমি, একটু পোস্ত ছড়িয়ে দিই ওপরে, এক বড়ি ভাজা দিয়েই ভাত খাওয়া হয়ে যায়!"

খুব খিদে পেয়েছে জ্যাঠার, বড় বড় গ্রাস মুখে তুলছে, "বহুকাল বউদি এমনই অসুস্থ, দু'জনের রান্নাবান্না সিধুবাবুই করেন। ওই ভাতে ভাতই চালিয়ে আসছেন, ব্যাটাছেলে এর বেশি আর কী পারবেন, আমি এটা-সেটা বানালে দিই মাঝে মাঝে, তা বউদি খুব ডালের বড়া খেতে ভালবাসেন। তুই যদি ক'টা ভাজিস তা হলে বউদিকে খাওয়াব, ধর কাল ভাজলি?"

সীতা উৎসাহিত হয়, "ভাজব, তোমাকে কিন্তু বাজার করতে হবে জ্যাঠা!"

"তোকে তো বললাম, সকালে সময় হবে না, দশটার মধ্যে দোকানে পৌঁছোতে হবে, এখন খেয়ে তুই একটু গড়িয়ে নে, সন্ধেবেলা তোকে নিয়ে বেড়াব, আশপাশটা একটু দেখিয়ে শিয়ালদা মার্কেট থেকে বাজার করে ফিরব!"

জ্যাঠার প্রতি সীতার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই! তার আবদার রাখতে জ্যাঠা তাকে নিয়ে এসেছে কলকাতায়। তার মনে হল পারলে এখনই সে গরম গরম ডালের বড়া ভেজে খাওয়ায় সবাইকে।

খেতে খেতে অনেক গল্প হল জ্যাঠার সঙ্গে। সে জানতে চাইল, "ওপরের জেঠিমাদের ছেলেমেয়ে নেই বুঝি?"

"নাহ্, ছেলেমেয়ে কেউ নেই। সেই বছরে একবার হয়তো খোঁজ নেয় এরকম এক ভাইঝি আছে বউদির। খুব বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বামীর সঙ্গে, সময় নেই অসুস্থ পিসির কাছে

একটু বসার। অবশ্য কারই বা সময় আছে অন্যের জন্যে? তবু ওই যে একবার আসে তাতেই বউদি যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় !"

রান্নাঘরেই আসন পেতে খেতে বসেছে দু'জন। ঘরটায় একটাই জানলা। তাতে জাল দেওয়া। বহু বছরের তেলকালি জমে ফুটোগুলো প্রায় বুজে গিয়েছে জালের। সে জিজ্ঞেস করল জ্যাঠাকে, "আচ্ছা, এ বাড়িতে একতলায় তুমি আর দোতলায় সিধুবাবু, ব্যস আর কেউ থাকে না?"

"কেন? বিজয়াকে দেখতে পাসনি একবারও? তা হলে নেই বোধহয়!"

"বিজয়া কে?"

"পাগলি একটা!"

"এখানেও পাগল?"

"তুই কি ভেবেছিলি পৃথিবীতে তোর বাপই একা পাগল? তবে এ হল সেয়ানা পাগল। থাকবি তো, দেখবি তখন!"

"সেয়ানা পাগল কীরকম?"

"এই ধর বাথরুমে ঢুকবে, বেরোবে না, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা বসে থাকবে বাথরুম আটকে। আমি না থাকতে যদি এরকম করে তুই ছাদে চলে যাবি। ছাদে একটা বাথরুম আছে, ছাদের দরজা খোলাই পড়ে থাকে দিনের বেলা।"

"আর কী করে সে?"

"তারপর ধর রাগ হল, তরকারির খোসা দরজার সামনে ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। সব সময় বিড়বিড় করে সারা জগৎ সংসারকে দুষছে। এই যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কী ঝগড়াই না করল একদিন, আমি নাকি রোজ সকালে ওর তুলসী গাছের পাতা ছিড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই!"

জ্যাঠা আর সে হেসে উঠল জোরে, হাসি থামলে সে বলল, "মেয়েটা একাই থাকে?"

"মেয়ে নয় সীতা, আধবুড়ি। আমি এই বাড়িতে কুড়ি বছর আছি আর ও বোধহয় জন্ম থেকেই এখানে। বিজয়ার মাকে আমিও দেখিনি। সাত-আট বছর আগে ওর বাবাও গেলেন। বিজয়া বোধহয় বাবার পেনশনটা পায়, বিয়ে হয়নি তো! তারপর শাড়ির ফল্স-টল্স বসিয়ে কিছু রোজগার হয় ওর, চলে যাচ্ছে। সিধুবাবু তো ওকে কোনও দিন বাড়িছাড়া করবেন না!"

দোতলায় জোরে জোরে ঘণ্টা নাড়ার শব্দ হচ্ছে, সীতা ভাবল বোধহয় পুজোআচ্চা হচ্ছে ওপরে। জ্যাঠা বলল, "না, না, উঠতে পারেন না, হাঁকডাকও করার শক্তি নেই বউদির, দরকার পড়লে ঘণ্টা নেড়ে সিধুবাবুকে ডাকেন। বেচারি!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল জ্যাঠা।

রান্নাঘর পরিষ্কার করে; বাসনগুলো মেজে ফেলে জ্যাঠার ঘরের মেঝেতেই মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল সীতা। জ্যাঠা ঘুমিয়ে পড়েছে পাশ ফিরে, নাক ডাকছে, সে-ও খুব ক্লান্ত। সেই মাঝ রাতে কঙ্কালীতলা থেকে বাস ধরে মতিঝাড়ি, মতিঝাড়ি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কলকাতা। এ সবে অনভ্যস্ত শরীর আর শুতেই মাথাজুড়ে ফিরে এল ছেড়ে আসা জীবন। সে টের পেল এতক্ষণ বুকের ভিতর যে কষ্টটা হচ্ছিল, তার দিকে মন দেওয়ার অবসর, অবস্থা ছিল না তার, এবার সব চিন্তা আবার ফিরে আসছে হুড়মুড় করে। ভবানীকে বোঝাতে হয়নি বেশি, অঞ্জনদার বিয়ে আর তার কলকাতা যাওয়ার জেদ দুটোই ভবানী পরপর শুনেছে, কয়েকটা মুহূর্ত ভিতর

ফালা ফালা করা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকেছে ভবানী সীতার দিকে। তারপর বলেছে, "আচ্ছা যাবি যা! আমি তোর বিরূপাক্ষ জ্যাঠাকে রাজি করাব ক্ষণে!"

"জ্যাঠা রাজি, তুমি রাজি হলেই নিয়ে যাবে বলেছে!"

ভবানী একটু চুপ করে থেকে বলেছে, "জেঠিমার মত নিবি না?"

মাথা নেড়ে না বুঝিয়েছে সীতা।

"জ্যাঠার ওখানে তো কেউ নেই, সারা দিন জ্যাঠা বাড়ি থাকবে না, অনেক রাতে ফিরবে, তুই একা একা কী করবি?"

এটুকুতেই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল সে, "যা ইচ্ছে হয় করব, পড়ে পড়ে ঘুমোব, আগে যাই তো?"

মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় অবিমিশ্র মায়া জেগে উঠেছিল ভবানীর বুকে, "বেশ যা, থেকে আয় যদ্দিন প্রাণ চায়!" বলেছিল ভবানী, "এর মধ্যে যদি বাবা ফেরে, দাদার দোকানে ফোন করে খবর দেব, কেমন?"

বিরূপাক্ষ জ্যাঠার সঙ্গে ভবানীর কথা হয়ে গিয়েছিল পরের দিনই, যখন সীতা চেষ্টাকৃত স্বাভাবিকতায় মনোনিবেশ করেছে সুপ্রভার বাড়ির কাজে, ভবানীর ডাক পড়েছিল এ বাড়িতে। সন্ধের দিকে পুতুলকে নিয়ে সুপ্রভার কাছে এসেছিল ভবানী, ঢুকেই বলেছিল, "যা খুশি হয়েছি দিদি, খুব খুশি হয়েছি, সীতার কাছে সব শুনেছি!" আন্তরিক আনন্দ বোঝাতে সে সুপ্রভার হাঁটু জড়িয়ে ধরেছিল। সুপ্রভা গত দিন থেকেই যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। বলল, "এ যেন মেঘ না চাইতেই জল ভবানী!" এরপর সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত দিয়েছিল সুপ্রভা ভবানীকে, সীতা সরে গিয়েছিল ঘর থেকে। সে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে দেখেছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের হাতের পাতা দুটোকে; কেমন রুক্ষ, শুকনো, খরখরে হাত তার।প্রাণপাত পরিশ্রম সে করেছে এ বাড়ির জন্যে। এমনকী অঞ্জনদার পোষা টিয়াটাকে কথা বলাবার জন্য মরিয়া চেষ্টায় গলা শুকিয়ে ফেলেছে, এত ভয়ংকর ছিল তার সেবাপরায়ণতা। সে যে কত কর্মমত্ত, মুখ থেকে কথা পড়তে না পড়তে প্রয়োজন পূরণ করে দেয়—জেঠিমার তার সম্পর্কে প্রশংসার এই-ই ছিল একমাত্র বিষয়।

অনেক রাত অবদি কথাবার্তা বলে উঠে আসার সময় ভবানী সুপ্রভাকে সীতার কলকাতা যাওয়ার ইচ্ছের কথা বলেছিল, "যেতে চাইছে দিদি, কখনও যায়নি কলকাতায়, তা আমি আর আপত্তি করলাম না! যাক, একটু ঘুরে আসুক!"

সুপ্রভা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রভা জানে না অথচ সীতার যাওয়া স্থির হয়ে গিয়েছে? আঘাত পেয়েছিল মানুষটা, এই নিয়ে আর একটা কথাও বলেনি, পরের দিন মাথা ধরেছে বলে পাঠিয়েছিল সীতা গৌরাঙ্গকে দিয়ে, মাথা ধরেছে তাই যাবে না। এত বছর শরীর খারাপ মনে হলে সে লাফ দিয়ে জেঠিমার কোলে গিয়ে শুয়েছে। তার কলকাতা যাওয়ার খবরটা জেঠিমাকে থমকে দিয়েছিল—অঞ্জনের বিয়ে আর সীতা কলকাতা চলে যাচ্ছে, বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে সীতার কোনও উৎসাহ নেই? উদ্বেগ নেই? যাচ্ছে, তাও সুপ্রভার অনুমতি না নিয়েই?

তা করতেই হত, নইলে কী হবে জানে সীতা, তাদের বিধুপুর গ্রামে নতুন বউ নিয়ে আসবে অঞ্জনদা, সে ছটফট করতে করতে গিয়ে পড়ে থাকবে ও বাড়িতে, চোখ ধাঁধিয়ে যাবে নতুন বউ দেখে, তার প্রতিষ্ঠা দেখে, আদর দেখে, হিংসে করবে সীতা, তারপর অভ্যস্ত হয়ে যাবে একদিন। তখন হয়তো সুমিত্রার কাপড় কেচে

মেলে দিতে হবে তাকে। ছোট থেকে এই হাতে অনেক কাজ করেছে সে—কিন্তু তাই বলে ও বাড়ির বউয়ের কাজ সে করতে পারবে না, এত পীড়াদায়ক কাজ সে কোনও মতেই করতে পারবে না!

দেখতে দেখতে কেটে গেল সাত সাতটা দিন এই শহরে সীতার। কেটে গেল অনায়াসে বলা চলে। কাজ কিছুই নেই, সাড়ে নটা বাজতেই স্নান-খাওয়া সেরে বেরিয়ে যায় জ্যাঠা দোকানে। কলেজ স্ট্রিটে একটা শাড়ির দোকানের ম্যানেজার জ্যাঠা। মালিকের কলেজ স্ট্রিট মার্কেটেই একটা চায়ের দোকানও আছে, সেটাও জ্যাঠাই দেখাশোনা করে। দশটার মধ্যে পৌঁছে সেই দোকানের তালা খুলে দিয়ে শাড়ির দোকানে ছোটে জ্যাঠা, রাতে দুটো দোকান বন্ধ করে ফেরে। দায়িত্ব অনেক, মাঝে মাঝে দার্জিলিং-এর চা-বাগানেও যাতায়াত করতে হয়। বছর কয়েক হল জ্যাঠা কোন এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে, মাছমাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তারপর থেকে। নিজে নিরামিষ খেলেও সীতাকে মাছ-মাংস-ডিম খাওয়াতে চেয়েছিল জ্যাঠা। বুদ্ধিমতী মেয়ের মতো সীতা আপত্তি করেছে তাতে। যত্ন করে তাই রোজ নিরামিষ রাঁধছে সে জ্যাঠা আর নিজের জন্যে। আজ যেমন রেঁধেছে মুগের ডাল, করলা মুচমুচে করে ভাজা আর মোচার ঘন্ট, নারকেল দিয়ে, ছোলা দিয়ে! এই রান্না তার সকালেই নেমে যায়, খেয়ে বেরিয়ে যায় জ্যাঠা—তারপর আর কাজই বা কী! কখনও কখনও ঢোকে জেঠিমার ঘরে। জেঠিমা তখন ভাত খায়, সিধুবাবু খাইয়ে দেন নিজের হাতে। খাওয়া হয়ে গেলে জেঠিমার সঙ্গে গল্প করে সীতা কিছুক্ষণ। বিধুপুরের গল্প শুনতে চায় জেঠিমা তার কাছে, সে একাই বকে যায়। শুনতে শুনতে জেঠিমার তন্দ্রা এলে সীতা নীচে নেমে ভাত বেড়ে খায়। বিকেলে ছাদে ঘুরে বেড়িয়ে কাটে, জেঠিমার কাছে বসে থাকে সন্ধেটা। এর মধ্যে রবিবার দিনটা ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে জ্যাঠা তাকে নিয়ে গেল কালীঘাট, পুজো দিতে। প্রচণ্ড ভিড়, ঠেলাঠেলি, সীতা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে এমন ভীত হয়ে থাকল যে মাতৃদর্শনই হল না তার। বেরিয়ে একটা দোকানে কচুরি জিলিপি খেয়ে নিল দু'জনে। তারপর বাসে চড়ে গিয়ে নামল বিরাট বড় একটা বাগানের সামনে। চোখ তুলে সাদা ধপধপে অট্টালিকাটা দেখেই চিনতে পারল সীতা, টিভিতে অনেকবার দেখেছে, নামটাও জানে কিন্তু মনে পড়ল না তখন তখন। 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল' বলে দিল জ্যাঠা। এই প্রথম, কলকাতায় আসার পর এই প্রথম সীতার মনে পড়ল ছোট ছোট ভাইবোনেদের কথা—পুতুল, অনন্ত, গৌরাঙ্গ, এমনকী পল্টু, মালার কথাও। সে জ্যাঠাকে বলল, "এখানে কারা যেন থাকে, তাই না জ্যাঠা?'

"এখানে কেউ থাকে না, এটা কেউ থাকবে বলে বানানো হয়নি, লোকে দেখবে বলে বানানো হয়েছে!"।

অদ্ভুত লাগল সীতার, চারপাশটা এত সুন্দর, এত গাছপালা, তার যেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু বেলা বেড়ে যাচ্ছে—বাসে করে শেয়ালদা মার্কেটে নেমে অনেক বাজারটাজার করে বাড়ি ফিরল দু'জনে। সে প্রসাদ দিতে ছুটল জেঠিমাকে দোতলায়। এর দু'-একদিন পরে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল দু'-দুটো। জ্যাঠার দোকানে ফোন এল ভবানীর, বৈশাখে নয়, ফাল্গুনের শেষাশেষিই বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে অঞ্জনদার। ভবানী জ্যাঠাকে বলে দিয়েছে সীতা যেন ফিরে আসে তাড়াতাড়ি, নইলে খুব খারাপ দেখাবে। জেঠিমাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাওয়ায় জেঠিমার মনে যে আঘাত লেগেছে তা থেকে তৈরি হওয়া ক্ষত আর সহজে সারবে না—সীতা যেন এখুনি রওনা দেয়, জ্যাঠা যেন সীতার ফেরার ব্যবস্থা করে দেয় অবিলম্বে!

জ্যাঠা তাকে বোঝাতে লাগল, “মা বলছে যখন এখন তুই ফিরে যা সীতা। মালিক এখন সাতদিন কলকাতার বাইরে। আমাদের দোকানের কার্তিক ছেলেটি রসুলপুরের, বিধুপুর ও চেনে। ওকে বলছি ও তোকে পৌঁছে দিয়ে আসুক, আমার পক্ষে তো যাওয়া সম্ভব নয়। দ্যাখ সীতা, এই নিয়ে আর জেদাজেদি করিস না। পুজোর সময় যদি সম্ভব হয় তোকে আমি আবার নিয়ে আসব কলকাতায়। তখন সব ঘুরিয়ে দেখাব। কলকাতার পুজো তো দেখিসনি, দেখলে মাথা ঘুরে যাবে তোর!”

ধূসর চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সীতা জ্যাঠার দিকে। জ্যাঠা কী বুঝল কে জানে, বলল, “প্রেম ভালবাসা কোনও অন্যায় নয় সীতা, তুই কোনও ভুল করিসনি—কিন্তু উপায় কী বল?” সহানুভূতি তার হৃদয়ের অর্গল খুলে দিল। টপটপ করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল তার। ইচ্ছে হল জ্যাঠার হাতে-পায়ে ধরে বলে, “না জ্যাঠা, আমাকে এখনই পাঠিয়ো না, আমাকে থাকতে দাও, আমি ফিরতে চাই না বিধুপুর, ফেরার কথা ভাবলেও গায়ে আগুনের আঁচ লাগে যেন, জ্বালা জ্বালা করে সব!” কিন্তু এর একটা কথাও বলতে পারল না সে। উঠে ব্যাগ গোছাবে বলে আলনার এক পাশে রাখা জামাকাপড় তুলে নিল। জ্যাঠা হাঁ-হাঁ করে উঠল, “এখনই গোছগাছ শুরু করলি নাকি? দাঁড়া, আগে কাল কার্তিককে ধরি, ওকে রাজি করাই, তবে তো...! রাখ এখন, চোখের জল মোছ, আমাকে খেতে দে দেখি! সকালের সেই বিউলির ডালটা আছে তো রে? তুই তো ওস্তাদ রাঁধিয়ে, কত গুণ তোর, দেখবি কেমন ভাল ঘর, বর দেখে বিয়ে দেব তোর, কোমর বেঁধে সংসার করবি..” জ্যাঠা একটু উদাস হয়ে যায়, “জীবনটা তোর, তোর মায়ের দুঃখেরই সীতা, পরে হয়তো ভাল দিন দেখবি!”

ফিরে যাওয়া ছাড়া পথ নেই এ কথা অনুধাবন করার পর সে রাতে দু’চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে পারল না সীতা। এবং পরের দিনই ঘটল দ্বিতীয় অভাবনীয় ঘটনাটি। সীতার জীবন বদলে গেল সে দিন থেকে। হতাশা থেকে যে পথ অবলম্বনের কথা ভেবেছিল সীতা, সেই পথ আপনাআপনি খুলে গেল তার সামনে।

পরের দিন বিকেলবেলা সে শেষবারের মতো ছাদের দিকে পা বাড়িয়েছে, সদর দরজার বেল বেজে উঠল। শব্দে সীতা এগিয়ে গেল দরজা খুলতে এবং দরজা খুলে ধরতেই চোখ ঝলসে উঠল তার। এক অপরূপা সুন্দরী দাঁড়িয়ে সিঁড়ির ওপর। সীতার মুখে বাক্যি হরে গেল যেন—এ কে? যেন সিনেমার পরদা থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি তার সামনে। মেয়েটার গোলাপি শাড়ি, থাক থাক করে কাটা চুল, গায়ের গয়না, হাতের ব্যাগ, ঠোঁটের লিপস্টিক কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে স্থির করতে পারছিল না সে। অপেক্ষা না করে ভিতরে ঢুকে এল মেয়েটা, সোজা উঠতে লাগল দোতলার সিঁড়ি বেয়ে। দরজা বন্ধ করে উঠোনে দাঁড়িয়ে সীতা দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। মেয়েটা গিয়ে দাঁড়াল জেঠিমার ঘরের দরজার সামনে, খুব মিষ্টি করে ডাকল, “পিসিমণি।” তারপর ঢুকে গেল ঘরের ভিতর! ততক্ষণে সিধুজ্যাঠা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সে শুনতে পেল কথাবার্তা হচ্ছে জেঠিমার ঘরে। সীতা বড় করে নিশ্বাস নিল একটা, মেয়েটা সেন্টের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গিয়েছে নীচ দিয়ে। কী অপূর্ব ফুলের গন্ধ একটা!

সে বুঝতে পেরেছে কে এই সুন্দরী। বিরূপাক্ষ জ্যাঠার কাছে শুনেছে সীতা এর কথা, সেই যে মাঝে মাঝে আসে জেঠিমাকে দেখতে, জেঠিমার ভাইয়ের মেয়ে! তার তখন প্রবল আগ্রহ হচ্ছে মেয়েটাকে আরও একটু দেখার। এ যেন কোনও অন্য জগতের বাসিন্দা। যেমন দেখতে, তেমন গলার স্বর, হেঁটে যাওয়ার ছন্দটা কত

নিপুণ, পায়ে সরু হিল জুতো। ঠিক যেন একটা স্বপ্নের মতো। গত বছর পুজোর ফাংশনে কলকাতার যে সিরিয়ালের নায়িকা গিয়েছিল বিধুপুর, এ মেয়েটি তার থেকে একেবারে আলাদা। নায়িকা তো সর্বক্ষণ কেমন বিরক্তিভরে কথা বলছিল। চেয়ারে পা তুলে বসেই ঘুমিয়ে নিল একটু, তার ওপর মুখেচোখে কী রংবেরঙের মেক-আপ। এই মেয়েটি কিন্তু মুখে অত কিছু সাজেইনি। তাও কী দীপ্তি। ভাঙাচোরা বাড়িটায় যেন আলো জ্বেলে দিল এর রূপ!

সীতা খেয়ালই করল না কখন পায়ে পায়ে সে দোতলায় উঠে এসেছে। পৌঁছে গিয়েছে জেঠিমার ঘরের সামনে। যখন জেঠিমা তাকে ভেতরে ডাকল, তখন হুঁশ হল তার। লজ্জা পেল খুব। মেয়েটা জেঠিমার হাতটা ধরে বসে আছে চেয়ারে, জেঠিমা যেমনকার তেমনই শায়িত।

সেই মেয়েটা বলল, "হ্যাঁ, ওকে বলো তো পিসিমণি, ওই আমায় দরজা খুলে দিল?"

জেঠিমা এত কথা বলতে পারে না, সিধুজ্যাঠা বেশি কথা বলতে চানই না, উত্তরটা যদিও সিধুজ্যাঠাই দিলেন গলা খাঁকারি দিয়ে, "বিরূপাক্ষর ভাইঝি। ওর নাম সীতা।"

তারপর নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল ওরা। মেয়েটা বলল, "তোমরা দু'জনেই ডায়াবিটিসের রুগি, মিষ্টি তোমাদের চলবে না; আর হঠাৎ করে চলে এসেছি, সঙ্গে কিছুই আনা হয়নি। আমি তো ছিলামই না পিসিমণি, ননদের কাছে থেকে এলাম পনেরো দিন, বম্বেতে, ওর যমজ ছেলে হয়েছে!"

সিধুজ্যাঠা গম্ভীর মুখ করে পিছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "একটু চা করি তোমার জন্যে তুলতুলি!" সত্যিই তুলতুলি, গা, হাত, পাগুলো দেখে মনে হচ্ছে নরম তুলোর। গ্রামে ফিরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সে এই মেয়েটার গল্প বলবে, ভাবল সীতা।

তুলতুলি বলল, "চা? করবেন? আপনাকে করতে হবে তো? থাক গে!"

হঠাৎ কী হল সীতার, সে বলে উঠল, "আমি করে দেব চা?" বলতে বলতে লজ্জা পেয়ে গেল সে। সিধুজ্যাঠা গলা খাঁকারি দিলেন। জেঠিমা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "করবি? কর!"

জেঠিমাদের রান্নাঘরটার যে কী দুর্দশা বলে বোঝানো যাবে না। মেঝেতে গ্যাস রেখে পিঁড়েতে বসে রান্না করেন বোধহয় সিধুজ্যাঠা। মেঝেটায় দু'ইঞ্চি পুরু তেলচিটে নোংরা, নুন ছড়ানো, শুকনোলঙ্কার ডাঁটিতে ভরতি, বঁটির ওপর তরকারির খোসা, এক কোণে দুধের খালি প্যাকেটের স্তূপ। ইস্, কালই সীতা চলে যাবে, আগে দেখতে পেলে সে সব ধুয়েমুছে ঝকঝকে করে দিয়ে যেত! এত নোংরা সে দেখতে পারে না। সুপ্রভার যে পরিষ্কার পরিষ্কার বাতিক তা তার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে অনেক দিন।

সসপ্যান মেজে তিন কাপ চা করে ফিরে এল সীতা, তখন জেঠিমা তুলতুলিকে বলছে, "এবার তোরও বাচ্চাকাচ্চা হলে ভাল হয় তুলতুলি!"

"বাচ্চা?" হেসে উঠল তুলতুলি, "বছরের মধ্যে ন'মাস তোমার জামাই থাকে জাহাজে পিসিমণি। আমার একার সংসার, শ্বশুর-শাশুড়ি নেই... বাচ্চা হলে একা হাতে মানুষ করতে হবে! ও আমি পারব না—সব দায়দায়িত্ব আমারই ওপর এসে পড়বে। এই তো দেখে এলাম দুটো বাচ্চা নিয়ে আমার ননদের কী দুর্দশা, এই জ্বর আসছে, এই পেট খারাপ হচ্ছে! না বাবা, এই বেশ আছি। ঘুরছি, বেড়াচ্ছি, খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি! তোমার জামাই তো এবারে সেল-এ আমাকে কত বলল যাওয়ার জন্যে, একা একা থাকি তো, কিন্তু জলে ভাসতে

আমার এতটুকু ভাল লাগে না। যতবার গেছি কী মনে হয়েছে বলো তো, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে মাটিতে গিয়ে উঠি, সে এক পাগল পাগল দশা, ও যে কী করে পারে!”

জেঠিমা তবু ছাড়বার পাত্র নয়, “তোদের তো টাকার অভাব নেই...একটার জায়গায় দশটা কাজের লোক রাখবি, সেই সব করবে!”

তুলতুলি একটু মনমরা হয়ে গেল, “দূর, কাজের লোকের ভরসায়... না, না, সে দেখা যাবে যখন তোমাদের জামাই একটা-দুটো বছর আর সেল-এ যাবে না। এই তো কত সাধ্যসাধনা করে একটা মেয়েকে এনে রাখলাম, হাতে করে কাজকর্ম সব শেখালাম, তা সে কিছুতেই থাকল না, তার নাকি গ্রামের জন্যে মন কেমন করছে, ছোট ছোট ভাইবোনদের জন্যে মন কেমন করছে! মা এল টাকা নিতে, মেয়ে কেঁদেকেটে মায়ের সঙ্গে চলে গেল। এখন তো আমার একটা মোটে ঠিকে লোক। আর যাকে তাকে তো রাখাও যায় না— বিশ্বাসী না হলে... কাগজে পড়ো না, মনিবকে মেরেধরে, খুন করে সব নিয়ে বিহারে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি একা থাকি পিসিমণি, আমার ভীষণ ভয় করে!” জেঠিমার খুব কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, তবু বলে উঠল, “ও মা, রান্নাবান্না সব তোকে নিজেকেই...”

“কী আর রান্নাবান্না! চা-টা খুব ভাল হয়েছে... ইয়ে...কী যেন... সীতা!” তুলতুলি তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকাল, মুখের সামনে ঝুঁকে এল ঢং করে কাটা চুলের গোছা! সমস্ত আত্মা দিয়ে লজ্জাবোধকে ঠেলে সরিয়ে সীতা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, “আপনার কি কাজের মেয়ে দরকার?” মুঠোয় ধরা ওড়নার প্রান্ত আরও আরও চেপে ধরল সীতা, চেপে ধরল সমস্ত শক্তি দিয়ে, জেঠিমা, জ্যাঠা, তুলতুলি তিনজনের চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল তার দিকে। তুলতুলি বলল, “হ্যাঁ, দরকার তো! খুবই দরকার!”

সে মাথা নামাল, “আমি তো কলকাতায় কাজ করব বলেই এসেছি! আমাদের বাড়ির অবস্থা তো ভাল নয়!”

এবার কথা বলল জেঠিমা, “তাই নাকি? তুই তো বলিসনি আমাকে সীতা? বিরূপাক্ষবাবু বললেন তুই বেড়াতে এসেছিস মন-মেজাজ ভাল নেই বলে?”

উত্তরে পায়ের নখ খুঁটতে লাগল সে, কোনও জবাব দিল না। জেঠিমা খুব অল্প দু’-এক কথায় তুলতুলিকে সীতাদের পারিবারিক অবস্থা বর্ণনা করল, তারপর বলল, “তাই যদি হয় তা হলে...”

তুলতুলি সোজা চোখ তুলে দেখল তাকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর ডাকল তাকে, “এ দিকে আয়!”

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল সীতা তুলতুলির কাছে। তুলতুলি বলল, “কত বয়েস তোর!”

“ষোল পূর্ণ করে সতেরোয় পা দিয়েছি গেল বছর পুজোয়!”

“পড়াশুনো করিসনি?”

“ক্লাস এইটে উঠে ছেড়ে দিয়েছিলাম!”

“আর পড়লি না কেন?”

“মাথা নেই তাই!”

“ধ্যাৎ, কার আবার মাথা থাকে না? এই তো দিব্যি একটা মাথা আছে তোর! আমার কাছে থাকলে কিন্তু পড়াশুনো শিখতে হবে আবার, শিখবি?”

মনের মধ্যে তোড়ে ঢুকে এল একটা অচেনা আবেগ সীতার। সে কম্পিত স্বরে বলে উঠল, “শিখব দিদি!”

তুলতুলি হাত ধরল তার, জেঠিমার দিকে তাকিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, "কত মানুষের কত দুঃখ তাই না পিসিমণি? এইটুকু ফুটফুটে একটা মেয়ে সে পেটের তাগিদে অচেনা শহরে কাজ করবে বলে চলে এসেছে!"

জেঠিমার অবাক ভাবটা কাটেনি এখনও, বলল, "তাই তো শুনছি এখন...আহা রে, মুখটা দেখলেও মায়া হয়, সেই ভাল তুলতুলি, তুই ওকে নিয়ে যা, তোর কাছে বাড়ির মেয়ের মতো থাকবে, আদর ভালবাসা পাবে!"

"আমি তো সেরকমই একটা মেয়ে খুঁজছিলাম পিসিমণি। বাড়ির মেয়ের মতো থাকবে, যা খুশি খাবেদাবে, সাজবেগুজবে, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে। আমার বর কী বলে বলো তো সব সময়? বলে, 'তুমি যদি সারা পৃথিবীর লোককে ভাল রাখতে চাও তা হলে তা তো তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না। যে একটা-দুটো মানুষ তোমার একটু সহৃদয় ব্যবহার, একটু সহানুভূতির প্রত্যাশী, তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করো। তা হলেই অনেক বড় দায়িত্ব পালন করা হয়!"

"ঠিক কথাই তো বলে ধ্রুব, ঠিক কথাই তো বলে!"

সিধুজ্যাঠা এতক্ষণ আর কোনও কথা বলেননি, এবার হঠাৎ বলে উঠলেন, "এ সব বিরূপাক্ষকে না জিজ্ঞেস করে করা চলবে না!"

জেঠিমা বলল, "কী সব?"

"এই যে তুমি মেয়েটাকে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছ!"

জেঠিমা আমতা আমতা করল, "আমি কোথায়... আশ্চর্য!"

"না, না, বিরূপাক্ষ আসুক, এ মেয়েটা কাজ করবে বলে কলকাতায় এসেছে কি না এ কথা বিরূপাক্ষ বলুক আগে!"

তুলতুলির সুন্দর মুখে ছায়া ঘনাল, "ওই তো বলল সে কথা, আমি তো বলিনি। আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন পিসেমশাই! আমি কি কাজের মেয়ের খোঁজে এ বাড়িতে এসেছি! নাকি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি ওকে?"

"তুই দুঃখ পাস না তুলতুলি, উনি তো বরাবরই এরকম কাঠখোট্টা!" জেঠিমা বলে উঠল।

তুলতুলি উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে, "এবার আমি যাই পিসিমণি। বেশ পাঁচ-সাত মাস পরে এলাম তোমার কাছে, সময়ই হয় না। তাও আসা হত না, ফুলবাগানে একটা কাজে এসেছিলাম, ঘুরে গেলাম!"

জেঠিমার চোখটা ছলছল করে উঠল, "তোর সঙ্গে গাড়ি আছে?"

তুলতুলি মাথা নাড়ল।

"কতদিন বাইরের পৃথিবীটা দেখিনি তুলতুলি। ভুলেই গেছি সব। একটা টিভি কিনে দিতে বলি, তা কিপটে বুড়োর হাত দিয়ে যদি এক নয়া পয়সা খসাতে পারতাম। শুয়েই থাকি, শুয়েই থাকি, একদিন ঘা হবে, মরে যাব!"

তুলতুলি জেঠিমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল একটু। সীতা ভাবল, তুলতুলির যখন এত পয়সা পিসিমাকে একটা টিভি কেন কিনে দেয় না?

সিধুজ্যাঠার দিকে তাকিয়ে তুলতুলি হুকুমের স্বরে বলল, "আপনি আর নামবেন না পিসেমশাই! এই মেয়েটাই খুলে দেবে দরজা!"

তুলতুলির পিছন পিছন দোতলা থেকে নেমে এল সীতাও। তার খুব ইচ্ছে করছে তুলতুলির সঙ্গে এখনই চলে যায়, আর বিধুপুরে ফিরতে হবে না—এ কথা ভাবলেই বুক ঠেলে কঠিন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে তার। হঠাৎ ভিতরে ভিতরে থমকে গেল সীতা, সত্যিই কি লোকের বাড়িতে কাজ করতে চায় সে? সত্যিই কি বিধুপুরকে এড়িয়ে গিয়ে সে সব দুঃখ ভুলতে পারবে?

কিন্তু সে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর আগেই তুলতুলি একতলার উঠোনে দাঁড়িয়ে বলল, "সত্যিই তুই কাজ করবি লোকের বাড়িতে? বাড়ির লোকেদের মত আছে?"

সে মাথা নাড়ল।

"তা হলে?"

"সে আমি মত করিয়ে নেব।"

তুলতুলি কী একটা ভাবল, "আচ্ছা, যদি কাজ করবি ভাবিস তা হলে পিসিমণির কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করিস, আমি বলে দেব আমার বাড়ির ঠিকানা-টিকানা, কখন আসবি, আমি তো সব সময় থাকি না!"

সীতা বলল, "না দিদি, আমায় যদি যেতে হয় কালই যেতে হবে, নইলে জ্যাঠা আমাকে গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। সে আমি জেদাজেদি করে যাব ঠিক, তুমি এখনই ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাও! গ্রামে আমি ফিরব না।"

তুলতুলি আপাদমস্তক চোখ ছোট করে দেখল তাকে, "কী ব্যাপার বল তো? কিছু বাধিয়েটাধিয়ে এসেছিস?"

সীতা ভয় পেয়ে গেল, "বিশ্বাস করো, কোনও খারাপ কাজ করে আসিনি।"

তুলতুলি হাসল, "প্রেম করতিস কারও সঙ্গে? সে বিয়ে করবে না বলেছে?"

চোখে জল এসে গেল সীতার, "তার বিয়ে ক'দিন বাদে।"

তুলতুলি সঙ্গে সঙ্গে চিবুক স্পর্শ করল তার, "আহা রে! আমি যাকে ভালবাসি তারও ক'দিন বাদে বিয়ে, কিন্তু সেই বিয়েটা আমি হতে দেব না। বলিস না কাউকে!"

সীতার চোখ বড় বড় হয়ে গেল, "কিন্তু তোমার তো বর আছে!"

"তাতে কী? ওই বর থাকাও যা, না থাকাও তা! সে যাক গে, তুই একটা কাজ কর... কী করবি... কিছুই মাথায় আসছে না। আচ্ছা, আয় আমার সঙ্গে, আমার ড্রাইভার ছেলেটাকে চিনিয়ে দিচ্ছি, ওকেই পাঠাব আমি কাল দুপুরে। যদি আসিস ওর সঙ্গে চলে আসবি, কেমন?"

সীতা বেরিয়ে এল তুলতুলির সঙ্গে, তার বুক দুরুদুরু করছে, একটা উত্তেজনা অনুভব করছে সে, একটা কী হয়, কী হয় ভাব।

এ সব গলিতে গাড়ি ঢোকে না, তাই তুলতুলির গাড়ি রাখা ছিল অনেকটা দূরে। নীল রঙের সুন্দর দেখতে গাড়ি একটা। এরকম একটা গাড়িতে চড়েই চৌধুরীদের বউরা পুজো দিতে আসে কঙ্কালীতলায়। মাথায় ঘোমটা তাদের, কপালে গোল করে সিঁদুরের টিপ, গায়ে গয়না, গ্রামের লোকেরা হাঁ করে দেখে। কিন্তু তুলতুলি চৌধুরীদের বউদের থেকেও সুন্দর, অনেক ঝকঝকে! শহরের জলবাতাস নাকি আলাদা—তাই তো বলে

গ্রামের লোকেরা। ড্রাইভার ছেলেটা সিটে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, তুলতুলি তাকে 'নয়ন! নয়ন!' বলে ডেকে উঠল জোরে জোরে।

দরজার পিছনে প্রায় সেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সীতা। জ্যাঠা বসে আছে তক্তাপোশের ওপর। মেঝের ওপর উলটে পড়ে আছে চায়ের খালি কাপ। জ্যাঠার পা লেগে উলটে গিয়েছে কাপটা। সীতার সাহস হচ্ছে না এগিয়ে গিয়ে কাপটা তুলে নেয়। কাল রাতে সে তুলতুলির কথা কিছুই জানায়নি জ্যাঠাকে। জানায়নি ভয়েই। এখন আমতা-আমতা করে সব বলতে খেপে গিয়েছে জ্যাঠা। ধুতির খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে জ্যাঠা বলল, "তুই তা হলে এই মতলবেই এসেছিলি?"

সে এ কথার কোনও উত্তর দিল না।

"তোকে আর আমার এক মুহূর্ত রাখার ইচ্ছে নেই সীতা, পারলে তোকে আমি এখনই দিয়ে আসতাম!"

তার ভিতরে কান্না দলা পাকাচ্ছে। হঠাৎ জ্যাঠা উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল তার কাছে, মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বলল, "দ্যাখ মা, এ সব ছোটলোকেদের কাজ, এ পথ তুই ধরিস না, আমরা গরিব কিন্তু তাই বলে বাড়ির মেয়ে অন্য লোকের বাড়ি ঝিগিরি করবে? আচ্ছা বেশ, তুই বিধুপুর ফিরে চল, মায়ের সঙ্গে কথা বল, ভবানীকে বলিস আমাকে দোকানে ফোন করে জানাতে, আমি তোকে আনিয়ে নেব, এ আমি কথা দিচ্ছি!"

"আমি যাব না," সে সোজা চোখে চোখ রাখল জ্যাঠার। আবার রেগে গেল জ্যাঠা, "তুই ভাবছিস গ্রামের লোকেরা আমাকে ছেড়ে কথা বলবে? ছিঃ, ছিঃ ! আমি মুখ দেখাব কী করে? বিধুপুর থেকে কত ছেলে আমার কাছে এসে থেকেছে, খেয়েছে, লেখাপড়া করেছে, চাকরির পরীক্ষা দিয়েছে, চিকিৎসা করিয়েছে; আমার গর্ব হয়েছে ভেবে যে, গ্রামের লোকেদের উপকারে লাগতে পারছি। সেই কোন ছেলে বয়েসে গ্রাম থেকে এসেছিলাম আমি, জানিস? রুজিরুটির সন্ধানে? হাতে একটা ফুটো পয়সা ছিল না। কিন্তু কোনও দিনও প্রলোভনে পা দিইনি, ভুল রাস্তায় হাঁটিনি। মুড়িবাদাম খেয়ে থেকেছি কত দিন কিন্তু কারও কাছে হাত পাতিনি! আমার কথা শোন সীতা, আমার কথা শুনলে তোর ভাল হবে!"

দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বাজে, এরপর রান্না বসালে দেরি হয়ে যাবে জ্যাঠার খেয়ে বেরোতে। সীতা জ্যাঠাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পাশের ঘরে ঢুকে স্টোভ জ্বালাল। জ্যাঠা এসে দাঁড়াল দরজায়, "কাজের মেয়েদের সঙ্গে মানুষ কত দুর্ব্যবহার করে, তা জানিস? ভাবছিস পেট ভরে খেতে দেয়? মান-সম্মান দেয়? মানুষ মনে করে? তা হলে? ভাগ্যের হাতে যদি মারই খাবি নিজের বাড়িতে পড়ে মার খাওয়াই ভাল। এই যে মালিকের বাড়িতে কাজ করে যে দুটো মেয়ে, শেফালি আর সাবিত্রী, চোখের জলে ভাত মেখে খায় রে! এত অত্যাচার!"

জ্যাঠা গলা নামাল, দেখে নিল ঘাড় ঘুরিয়ে দোতলাটা একবার, "কে কে এসে বলে গেল মেয়ের মতো রাখবে অমনি তুই তাই বিশ্বাস করে নিলি?" দরজা দিয়ে ঝুঁকে এল জ্যাঠা, "পাঁচটা অচেনা লোকের এঁটো পাত কুড়োতে ভাল লাগবে? এঁটোকাঁটা খেতে দেবে, ভাল লাগবে?"

দু'বেলার মতো লাউঘন্ট আর বড়ি দিয়ে পালংশাক রান্না হয়ে গেল সীতার সাড়ে আটটার মধ্যে। স্নান করে খেতে বসল জ্যাঠা, ভাত থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে, হাতা দিয়ে ভাতটা ছড়িয়ে দিল সে। খেয়ে উঠে পকেটে

নোটবই, মৌরির ডিবে, রুমাল, টাকার ব্যাগ ভরতে ভরতে জ্যাঠা তার মাথা স্পর্শ করল একবার, "চান করে খেয়ে ঘুম দে একটা, শরীর মন ঝরঝরে লাগবে! হাতে দুটো দিন আছে। দেখি তোকে যদি নিউ মার্কেট ঘুরিয়ে আনতে পারি একবার।" পাঁচটা টাকা দিল জেঠা তাকে, বিকেলে বেরিয়ে ফুচকা আলুকাবলি যা ইচ্ছে খাস, কেমন? মন থেকে তাড়া ও সব! কী?

সীতা হাসল, "হ্যা গো জ্যাঠা!"

জ্যাঠা বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ আনমনে রান্নাঘরে বসে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির কার্যকলাপ দেখল সে। তারপর স্নান সারল। যে সালোয়ারটা পরে গ্রাম থেকে এসেছিল সে—সেটাই পরে নিল। চটের ব্যাগটায় ঠেসে ঠেসে ভরে ফেলল জিনিসপত্র। তারপর ভাত খেয়ে, বাসনকোসন মেজে, রান্নাঘর ধুয়ে তকতকে করে ফেলল।

আর কোনও কাজ নেই। বারোটা বাজেনি। ক্রমশ অস্থিরতা গ্রাস করে তাকে। তুলতুলি কি সত্যিই নয়নকে পাঠাবে তাকে নিতে? সে কি সত্যি সত্যি যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত? তার যেন আর ধৈর্য ধরতে ইচ্ছে করে না—দুটোই প্রমাণসহ জানতে ইচ্ছে করে তার। তুলতুলি মজা করেনি তো তার সঙ্গে? সে-ও সত্যিই অনতিবিলম্বে বেরিয়ে পড়তে তৈরি কিনা অনির্দিষ্টের পথে?

জ্যাঠা এসে যখন দেখবে তখন বিশ্বাসই করবে না সে চলে গিয়েছে এভাবে। সীতার কষ্ট হয় মানুষটার জন্যে। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে জ্যাঠা সমস্ত সকাল জুড়ে। কিন্তু সে তো বুঝবে না, কিছুতেই বুঝবে না। ঠিক আড়াইটের সময় কড়া নড়ে উঠল সদর দরজার। দোতলা থেকে সিধুজ্যাঠার হাঁক শোনা গেল না, এক ছুটে খুলে দিল সীতা দরজা। হ্যাঁ নয়ন। খুব চাপা স্বরে 'দাঁড়াও' বলল সে নয়নকে। তারপর ব্যাগ বের করল ঘর থেকে। তালা থেকে খুলে নিয়ে চাবিটা রাখল তক্তাপোশের ওপর। দরজার শিকল তুলে ভারী লোহার তালাটা এমনিই ঝুলিয়ে দিল আংটায়। তারপর জ্যাঠারই কিনে দেওয়া চটি পায়ে গলিয়ে নেমে পড়ল গলিতে।

আগে আগে চলতে লাগল নয়ন, পিছনে চোরের মতো সীতা। আগের দিনের জায়গাটাতেই রাখা ছিল গাড়িটা। নয়ন আগে উঠে বসল গাড়িতে, তাকে পিছনের দরজাটা খুলে দিল। জীবনে প্রথম গাড়িতে চড়ল সীতা। নরম গদিতে শরীর ডুবে গেল তার। নিজের নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া তখন আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না সে। ব্যাগটা কোলে চেপে ধরে কাঠ হয়ে বসে রইল কতক্ষণ কে জানে! স্রোতের মতো গাড়িঘোড়া, বাস, ট্রাম পার হয়ে ছুটে চলল গাড়ি। একময় সীতা জানতে চাইল নয়নের কাছে, "কলেজ স্ট্রিট মার্কেটটা পার হয়ে গেছি আমরা?"

নয়ন গাড়ি চালাতে চালাতে অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে, "সে তো উলটো দিকে!"

সে বলতে গেল "ও তাই?' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে সীতা চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কলকাতা শহর।

একসময় নয়ন তাকে বলল, "নেমে এসো।" কিন্তু সীতা গাড়ির দরজার গায়ে হাত বুলিয়ে বুঝতে পারল না কীভাবে দরজাটা খোলা যায়। অবুঝের মতো তাকাল সীতা নয়নের দিকে। নয়ন আড়চোখে একবার দেখল তাকে, তারপর ঘুরে এসে খুলে ধরল দরজাটা। গাড়িতে আসতে আসতে সীতা লক্ষ করেছে নয়নের মুখের ভাবটা যেন কেমন কেমন—ঠিক সুবিধের নয়। যেন গাড়ি চালাচ্ছে বিরক্ত হয়ে। নয়নের হাতে শাখার আংটি, তামার বালা। মাঝে মাঝে যখন গাড়িটা চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ছিল পুলিশ হাত দেখালে, তখন নয়ন

অধৈর্য হয়ে স্টিয়ারিং-এর ওপর আঘাত করছিল হাতের বালাটা দিয়ে। একবার একটা ট্যাক্সি ড্রাইভার আর একবার একটা মোটরবাইকওয়ালাকে গালাগালি করতে শুনেছে সীতা নয়নকে। ইঁচোড়ে পাকা হাবভাব। কায়দা করে আঁচড়ানো চুল। জড়সড় হয়ে নেমে দাঁড়াতে নয়ন একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, “ওই বাড়ি, বেল মারো!” কিন্তু ঠিক কোন বাড়িটা সীতা সেটা বুঝে উঠতে পারল না এই খাপছাড়া নির্দেশে। দুটো বাড়ির মাঝামাঝি গাড়ি দাঁড় করিয়েছে নয়ন। সে বলল, “কোন বাড়িটা?”

একটা বিরূপ মুখভঙ্গি করে নয়ন নিজেই এগিয়ে গিয়ে বেল বাজাল সাদা বাড়ির দরজায়। সীতা পাড়াটাকে দেখতে লাগল। অদূরেই বড় রাস্তা। শিয়ালদার ঘিঞ্জি গলি, ভাঙাচোরা বাড়ির থেকে পরিবেশটা একেবারে আলাদা। রাস্তাটা গাছে গাছে ভরা। প্রতিটা গাছেই ফুলের সমারোহ। বড় বড় গেটওলা ফ্ল্যাটবাড়ি, গেটে দারোয়ান। রাস্তাটা চওড়া, ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার পাশে। ফ্ল্যাটবাড়িই বেশি, তবে নয়ন যে বাড়িটার বেল বাজাল সেরকম আলাদা বাড়িও রয়েছে।

দরজা খুলে দিল তুলতুলিই। একটা সাদা রঙের সালোয়ার পরে আছে, চুলগুলো উঁচু করে তুলে ক্লিপ আটকানো। দরজা খুলে প্রথমে নয়নকে দেখে ‘কই’ বলে উঠল তুলতুলি। তারপরই সীতার দিকে চোখ পড়ল ওর, মুখটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল। বলল, “বাব্বা, আসতে পেরেছিস তা হলে? আমি তো ভাবলাম মত পালটাবি !” ভয় আর লজ্জা মিশিয়ে হাসল সীতা। তুলতুলি নয়নকে বলল, “নয়ন, তুই এখন গাড়ি ঢুকিয়ে চলে যা, সন্ধে ছটা নাগাদ আসিস, আমি বেরোব।”

দ্বিরুক্তি না করে পাশের বড় গেট হাট করে খুলে লম্বাটে চাতালটায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল নয়ন। তারপর চাবিটা তুলতুলির হাতে দিয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। তুলতুলি তাকে ডাকল, “আয়! দরজাটা বন্ধ করে দে।” দরজা বন্ধ করবে কী, ভেজাতেই কট করে একটা শব্দ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সীতা আশ্চর্য হল।

এবং তারপর একের পর এক তার আশ্চর্য হওয়ার পালা। কঙ্কালীতলার মন্দির যেমন শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে চৌধুরীরা, তুলতুলির বাড়ির পুরোই সেরকম শ্বেতপাথরের মেঝে। এ ঘর ও ঘর পার হয়ে তুলতুলি একটা দরজা খুলে ধরল—সরু আর লম্বা মতো একটা ঘর। দরজা খুলেই বলল, “ইস, কেমন একটা গন্ধ! শোন সীতা, এটাই তোর ঘর। তুই এক কাজ কর, সব চাদরটাদর পালটে ফ্যাল তো! কাচা চাদর পেতে দে। তারপর তাকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি।”

এক ফালি খাট, একটা আলনা আর দেওয়ালে টাঙানো আয়না রয়েছে ঘরটায়। খাট পাতার পর হাঁটাচলারও জায়গা নেই। মাথার কাছে জানলা, জানলাটার ও দিকে পাঁচিল, পাঁচিলের গায়ে লতানে গাছ। তুলতুলি তাকে বলে বলে দিল, সে খাটের নীচের বাক্স থেকে কাচা চাদর, বালিশের ওয়াড় বের করে পেতে দিল বিছানায়। আগের কাজের মেয়েটার ব্যবহার করা চাদর তুলে বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে ফেলল তখনই। তুলতুলি বলল, “এটাই তোর বাথরুম! ওই দ্যাখ, সাবান, পেস্ট সবই রয়েছে। ফুরিয়ে গেলে আবার এনে দেব। আর শোন, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবি, জামাকাপড় ভাল করে সাবান দিয়ে কাচবি। নখ কাটবি, চুলে উকুন নেই তো রে? আগের মেয়েটা একদম ঢ্যাঁড়শ ছিল, বললেও বুঝত না! বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে যেত আমার। তুই কিন্তু খুব স্মার্ট, আমার তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। তবে দেখিস বাবা, কী চাই না চাই একটু মুখ

ফুটে বলিস। গ্রাম থেকে যারা আসে তারা এক একটা যা গোঁয়ার। হ্যাঁ-নাটাও ভাল করে বলে না, ওই মাথা নেড়ে দিল! আরে আমি কি মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছি? ডাকলে গলা তুলে সাড়া দিবি!”

বিরাট বড় আর সাজানো রান্নাঘর, তাতে হাজাররকম যন্ত্রপাতি। সে বলল, “দিদি, আমি তো এ সব জীবনে ছুঁয়েও দেখিনি।”

তুলতুলির গলায় ব্যস্ততা, “সব শিখে নিবি, অত ভয় পাওয়ার কী আছে? ইলেকট্রিকে চলে যে সব জিনিস সেগুলো ব্যবহার করার কতকগুলো নিয়ম আছে, সেটা ভাল করে বুঝে নিলেই হল!” তুলতুলি বলল। দোতলায় একটা বেল আছে, সেটা রান্নাঘরে বাজবে, সেটা বাজালেই সীতা যেন দোতলায় ছুটে যায়।

“তুই জামাকাপড় আয়রন করতে পারিস?”

“কী করতে?” সীতা বড় বড় চোখ করে তাকাল তুলতুলির দিকে।

“আরে, ইস্ত্রি করতে পারিস?”

“পারি!”

অঞ্জনদার জামাকাপড় তো সেই ইস্ত্রি করে দিত! দীর্ঘশ্বাসটা চেপে গেল সীতা। তুলতুলিকে অনেক কথা বলার ছিল তার, কিন্তু তুলতুলি ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন মাথায় ওর এখন একটাই চিন্তা, কীভাবে সীতাকে সব কাজ বুঝিয়ে দেওয়া যায়! যেন বেশি কিছু বলতে হলে, তুলতুলি রেগে যাবে ফট করে।

গ্যাস জ্বালানো শিখতেই ঘাম ছুটে গেল সীতার। কতগুলো আগুনের মুখ! সেগুলোর নাম আভেন! কোন নব ঘোরালে কোনটা জ্বলবে, সেই মুহূর্তে মনে রাখা অসম্ভব হয়ে গেল তার কাছে। তুলতুলি তাকে চা করতে বলে দোতলায় চলে গেল আর সে দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো! চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল তার—গতকাল তুলতুলির কথাবার্তায় যে মায়া ছিল, আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই!

অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে তুলতুলি নেমে এল নীচে এবং তেমন রাগও দেখাল না। বলল, “একী! কাঁদছিস? দ্যাখো দেখি! কী হল? জ্বালাতে পারিসনি? বলবি তো? ঘাবড়াস না—কত গ্রামের মেয়ে আমার কাছে কাজ করে ওস্তাদ হয়ে গেল, তুই-ও সব শিখে যাবি! শুধু মন টিকিয়ে থাকিস সীতা, দেখছিস তো এত বড় বাড়ি, গুছিয়ে রাখতে মাথা খারাপ হয়ে যায়,” তুলতুলি নিজেই গ্যাস জ্বালিয়ে চা বসিয়ে দিল, “আমার মনেও কি কম দুঃখ বল? শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ, দেওর কেউ নেই, স্বামীকে পাই না, থাকার মধ্যে ছিল মা, মা দু’বছর আগে মারা গেল, দাদার বউয়ের সঙ্গে আমার বনে না।” ঘুরে তাকাল তুলতুলি তার মুখের দিকে, “এটা কি একটা জীবন বল?”

একটু আগে সীতা একা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ভাবছিল ফিরে যাওয়া যায় কিনা। জ্যাঠা বাড়ি ফিরতে ন’টা, এখন বেরিয়ে গেলে কিছুটা টের পাবে না জ্যাঠা! তারপর যদি বিধুপুর ফিরে যেতে হয় ফিরে যাবে—না হয় আধপেটা খেয়ে থাকবে। এই দামি ঘরবাড়ির ভিতর পরস্য পরের কাছে তার চোখের জলের কোনও মূল্য নেই—ভবানী অন্তত দিনান্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেও জ্বালা জুড়িয়ে যাবে সীতার। অঞ্জনদার বাড়ির ধারে কাছে যাবে না সে—অভ্যেস হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। অঞ্জনদার প্রতি প্রেম, মোহ নিয়েই বাঁচবে সীতা। কাউকে বিয়েই করবে না, ভালবাসা তো দুরের কথা, অথচ অঞ্জনদাদের ছায়াও মাড়াবে না। যেমন সিনেমায় দেখায়, অঞ্জনদাকে দেখলে মাথা নিচু করে সরে যাবে সেখান থেকে! একদিন ঠিক বুঝবে অঞ্জনদা, তার ভালবাসা কত

খাঁটি ছিল...সে দিন...সে দিন কি সেটা ভেবে পেল না সীতা! যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য শুধু—পোড়ো জমিদার বাড়ির সিঁড়িতে উদাস মুখে বসে আছে অঞ্জনদা!

কিন্তু তুলতুলির কথা শুনতে শুনতে আবার মনটা ঘুরে গেল তার। শেষের দিকে তুলতুলির গলার স্বরটা কেমন ভিজে ভিজে ঠেকল তার কানে। তুলতুলি এত সুন্দর, কিছুরই তো অভাব নেই, সবই কত বেশি বেশি, তাও দিদির মনে সুখ নেই? তারই মতো দিদির প্রেমিক অন্য একজনকে বিয়ে করে নিচ্ছে? তুলতুলির দুঃখে কাতর হয়ে উঠল সীতা। হ্যাঁ, নিজের বাড়ি মনে করেই থাকবে এখানে, তুলতুলি বলবে যে সীতার মতো মেয়ে হয় না!

তখন যেন মনকে আরও বেশি আস্থা জোগাতে তুলতুলি বলে উঠল, "তুই আমার ছোট বোনের মতো থাকবি সীতা। আজ তোকে গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যাব।"

বিকেল হলে নিজের একটা পুরনো সালোয়ার কামিজ বার করে দিল তুলতুলি সীতাকে। বলল, "এটা আর আমি পরি না! দ্যাখ তোর গায়ে হয় কি না!"

তুলতুলি খুব একটা লম্বা-চওড়া না হলেও সীতার খুবই রোগা গড়ন। শরীরের কোথাও বাড়তি মাংস নেই, কোমর পর্যন্ত কালো ঢেউ খেলানো চুল, হাত-পাগুলো ছাড়া ছাড়া, লম্বা লম্বা। তুলতুলির সালোয়ার কামিজ তার গায়ে আলখাল্লার মতো দেখাতে লাগল। কামিজটা সামনে দড়ি বাঁধা, ঘটি হাতায় দড়ি। কিন্তু সীতার শরীরে সেই কামিজ বেমানান। গলাটা নেমে গেল অনেক নীচ অবদি! সীতা ওড়না দিয়ে বুক ঢেকে নিজেকে দেখল আয়নায়, ভাল লাগল না তার। তুলতুলি তাই দেখেই বলে উঠল, "বাহ, ভাল মানিয়েছে তোকে! রান্নাঘরের দরজার পিছনে দ্যাখ বড় বড় দুটো নাইলনের ব্যাগ আছে। ব্যাগ দুটো নিয়ে নে তো সীতা সঙ্গে।"

এই সময় ফোন বাজল বড় ঘরটায়, তুলতুলি চলে গেল ফোন ধরতে। তারপর ডাকল তাকে, "শোন, আমাকে বেরোতে হবে, আজ আর তোকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে না। ভেবেছিলাম একটু বাজার করে ফিরব। ফ্রিজ একদম খালি, কিন্তু সে কাল দেখা যাবে। আমি রাতে খেয়ে ফিরব, তুই তোর মতো আলুসেদ্ধ ভাত করে খেয়ে নিস। ফ্রিজে ডিম আছে, অমলেট করে নিস একটা, কেমন?"

তুলতুলি দোতলায় উঠে গেল। নেমে এল ভীষণ সুন্দর করে সেজে। একটা নীল রঙের ফসফসে শাড়ি পরেছে তুলতুলি, সঙ্গে মানানসই ব্লাউজ। চুলে খোঁপা বেঁধেছে, গায়ে মুক্তোর গয়না। বলল, "আমার ঘরটা এলোমেলো হয়ে আছে, একটু গুছিয়ে রাখিস সীতা, সোনা মেয়ে। আর হ্যাঁ, তুই তো নতুন কাউকে চিনিস না—কেউ এলে অতএব দরজা খুলবি না!" তারপর কী ভেবে বলল, "না থাক, আমি বাইরে থেকে লক করে দিয়ে যাচ্ছি! তোর তো বেরোনোর দরকার নেই। ফোন এলে ফোন ধরবি, বলবি আমার ফিরতে রাত হবে, নামটা জেনে নিবি?"

নয়ন এসে গিয়েছিল, সীতাই গাড়ির চাবি বের করে দিল নয়নের হাতে। দেওয়ার সময় নয়নের আঙুলে আঙুল জড়িয়ে গেল তার, মনে হল নয়ন ইচ্ছে করে করল সেটা। সে তাকাতে নয়ন ভুরু তুলে হাসল। সীতার গা-টা কেমন করে উঠল যেন।

বেরিয়ে গেল তুলতুলি, রাত বাড়তে লাগল, তুলতুলির ঘর গুছিয়ে দেওয়ার পর সীতা নিজের জন্য ভাত রাঁধতে ঢুকল রান্নাঘরে। তুলতুলি বলেছে "রান্নাঘর বলবি না, বলবি কিচেন! বলবি টয়লেট! এই ঘরটা হল

ড্রয়িংরুম, আমি যে ঘরে শুই সেটা বেডরুম। এ সব শিখতে হবে। নইলে লোকে কী বলবে?”

মনে জোর এনে গ্যাস জ্বালাল সীতা। পারল। ভাত যখন ফুটছে তখন ফোন বাজতে লাগল বড় ঘরটায়। ফোনটা দিদির ঘরেও বাজছে। ফোন ধরল সীতা আর হিম হয়ে গেল তার শরীর। জ্যাঠা!

“কথা শুনলি না সীতা? আমাকে এত বড় বিপদে ফেলে চলে গেলি? ভবানীকে কী বলব আমি বল?”

সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠল তার শরীর।

“ফিরবি না তুই, অ্যাঁ?”

সে নিরুত্তর।

“অ্যাঁ, এত সাহস? এত জেদ? ছিঃ! আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল।”

সে এবারও কিছু বলল না, আরও কিছুক্ষণ ফোন ধরে রইল জ্যাঠা। এক সময় বলল, ‘বেশ!’ ফোন কেটে গেল।

সে দাঁড়িয়েই রইল কানে ফোন দিয়ে। মনে হল ঝিঁঝির ডাক শুনতে পাচ্ছে সে। পুকুরে মাছের ঘাই মারার শব্দ, অশ্বত্থ গাছের কোটরে বসে প্যাঁচা ডাকছে, অদ্ভুত সেই ডাক, শিকার ধরার পর যেমন ডাকে। অনেক রাত, ন'টা বেজে গিয়েছে, গ্রাম ধীরে ধীরে নীরবতায় ঢলে পড়ছে, বিষ্ণুপ্রিয়ার এই সময় ঘাটে কী প্রয়োজন! লোডশেডিং, সাপের ভয়, কালো বিছের ভয় সব উপেক্ষা করে বিষ্ণুপ্রিয়া গাইছে ‘কৃষ্ণ বলে, কৃষ্ণ বলে ডাকে কয়জনা?’ আর সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘরে ঢুকে কতকগুলো অপুষ্ট, খড়িওঠা, বেয়াদব সন্তানের দিকে তাকিয়ে ভবানী কথা বলে উঠছে নিজের সঙ্গে। ‘যা করেছে ভালই করেছে সীতা!’ আফশোস করছে না, কষ্ট পাচ্ছে না, অশ্রুপাত করছে না—ভবানী অবলীলায় মেনে নিচ্ছে সীতার সিদ্ধান্ত! তখন অনেক অনেক দিন কেটে গিয়েছে...

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে চপলা। শুভঙ্করী হাত চেপে ধরল দিদির। আঁচল চেপে ধরল। চপলা বলল, ‘আঃ, ছাড়! ছেলেমানুষি করিস না শুভা!’

এই ক’দিনই মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি তার। এখনও সে মুখে কিছু বলতে পারল না। জল বেরিয়ে আসছে হুড়হুড় করে চোখ দিয়ে, বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বুক। সে বলতে চাইল, “দিদি তুই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল! আমি একবার মানুষটার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। দু’চোখ ভরে দেখে নেব একবার, তারপর মরলেও দুঃখ নেই।” এই তো ক’দিন আগেই উপেন গুছাইত তাকে কত আদর সোহাগ করল, কত মিষ্টি কথা বলল। বলল, “শুভা, তোর কিন্তু কোনও চিন্তা নেই! খেটে খেটে গতরে তোর কালি পড়ে গেছে, এবার আরাম আয়েশ করবি, খাবিদাবি, তুই পাড়াবেড়ানি মেয়ে, পাড়া বেড়াবি।” সেই কথাগুলো এখনও কানে বাজছে তার, মনে পড়লে মাটিতে আছাড়ি বিছাড়ি করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে শুভঙ্করীর!

শরীরে এতটুকু বল নেই তার এখন—চপলা সহজেই হাত ছাড়িয়ে নিল, আঁচল ছাড়িয়ে নিল। ঠেলে দিল তাকে, চপলার চোখেও জল, হতভাগ্য বোনকে নিয়ে তার নিজেরও অশান্তি কম নেই কিছু। কিন্তু করারই বা কী আছে? সে যে বাড়িতে কাজ করছে আজ দশ বছর, তারা ভীষণ ভাল মানুষ বলে শুভঙ্করীকে সাত দিন থাকতে দিয়েছে। সাত দিন ধরে হন্যে হয়ে একটা কাজ খুঁজেছে চপলা বোনের জন্যে। সে খুব চেয়েছিল বোনটাকে কাছেপিঠের কোনও বাড়িতে কাজে ঢোকায়। একটু খোঁজখবর নিতে পারত, একটু দেখাশোনা

করতে পারত তা হলে। কিন্তু যেমন পোড়াকপাল মেয়েটার—ক দিন আগেও তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির আটতলার বউদি ‘একটা ভাল মেয়ে দাও, বিশ্বাসী লোক দাও’ করে পাগল করে দিচ্ছিল তাকে। শুভঙ্করীকে নিয়ে চপলা যখন গেল সেই বউদির কাছে তখন বউদির একটা ছেড়ে দুটো লোক! শেষমেষ এ বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল তাদের ফ্ল্যাটবাড়ির দারোয়ানের। সকাল থেকে চপলার নিশ্বাস নেওয়ার সময় থাকে না। দুপুরে ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে সে হাজির হল বোনকে নিয়ে এ বাড়িতে। এসে দেখে বিরাট বাড়ি, লোকজনে পরিপূর্ণ, পাঁচ-ছটা কাজের লোক কিন্তু আরও লোক লাগবে। বাড়ির ছোট ছেলের বিয়ে। দারোয়ান তাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে গিন্নি তেমন গা-ও করলেন না। বললেন, “ও জগা চেনে তো, তা হলেই হবে!”

মাইনেপত্র নিয়ে কথা বলার সাহস হয়নি চপলার। যা দেবে দেবে, খাওয়া আর আশ্রয়টুকু জুটলেই চলবে আপাতত! ছোটভাই ষষ্ঠী বলে দিয়েছে শুভঙ্করীকে এখন মোল্লাখালির ধারেকাছেও রাখা চলবে না, প্রাণের ঝুঁকি আছে! কিন্তু মেয়েটা এমন অবুঝ...ফিরে ফিরে সেই পাষণ্ড স্বামীর ঘরে ফিরতে চায়, চোখের জল শুকাতে পারে না বেচারার! তবে এটাও চপলা মানবে যে, তার বোনের মতো গোঁয়ারও সে আর দুটো দেখেনি! শুভঙ্করী আবার হাত জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে চপলার। চপলা আর দেরি করল না, দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সে সোজা একতলায়। দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল গেটে, তাকে চোখের জল মুছতে দেখে বলল, “চিন্তা কোরো না, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। সদ্য সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে তো!”

সে সব চপলার খুব ভালই জানা আছে। গ্রাম থেকে সদ্য সদ্য শহরে পা দেওয়া, পরস্য পরের বাড়ি গতর খাটিয়ে আশ্রয় আর ভাত-কাপড়ের সন্ধান—একদিন তারও গিয়েছে এমন দিন। তবে শুভঙ্করী একই সঙ্গে বোকা আর ত্যাঁদোড় বলে তার মনে দুশ্চিন্তা আছে ওকে নিয়ে। সেই সঙ্গে লজ্জা এবং দুঃখও। একসময় সে কত নজর দিয়েছে ছোট বোনের ভাগ্যকে। ছ’-সাত বছর পর দেখা যাচ্ছে তার আর তার বোনের কপাল এক খুঁটিতেই বাঁধা।

চপলা বলল, “আমাকে একটু ফোন নম্বরটা লিখে দিন না দাদা, শুভা এমন করছে যে আমি দুটো কাজের কথা বলার সময় পেলাম না।”

দারোয়ান পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বের করে ফোন নম্বর লিখে দিল। বুকের মধ্যে রাখা ডলি জুয়েলার্স-এর ভেলভেটের ব্যাগে কাগজটা গুঁজে দিল চপলা। তার মনিবরা খুব উদার মানুষ, যত খুশি ফোন করুক না কেন সে শুভঙ্করীকে আপত্তি করবে না। এখন চট করে আর আসবে না চপলা এ দিকে। এলেই শুভা আবার হাতেপায়ে ধরবে উপেন গুছাইতের নাম করে! মনটা বসা দরকার বেচারির! তা ছাড়া দূরও তো কম না— সেই কোথায় গল্ফ গ্রিন আর এই কোথায় লেক রোড! কথায় কথায় আসা-যাওয়া করা অসম্ভব চপলার পক্ষে!

দিদি চলে গেল নেমে—দেখল শুভঙ্করী। কান্নার দমকে তার তখন দমবন্ধ হয়ে আসছে, তবু সে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করল না! সিঁড়ির দেওয়ালে পিঠ ঘষটে বসে পড়ল ধপ করে সিঁড়ির ওপর। আর নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল। তার চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে জল পড়ছে। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কান্নাটা একটু ধরে গেল তার, তখন সে ফোঁপাতে লাগল আর চোখ-নাকের জল দিয়ে আপন মনে ছবি আঁকতে লাগল দেয়ালে, ছবি মানে এঁকাবেঁকা দাগ!

হঠাৎ সে চমকে গেল পিছন থেকে কারও ধমক খেয়ে, “ও মা, এ কী গো, এ কী কাণ্ড?”

ঘুরে তাকিয়ে সে দেখল মোটা মতো মেয়েছেলেটা, বাড়ির গিন্নির পাশে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে, কচর কচর পান চিবোচ্ছিল, "অ্যাই মেয়ে, এটা কী করছিস, অ্যাঁ? সদ্য রং করানো হয়েছে দেয়াল, বাড়িতে বিয়ে, বসে বসে সিগনি মুছছিস তাতে? আক্কেল দ্যাখো!"

মেয়েছেলেটার গলা শুনে বাড়ির ভিতর থেকে আরও একটা মেয়ে বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল, "কী হয়েছে যমুনাদি?"

"কাঁদছে আর সিগনি মুছছে দেয়ালে!"

অল্পবয়েসি মেয়েটা বলল, "এ তো তখন থেকে কেঁদেই যাচ্ছে দেখছি! অ্যাই ওঠো, কী হয়েছে তোমার? এমন হা-পিত্যেশ করে বসে থেকে কী হবে, কাজকর্ম বুঝে নেবে চলো!"

ফোঁপানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শুভঙ্করীর, এবার হেঁচকি উঠতে লাগল তার, মুখ থেকে একটা থুতুর পটকা বেরিয়ে ফেটে গেল।

যমুনা আঁচল চাপা দিল মুখে, "যাঃ ! দেখো দেখি, নালে ঝোলে একাকার! মাগো, কী ঘেন্না!"

সে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল যমুনার দিকে। যমুনা ফরসা, বিরাট মোটা, একটা নীল শাড়িতে রং আরও যেন ফেটে পড়ছে গা থেকে। দু'হাত ভরতি মেরুন কাচের চুড়ি। শুভঙ্করীর নিজের হাতেও হলুদ সবুজ লাল কাচের চুড়ি রয়েছে। দু'হাতে দু'ডজন করে কিনে পরেছিল বনবিবির মেলার সময়। উপেন গুছাইত নিজে কিনে দিয়েছিল চুড়ি, ভাঙতে ভাঙতে এখন কটা মাত্র অবশিষ্ট! যমুনা এ বাড়ির কে ঠিক বুঝতে পারল না শুভঙ্করী, তবে দাপট যে খুব তা বুঝতে বাকি রইল না তার। এই সময় সিড়িঙ্গে মতো একটা লোক উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে, তাকে আর বাকি দুজনকে দেখে বলল "কী ব্যাপার? কী হয়েছে?"

যমুনা অঙ্গভঙ্গি করে উঠল, "দ্যাখো না, কোথা থেকে এক ঢঙিকে জোগাড় করেছে জগা। সে তো কথাও বলছে না, নড়ছে না। স্বামী ছেড়ে দিয়েছে, এই দুঃখে কেঁদে মরে যাচ্ছে একেবারে!"

সে এবার লোকটার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল। সে যখন যার দিকে তাকায় তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। সেই চোদ্দো বছর বয়েসে উপেন গুছাইতের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। এখন তার বয়েস চব্বিশ— এত বছর সে একভাবে উপেনের দিকেই তাকিয়ে ছিল স্বভাবমতো। স্বামী স্নান করত যখন সে হাঁ করে দেখত, ভাত খেত যখন হাঁ করে দেখত, আদর করত যখন হাঁ করে দেখত, কামকাজে বেরলে ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে থাকত হাঁ করে। শাশুড়ি বলত, "এমন বেহায়া মেয়েছেলে আর দেখিনি!" সত্যিই সে ছিল লজ্জাবোধহীন, ভগবান তাকে এমন করেই গড়েছেন! রাতে যখন সে শুতে যেত স্বামীর কাছে, নিজেই শাড়িজামা খুলে নগ্ন হয়ে মুখ ঘষতে শুরু করে দিত স্বামীর বুকে!

এই কথা মনে হওয়ামাত্র আবার বিনা প্রচেষ্টায় জল বেরিয়ে এল তার চোখ থেকে।

সিঁড়িঙ্গে লোকটা আবার নাম জানতে চাইল তার। যমুনাই বলল, "খুব ঢঙের নাম—শুভঙ্করী!"

লোকটা আর দাঁড়াল না, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল তিনতলায়। "বড় খোকাকে স্নান করিয়েছে নেপালদা?" যমুনার এই প্রশ্নের উত্তরে লোকটা বলল, "রোদটা পড়লে করাব!"

অন্য মেয়েটা বলল, "তোমাকে আর কাঁদতে হবে না। ওঠো তো, এসো আমার সঙ্গে, কাজকর্ম বুঝে নাও আগে, কাঁদার অনেক সময় পাবে। উফ, আমি আর পেরে উঠছি না, বড় বড় পেতলের বাসন চাগাতে গিয়ে হাতের খিল খুলে গেল আমার! যমুনাদি তো খালি হুকুম করে খালাস!"

"তা অত যখন ননীর পুতুল তখন গিন্নিকে বলে দিচ্ছি, তোকে ছেড়ে দিক!" বলে উঠল যমুনা।

মেয়েটা বলল, "অত আমাকে গিন্নির ভয় দেখিয়ো না তো যমুনাদি। ছেড়ে দিলে কী হবে? এক পা বাইরে রাখব, কাজ পেয়ে যাব। এই তো বাঁ হাতের মাড়োয়ারি বাড়ি থেকে কতবার ডেকেছে আমাকে। দেড় হাজার মাইনে দেবে! কাজের অভাব?"

"তা হলে আছিস কেন? যা না সেখানে!"

"না বাবা, মাড়োয়ারি বাড়িতে কাজে ঢোকার মতো ভুল আমি করছি না। লতাকে জিজ্ঞেস করো কী খেতে দেয়! নিজেরা তো ভাল ভাল খাবার খায়, কাজের লোকেদের কিচ্ছু দেয় না। সাতসকাল থেকে এত এত বাটনা, বাটতে হয় লতাকে।"

"তারপর তোর তো আবার মাছ ছাড়া মুখে ভাত ওঠে না। ওখানে তো শাকপাতা, শুকনো রুটি এই খেয়ে থাকতে হবে। পেস্তাবাদামের শরবত তো তোকে দেবে না!"

মেয়েটা মুখ ভেটকে বলল, "না বাবা, দুটো পেটে খেতে পাব বলে পরের বাড়ি কাজ করতে বেরিয়েছি। ও মাড়োয়ারি বাড়িতে আমাদের মতো লোকেদের পোষাবে না!"

যমুনা হেসে উঠল, "খুব তো বলছিলিস, যা না যা! এ বাড়ির গিন্নির মতো বড় মন কারও নয়। এই যে এই মেয়েটা, ও আমি বলে দিচ্ছি, কোনও উপকারে আসবে না দেখিস, বসে বসে শুধু অন্ন ধ্বংস করবে। গিন্নিকে বলতে যাও, বলবে, 'আহা, থাকুক, ক্ষতি কী?' "

ওরা আর ডাকল না তাকে, চলে গেল ভিতরে। বসে থাকতে থাকতে কখন সিঁড়ির ওপরই ঘুমিয়ে পড়ল শুভঙ্করী দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কতক্ষণ পরে কে জানে কার একটা স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল সে। দেখল সেই লোকটা, নেপাল—ধুতি-শার্ট পরে আছে, বয়েস পঞ্চান্ন ষাট হতে পারে, বেশিও হতে পারে! লোকটা খুব দয়ার্দ্র কণ্ঠে তাকে বলল, "শোন মা, ভেতরে যা, এটা যাতায়াতের সিঁড়ি, এখানে শুয়ে থাকলে চলে? তা ছাড়া যতই পড়ে পড়ে কাঁদ চোখে জল ফুরোবে না, দুঃখও কমবে না—তা হলে লাভ?"

শুভঙ্করী বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল লোকটার মুখের দিকে। লোকটা বলল, "তোর চোখ দুটো ভারী মায়াবী!"

মায়াবী? তাই যদি হত তা হলে উপেন গুছাইত তাকে চুলের মুঠি ধরে ছুড়ে ফেলতে পারত বাড়ির বাইরে? মাজায় লাথি কষিয়ে বলতে পারত 'জীবনে যেন মুখ না দেখতে হয় তোর, এ দিক পানে এলেও তোকে কবরে চাপা দিয়ে মারব, জেনে রাখিস!'

জলবিয়োগের দরকার পড়েছিল তার। অগত্যা এতদিন পরে প্রথম মুখ ফুটে কথা বলল সে, 'বাদরুম'।

"বাথরুম যাবি? আয়—এই একতলার পেছন দিকে ঝি-চাকরদের বাথরুম, দেখে নে। একটা বেটাছেলেদের, একটা মেয়েছেলেদের!"

তার সময় লাগল একটু। বাথরুমে একটা প্লাস্টিকের ফ্রেমে বাঁধানো আয়না রয়েছে। দাদা তাকে এক কাপড়ে বের করে এনে রেখে গিয়েছে দিদির কাছে। চপলা বিধবা মানুষ, তার কাছে সিঁদুর নামক পদার্থটি নেই-ই। ধুতে ধুতে শুভঙ্করীর কপালের সিঁদুর লাল এখন নিশ্চিহ্ন। আর সেই জন্যেই নিজেকে চিনতে হঠাৎ অসুবিধে হল তার। প্রতিদিন বিকেলে সে রাঙা করে সাজাত সিঁথিটি, টিপ দিত কপালে, ফেস পাউডার লাগাত মুখে, আঙুলে ঘষে ঘষে লাগাত লিপস্টিক। সে এত ঢ্যাঙা লম্বা যে, চেষ্টা করেও গোড়ালির নীচে

নামাতে পারত না শাড়ি। সেজেগুজে সে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াত স্বামী ঘরে না ফেরা অবদি। পাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে, গ্রাম সম্পর্কের দেওর, ভাশুরের নৌকোয় উঠে বসত ইচ্ছে হলে।

জীবনের চারদিকে কত জল ছিল তার, এখন চৌবাচ্চার কালো হয়ে থাকা জলের দিকে তাকিয়ে শুভঙ্করী নিজের ওলটপালট হয়ে যেতে থাকা ছায়াতে ভয় পেল যেন—কেন, কেন তাকে এখানে আসতে হল কে বলবে তাকে? নিজের স্বপ্নের ঘর, বাড়ি, সংসার ছেড়ে, নিজের মরদকে ছেড়ে কেন এখানে পরের বাড়িতে পড়ে থাকবে সে? তার স্বামীর তো কোনও কিছুর অভাব ছিল না! চারবেলা ভাত খেত শুভঙ্করী পেট ঠেসে।

নেপাল কর্মকার শুভঙ্করীকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে নিজে উঠে গেল তিনতলায়। বলল, "বড়খোকাকে এখন বারান্দায় বসিয়ে দেব, তারপর চা করে খাওয়াব। বড়খোকা আবার শিঙাড়া ভালবাসে খেতে, একদিন ছাড়া ছাড়াই চাই। গরম শিঙাড়া নিয়ে আসতে হবে গিয়ে। তুই মা, এইবেলা রান্নাঘরে চলে যা, এখন চা বানাচ্ছে প্রতিমা, এরপর আর চা-টা কিছু পাবি না। যমুনার রাজত্বে একবার ছেড়ে দু'বার চা খেতে হলে রাস্তার দোকান থেকে গাঁটের কড়ি খরচ করে খেয়ে আসতে হয়। তুই তো তা পারবি না যেতে, শেষকালে মাথা ধরলে মুশকিল হবে।"

নেপাল কর্মকারের কথায় যে স্নেহের স্পর্শ তা কতটুকু ছুঁল শুভঙ্করীকে বলা যায় না—সে অন্য ধাতুতে গড়া মেয়ে এক!

তার মাথায় এখন কোনও দ্বিতীয় আবেশের স্থান নেই। সে নিজের দুর্ভাগ্যে মর্মাহত, নিজের বেদনায় নিমজ্জিত। কারও দেখানো দরদই তাকে অভিভূত করতে পারে না!

রান্নাঘর কোথায় তা শুভঙ্করী কী জানে? পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সে ভিতরে। কেউ কোথাও নেই। বেশ একটু দূরের ঘর থেকে মনে হল যমুনার গলার আওয়াজ পাচ্ছে। ঘর খুঁজে সে দরজার কাছে পৌঁছোল, দেখল বিরাট বড় পালঙ্কে আসীন গিন্নি; আর যমুনা তার সামনে একটা মোড়ায় বসে আছে। সে গিয়ে দাঁড়াতে গিন্নি মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন। যমুনা ভারী গলায় বলল, "এখানে কী চাই রে?"

সে কোনও কথা বলল না, তাকিয়ে রইল যমুনার দিকে।

যমুনা গিন্নিকে বলল, "একে দিয়ে বড়মা ওই ফার্নিচার ঝাড়পোঁছ ছাড়া বেশি কিছু হবে না! বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে বলে মনে হয় না।"

গিন্নি রিমোটটা তুলে নিলেন পাশ থেকে, টিভি চালালেন, "কেঁদে কেঁদে চোখমুখ তো ফুলিয়ে ফেলেছে। যমুনা ওকে কিছু খেতে দিয়েছিস?"

যমুনা দু'-এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর মোটা শরীরটাকে কষ্ট করে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে গেল একটা। সে ভ্রূক্ষেপও করল না, দেখতে লাগল গিন্নিকে।

গিন্নি বললেন, "আয়, ভেতরে আয়, বোস!"

সে পালঙ্কের বাজু ধরে দাঁড়াল গিন্নির যথেষ্ট কাছাকাছি।

"এত কাঁদছিস কেন? কেঁদে কী হবে? বর ছেড়ে দিয়েছে, তুই-ও মুখ ঘুরিয়ে নে, চুকে গেল। এই যে যমুনাকে দেখছিস—ও কত ছোট বয়েস থেকে আমার কাছে আছে জানিস? ওর-ও বিয়ে হয়েছিল, বরটা মানুষ ছিল না, সেই বোধহয় বিশ বছর আগে ওর মা ওকে রেখে গেছিল আমার কাছে। কষ্ট কি পায়নি, কিন্তু

ভুলেও ফিরে যায়নি বরের কাছে। একবার তো ওর বর নিতেও এল ওকে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল যমুনা। যে স্বামী সতিন ঘরে এনে তোকে কুকুর বেড়ালের মতো তাড়িয়ে দিল তার জন্যে কীসের মায়া রে? ক'দিন বাদে আমার ছোট ছেলের বিয়ে, বাড়িতে লোকজন আসবে, আনন্দ হইচই হবে, কত খাওয়াদাওয়া হবে—সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাক, দেখবি ভাল থাকবি।"

শুভঙ্করীর চোখ দিয়ে টপটপিয়ে জল পড়তে লাগল আবার। গিন্নি বললেন, "আহ, আবার কাঁদে?"

এই সময় যমুনা ফিরে এল, বলল, "যা তো, প্রতিমার কাছে যা, তোকে ও খেতে দেবে।"

গিন্নি বললেন, "ওকে বসিয়ে রাখিস না, কাজে লাগিয়ে দে, বসে বসে থাকলে মন খারাপ করবে শুধু।"

সে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। যমুনা বলল, "বড় ঠ্যাঁটা মেয়ে তো, ভাল কথায় গলে না, যা বলছি রান্নাঘরে।"

গিন্নি আর কথা বললেন না, টিভি দেখতে লাগলেন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে। যমুনা এগিয়ে এসে হাত ধরে টানল তার, কিন্তু তাকে নড়ানো গেল না! যারপর নাই অবাক হল যমুনা আবার, "যাবি না?"

কান্না জড়ানো গলায় সে বলল, "আমার দিদিরে ডাকো।"

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল যমুনা, "রাস্তা চিনিস? সোজা চলে যা।"

সে কাতর হয়ে বলল, "রাস্তা তো চিনি না? একটা ফোন করে দাও।"

"মাগো, বলছে দ্যাখো! কেন আমি তোর বাপের চাকর? ও আর বলতে হবে না, কেন তোর বর ঘরে সতিন এনেছে, কেন তোকে তাড়িয়েছে—সব বুঝতে পেরেছি! ফোন নম্বর আছে? এখুনি তোর দিদিকে ফোন করছি, এসে নিয়ে যাক।"

"ফোন নম্বর তো নেই?"

যমুনা হাল ছেড়ে দিল, "বড়মা, এ সামলানো আমার কর্ম নয়, এমনিতেই আজকাল আমার চট করে প্রেশার চড়ে যায়, আমি জগাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি এসে বিদেয় করো!"

যমুনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা, টিভি নিভিয়ে দিলেন রিমোট টিপে। বললেন, "তুই তো গ্রামে ফিরে যেতে চাস?"

সে তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল।

"এখন সন্ধে নামছে, আজ তো আর যেতে পারবি না? গেলে সেই কাল!"

এবার সে আর মাথা নাড়ল না, যেন এখনই ফিরলে ফেরা যায়, ইচ্ছাশক্তির জোরে।

"তোর গ্রামের নাম কী?"

"হলুদসোঁতা গ্রাম, শ্বশুরঘরের গ্রাম।"

"কে কে আছে শ্বশুরবাড়িতে?"

খুব কেঁদে উঠলে তারপর দীর্ঘসময় ধরে বুক কাঁপানো একটা নিশ্বাস মাঝে মাঝেই পড়তে থাকে মানুষের—শুভঙ্করীর সেই কখন থেকে পড়ছে সে রকম নিশ্বাস, ছোট্ট ভূমিকম্পে হৃদয় যেন এ পাশ ও পাশ করছে, "শাউড়ি আর আমার বর! আর এখন ওই মেয়েটা!"

"তোর কত বছর বিয়ে হয়েছে?"

"অনেক বছর।"

“ছেলেমেয়ে হয়নি?”

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না তার, সে চুপ করে রইল।

গিন্নি বললেন, “কী করে তোর স্বামী?”

উপেনের কথায় কাজ হল, “ভেড়িতে কাজ করে, ফার্নিচার বানায় সুঁদরি কেটে।” সে মনে মনে স্মরণ করল উপেনের শক্তসমর্থ শরীরটা। দুটো বাহুতে কত জোর। জলকাদায় ভ্যানরিকশা বসে গেলে এক হ্যাঁচকা টানেই উপেন কেমন তুলে আনতে পারে। সেই হাত, সেই শরীরের নিষ্পেষণ তার কাছে এখন অধরা? শুভঙ্করী বাঁচবে কেমন করে?

“যমুনা! যমুনা!” গলা চড়িয়ে ডাকলেন গিন্নি। যমুনা ফিরে এল, গিন্নি বললেন, “শোন, শুভঙ্করী খুব লক্ষ্মী মেয়ে, যা ওকে নিয়ে যা, একটু চা জলখাবার দে, আজকের দিনটা তো ও থাকুক, কালকের কথা কাল দেখা যাবে।”

যমুনা মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল, গিন্নি তাকে ইশারা করল ওর পিছন পিছন যেতে। সে ভাবল আজ রাতটা কাটিয়ে দিদির কাছে ফিরে যাবে, সেখান থেকে বাপের বাড়ির গ্রামে, জামবেলিয়া।

রান্নাঘরে বসে এক কাঁড়ি আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে যে প্রৌঢ়া তাকে এই প্রথম দেখল শুভঙ্করী। যমুনা বলল, “এই সেই মেয়ে গো প্রতিমা! দ্যাখো, তোমার মোহনভোগ মুখে তুলতে রাজি হয় কি না!”

প্রৌঢ়া তাকে দরজার পাশটা দেখিয়ে বলল, “ওইখানে বসো, বাইরের কাপড়চোপড়ে আর রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না। আমি চা দিচ্ছি, গরম গরম রুটি হয়েছে, সুজির হালুয়া দিয়ে খাও।”

প্রতিমার এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল, কপালে এত বড় একটা সিঁদুরের টিপ, মাথায় সিঁদুর। সে বলল, “তোমার কাছে সিঁদুর আছে? আমি একটু সিঁদুর পরব।”

প্রতিমা অবাক হয়ে তাকাল, “সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই?”

সে মাথা নাড়ল। এক মুহূর্ত ভাবল প্রতিমা, “শাড়িজামা কিছু না?”

“না!”

“দাড়াও দেখি,” গ্যাসে বড় ডেকচিতে দুধ ফুটছিল, প্রতিমা গ্যাসের আঁচটা কমিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে, ফিরে এল একটু পরে।

“মাকে বললাম তোমার শাড়িজামার কথা, তা মা বলল, তুমি নাই যদি থাকো তা হলে তোমাকে কিছু দিয়ে লাভ কী?”

সে আনমনে বলল, “এও তো আমার দিদির শাড়ি-ব্লাউজ।”

“তুমি থাকবে কি থাকবে না তাই বলো দেখি? সেই মতো ব্যবস্থা করব।”

“কালই চলে যাব।”

“বেশ, তা হলে ওখানেই বসে থাকো। আজ এ বাড়িতে মেলা লোকজন এসে পড়বে, কাল বিপত্তারিণীর পুজো। এখন এত ময়দা মাখতে হবে আমাকে। হেনা তো ভুলেও এ ধার মাড়াবে না। ভাবলাম তুমি যদি একটু কাজে লাগো।”

প্রতিমা উঠল আবার, “একটা থালায় দুটো রুটি আর সুজি বেড়ে দিয়ে তার সামনে নামিয়ে রাখল, একটা কাপে চা ঢেলে দিল। চা জুড়িয়ে জল, এখন আর চা হবে না। এখন অনেক কাজ।”

সে খাবারে হাত ছোঁয়াল না। চায়ের কাপ স্পর্শ করল না।

"তোমার যদি বাচ্চাকাচ্চা থাকত তা হলে বুঝতে। আমার তো স্বামী থেকেও নেই, ছেড়ে চলে গেছে, সিঁদুর পরতে হয় তাই পরি, সে বেঁচে আছে না মরে গেছে জানি না। তিনটে ছেলেমেয়ে, তারা আমার মা'র কাছে মানুষ হচ্ছে, আমি রোজগার করে টাকা পাঠাই তবে তারা খেতে পায়, আমার তোমার মতো দুঃখে নুয়েপড়ার সময় নেই," প্রতিমা বলল।

সে চুপ করে শুনতে লাগল প্রতিমার কথা, "দু'মাসের ওপর বাড়ি যাইনি। ক'দিন আগে ছোটছেলে ফোন করল, টাকা চাই, ঝড়ে বাড়ির চাল ভেঙে পড়েছে। শুনলাম বড়ছেলে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করছে। এত পড়াশুনো করানোর চেষ্টা করলাম, পরীক্ষা দিল না, বইখাতা কেনার টাকাগুলো সব জলে গেল। যা পারে করুক, নিজের ভাল নিজে বুঝলেই হল। এই বাড়িতে বিয়ে লাগছে, মাকে বলে রেখেছিলাম মেয়েকে এনে ক'দিন রাখব। যমুনার ইচ্ছে নয়। কে জানে কেন? নইলে আমার মেয়েও তো দিব্যি এ বাড়িতে কাজ করতে পারে, ষোলো-সতেরো বছর বয়েস হল। এবার ভেবেছি দেশে গেলে মেয়ে নিয়ে আসব, এ বাড়িতে না হোক অন্য কোথাও কাজে দিয়ে দেব।"

সে অভিমানভরে উচ্চারণ করল, "আমার বরের তো ভাতের অভাব নেই। আমি কেন লোকের বাড়ি কাজ করব, করব না।"

যমুনা এসে দাঁড়াল পিছনে, "কী এত গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর হচ্ছে?"

"গুজুর গুজুর কী হবে? আমি বলছিলাম এত ভাল আশ্রয় ছেড়ে যেয়ো না," বলল প্রতিমা।

যমুনা ধমক দিল তাকে, "দরজা জুড়ে বসে আছিস কেন, সরে যা, মামাবাবু এসেছেন, বড়খোকার কাছে গেছেন, চা করব মামাবাবুর জন্যে!"

প্রতিমা বলে উঠল, "আমি করে দেব?"

"না থাক, তুমি তোমার কাজ করো," যমুনা চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। শুভঙ্করীর জানতে ইচ্ছে করল বড়খোকা কে?

"বড়খোকা? বাড়ির বড় ছেলে। পাগল!" প্রতিমা ফিসফিস করে বলল 'পাগল' শব্দটা, "এ বাড়ির কর্তাও পাগল ছিল। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল।

প্রতিমা তাকাল এ দিক-ও দিক চোরা চোখে, "ছোট ছেলেরও মাথার অসুখ। লুকিয়ে বিয়ে দিচ্ছে।"

এক ফাঁকতালে যখন আশেপাশে কেউ নেই, প্রতিমা বিরাট হাঁড়িতে মাংস কষছে, লোকজন এসে পড়েছে আরও, গিন্নি এসে বসেছেন বাইরের ঘরে, যমুনা তাদের তদ্বিরতদারক করছে, অন্য মেয়েটা যার নাম নাকি হেনা, তাকে এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছে একটা ওরই বয়েসি মেয়ে বাইরে—শুভঙ্করী আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তিনতলায়। কোলাপসিবল গেটে তালা মারা, পুরো তিনতলাটাই অন্ধকার, শুধু সামনাসামনি ঘরটার দরজা হাট করে খোলা, ভিতরে নিবু নিবু হলুদ আলো, জানলাগুলো সব বন্ধ। সেই মৃদু আলোয় সে দেখতে পেল একটা হেলানো চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে এক প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই সৌম্যদর্শন পুরুষ! সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরা, পরিষ্কার করে কাটা দাড়িগোঁফ। বুকের কাছে জড়ো করে রাখা দুটো হাত। নির্বিকার বসে আছে যেন এমনই যুগের পর যুগ। শুভঙ্করী হাঁ করে দেখতে লাগল সেই পুরুষকে। এত সুন্দর মানুষ সে কখনও দেখেনি! সে গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ কে জানে, হঠাৎ লোকটা মুখ ঘুরিয়ে চোখ দুটো এনে ফেলল

একদম তার মুখের ওপর, উজ্জ্বল হয়ে উঠল দৃষ্টি—তারপর তেমন হঠাৎই বাড়ি কাঁপিয়ে হা হা হা হা করে হেসে উঠল। শুভঙ্করী সেই হাসির শব্দে চমকে উঠে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল কোনওমতে। লোকটা ছুটে এল ঘর থেকে তার দিকে, আসুরিক শক্তিতে নাড়াতে লাগল গেটটা এমন যেন ভেঙেই ফেলবে। সে পালাবার জন্যে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে, ধুপধাপ করে আর তার বাঁ পা-টা বেকায়দায় পড়ে মচকে গেল। সে 'মাগো' বলে কেঁদে উঠে বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর।

ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সীতার। চোখ মেলে তাকিয়ে সে প্রথমে দেখে নিল জুরা কী করছে। বাঁ পা-টা তার গায়ের ওপর তুলে দিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা। ঠোঁটটা ফুলে রয়েছে কেমন! যেন মা বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে কান্নাটা কাঁদছিল ও, অনেক কষ্টে, অনেক আদর দিয়ে ভোলাতে পেরেছিল সীতা—সেই কান্নাটারই বাকি অংশটা ঘুমের মধ্যে কেঁদে চলেছে ও।

লাল টুকটুকে ছোট্ট শরীরটাকে নিমেষের মধ্যে জাপটে ধরল সীতা একবার। আহ্, কী আনন্দ যে হয় এমনটা করলে। এক অদ্ভুত মায়ায় আক্রান্ত এখন তার হৃদয়। জুরাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলেও বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। এক মাস আগে যখন এ বাড়িতে পা রেখেছিল তখন জুরা কোলেই আসতে চায়নি সীতার। আসার এক ঘণ্টার মধ্যে নাতাশা বাচ্চা তার জিম্মায় রেখে বেরিয়ে গিয়েছিল কাজে। ভীষণ কাঁদতে থাকা জুরাকে নিয়ে সীতা দাঁড়িয়েছিল গিয়ে ব্যালকনিতে। অফিসের গাড়ি নীচে শরৎ বসু রোডের ওপর অপেক্ষা করছিল। নাতাশা দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসার আগে তাকিয়েছিল তিনতলার ব্যালকনির দিকে। সীতা দেখেছিল নাতাশার চোখের দৃষ্টিতে কী বিপুল অসহায়তা! ঠোঁট কামড়ে ছিল নাতাশা, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, হাত নেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—আর একবারও পিছনে তাকায়নি। নাতাশা ফিরেছিল মধ্যরাত পার করে। বিধ্বস্ত ক্লান্ত। মাঝখানের সময়টায় এক মুহূর্ত কান্না থামায়নি জুরা। এক ফোঁটা দুধ খায়নি। সামলাতে হিমশিম খেয়ে গিয়েছিল সীতা দুধের শিশুকে। জানতও না কেমন করে বাচ্চা সামলাতে হয়।

সেই শুরু। অচেনাকে চিনতে বেশ কিছু দিন সময় নিয়েছে জুরা। এখন আর তার কাছে থাকতে কোনও আপত্তি করে না ও। ঠিক মতো খায়, ঠিক মতো স্নান করে, ওড়না মুঠোয় ধরে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এখনও মা বেরোনোর সময় কেঁদে ওঠে ও। যতই ঘুমোক, মা ফিরলে গলার আওয়াজ পাওয়ামাত্র ছোট্ট ছোট্ট হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে বিছানায়।

ল্যান্ডলাইনটা বাজছে ড্রয়িংরুমে। ঘড়িতে ঠিক বিকেল চারটে। দুটো নাগাদ নাতাশা বেরিয়ে যাওয়ার পর জুরাকে নিয়ে শুতে এসেছিল সে। দু'ঘণ্টা টেনে ঘুমিয়েছে দু'জনে। এই সময় নাতাশাই ফোন করে একবার ছেলের খবর নেয়। প্রথম প্রথম সময় মেপে ফোন করত দিদি। এখন ব্যাপারটা একটু অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এই ক'দিনেই নাতাশার খুব বেশি আস্থা অর্জন করেছে সীতা। নাতাশা আর জুরা—এই দুটি মাত্র প্রাণী এ বাড়িতে। জুরাকে সে ভালবেসে ফেলেছে, ঠিক যেমন ঝুমকে ভালবেসে ফেলেছিল অন্তর দিয়ে। কিন্তু নাতাশার কাছে কাজ করার অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা তার। এই ক' বছরে বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে বিচিত্র সব সংসার, বিচিত্র সব মানুষ দেখেছে সীতা। মনে মনে এখন সে প্রার্থনা করে যেন নাতাশার কাছেই টিকে যেতে পারে দীর্ঘ সময়। এমনকী মাঝে মাঝে সে ভাবে নাতাশার কাছেই থেকে যাবে চিরকাল! জুরাকে নিয়েই বাঁচবে। হলে ভালই হয়—এত দিন পরে এই প্রথম সীতা বেশ ভাল আছে, আনন্দে আছে, নিশ্চিন্তে আছে। নাতাশা

তাকে কোনও বিষয়েই কিছু বলে না, কোনও কাজে ভুল ধরে না। নাতাশা বলে, 'যা পারিস, যতটুকু পারিস কর বাবা, তুই যেভাবে রাখবি থাকব সীতা, যা খাওয়াবি খাব।' আজ অবদি এতটুকু অভিযোগের দৃষ্টি দেখেনি সীতা নাতাশার চোখে। সে ভাত ধরিয়ে ফেলেছে—নাতাশা তাকিয়েও দেখেনি। রাস্তার উলটো দিক থেকে দু'জনের মতো রুটি-মাংস আনিয়ে নিয়েছে। আর এই সব সময় যতবার সীতা ভাবতে গিয়েছে নাতাশা কত ভাল, ততবার চেপে দিয়েছে চিন্তাটাকে। কারণ, ইতিপূর্বে সে যাকেই ভেবেছে 'কত ভাল', প্রতিবার বোকা বনে গিয়েছে, ঠকে গিয়েছে! এখন তার তাই মনের ভাবখানা এরকম— ভাল হলেই ভাল, মন্দ হলেও কিছু যায় আসে না! ক'দিন আগে ভবানী যখন ফোন করেছিল, সীতা মাকেও সেই একই কথা বলেছে, "ব্যবহার ভাল, আর ভিতরের কথা জানি না, থাকতে থাকতে বুঝতে পারব!" তখন অবশ্য তার দশ দিনও হয়নি এ বাড়িতে।

সাধারণত ফোন করলে মাত্র দুটো-একটা কথাই বলে তার সঙ্গে ভবানী। ফোনে ভবানীর গলাটা অদ্ভুত ভারী শোনায়, স্নেহশূন্য, আবেগশূন্য কণ্ঠস্বর। কথার মধ্যে 'কেমন আছিস? টাকা পেয়েছি!' কিংবা প্রয়োজনে আর একটা আধটা কথা, 'ইনশিয়োরেন্সের টাকাটা জমা দিয়েছিস?' দু'বছর হল সীতা একটা ইনশিয়োরেন্স করিয়েছে নিজের নামে। তখন যেখানে কাজ করত, পূর্ণ দাস রোডের এক বাড়িতে, তারাই করিয়ে দিয়েছিল। ভবানী তার নমিনি। তিন মাস অন্তর তিনশো টাকা জমা করতে হয়।

নাতাশার ফোন ভেবেই খাট থেকে নামল সীতা। এটা তার ঘর। ফ্ল্যাটের বাকি আর দুটো ঘরের মতোই একটা ঘর। একই রকম টিপটপ করে সাজানো গোছানো। পরদা দেওয়া। এ ঘরের আলমারিটায় সীতার নিজস্ব জিনিসপত্র থাকে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর তার ব্যবহারের শ্যাম্পু, সাবান, ক্রিম, পাউডার, বডি স্প্রে, টিপের পাতা, লিপস্টিক। দিদি তাকে সব সময় সেজেগুজে থাকতে বলে। লেক মার্কেটের একটা বিউটি পার্লারে নিয়ে গিয়ে দিদি তাকে চুল কাটিয়ে দিয়েছে। স্টেপ কাট। তেরচা করে কাটা চুলগুলো সব সময় কাঁধের ওপর ছড়িয়ে থাকে। দেখতে বেশ দেখায় সীতাকে এখন। ভাল পোশাক পরে সে যখন রাস্তায় নামে তখন কেউ বলতে পারবে না সে লোকের বাড়ি কাজ করে খায়।

ভাতের হোটেলের মালিক বিমলাদিই নিয়ে এসেছিল তাকে নাতাশার কাছে। নাতাশা তাকে দুটো-একটা কথা জিজ্ঞেস করেই বলল, "তুমি এখনই চলে এসো সীতা, তুমি এলে আমি অফিসে যেতে পারব। আজ চারদিন আমি কাজকর্ম ছেড়ে বাড়িতে বসে আছি। বিকেলে আর একজনের আসার কথা। আমি এখন যাকে আগে পাব তাকেই রেখে দেব। আমার অপেক্ষা করার উপায় নেই।"

সীতা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ও বাড়িতে ফিরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে, ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে চলে এসেছিল। যদি তা না আসত তা হলে কাজটা হাতছাড়া হয়ে যেত। হলে আপশোস করতে হত তাকে। পায়ে রাবারের চটি গলিয়ে সে হলের দিকে এগোল ফোন ধরতে।

"হ্যালো, সীতা?"

ভবানীর কণ্ঠস্বর। গোঙাচ্ছে ভবানী। কিন্তু যেন ভয়ংকর রকম চেষ্টা করছে কান্নাটা-চাপা দেওয়ার। উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়ল সীতা, "কী হয়েছে?" মুহূর্তে তার মনে হল অবশেষে পাগল ললিতকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে কোথাও। হাত-পা অসাড় হয়ে গেল, সে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়।

ফিসফিস করে ভবানী বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে সীতা!"

প্রশ্ন করার সাহস নেই। তবু সে বলল, "কী? বলো।"

“পুলককে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে দিয়েছে।”

“কী!” শিউরে উঠল সে। পুলক পুতুলের বর। ছ মাসও হয়নি পুতুল বিয়ে করেছে পুলককে। সে পুলককে কখনও দেখেনি। ছ’বছর গ্রামে ফেরেনি সীতা। বিয়ের পরপর একবার পুতুল ফোন করেছিল তাকে, সেই একবারই কথা হয়েছিল পাঁচ মিনিট পুলকের সঙ্গে। কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল দিব্যি হাসিখুশি ছেলে একটা। মনে হয়নি মার্ডার চার্জে জেল খেটে এসেছে কিছু দিন। মনে হয়নি দু’নম্বরি কাজ-কারবার করে উপার্জন করে। মনে হয়নি পুলক পার্টির পোশা গুন্ডা! যদিও ভবানী তাকে পুলক সম্পর্কে এই সব তথ্যই দিয়েছিল। সে দিনও শুষ্ক কণ্ঠে ভবানী বলেছিল, “বাধা দিয়ে লাভ নেই, পুতুল শুনবে না, বিয়ে করছে করুক, আমার কোন দায়িত্ব? আমার একটা ছেলেমেয়েও আমাকে গ্রাহ্য করে না। যে যার নিজের পথ বেছে নিয়েছে।”

তোলপাড় করছে সীতার ভিতরটা! পুতুল— পুতুলের এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল? তার ছোট বোন, সে ছ’মাসের বিবাহিত জীবনযাপন করেছে কি করেনি, সিঁথির সিঁদুর মুছে এখন বিধবা সাজবে? ছ’বছর সে বিধুপুর যায়নি। এই দু’বছরে এক গৌরাঙ্গ ছাড়া আর কারও মুখও দেখেনি সীতা। তার মনেই নেই পুতুলকে কেমন দেখতে।

সীতার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। তখন ভবানী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল, “সীতা শোন, বেশি কথা বলার সময় নেই। পুতুল বাড়িতে পালিয়ে এসেছে এক কাপড়ে, ওর জা-ই বের করে দিয়েছে ওকে। যারা পুলককে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল পুতুল তাদের দেখেছে। সবাইকে পুতুল চেনে। ওকে এখানে একটা দিনও রাখা যাবে না। গৌরাঙ্গ পুতুলকে নিয়ে বাসে রওনা হয়ে গেছে। কলকাতার ট্রেনে তুলে দেবে। তুই ওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিস।”

শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হয়ে গেল সীতার, “কী বলছ তুমি মা? পুতুলকে আমি কোথায় রাখব? তা ছাড়া ট্রেন থেকে নামাব কী করে? আমি কী করে জানব ও কোন ট্রেনে আসছে, যোগাযোগ করব কী করে? বলে দিলেই হল?”

“ওরা তোকে ফোন করবে! আমি আর কথা বলতে পারছি না। পুতুল যে বাড়ি এসেছিল ওকে কেউ দেখেনি। দেখে থাকলে আমাদেরও বিপদ। পুতুল আমাদের সবাইকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিল সীতা।”

সে চিৎকার করে উঠল, “গৌরাঙ্গই তো পুতুলকে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারত আমার কাছে। পুতুল যদি একা আসতে গিয়ে হারিয়ে যায়?”

“উপায় নেই সীতা। গৌরাঙ্গকে এখন পুলকের বাড়িতে পাঠাতেই হবে আমাকে, নইলেই ওরা ধরে ফেলবে পুতুল কোথায় আছে আমরা তা জানি। গৌরাঙ্গকে আজ গ্রামে থাকতেই হবে। তুই বুঝতে পারছিস না...”

সে আর কিছু বলতে পারল না, লাইন কেটে দিল ভবানী। ওখানেই বসে রইল সীতা তটস্থ হয়ে। সে বিভ্রান্ত, ভীত; তার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। জানে না কীভাবে পুতুলকে উদ্ধার করবে হাওড়া স্টেশনের ভিড় ঠেলে। বোনকে চিনতে পারবে কি না জানে না, পুতুলই তাকে চিনতে পারবে নাকি? কত রাতে এসে পৌঁছোবে পুতুল তাই বা কে জানে? এই বাড়িতে সীতা কাজ করে, নাতাশাকে যতটুকু চিনেছে সে নাতাশা উদার, মনটা বড্ড ভাল, একটু পাগলাটে—তাই বলে নাতাশাকে সব সত্যি কথা বললে নাতাশা কি রাজি হবে একটা রাতও পুতুলকে জায়গা দিতে? পুতুলের পিছনে এখন খুনেরা, পুতুলের স্বামী খুন হয়েছে, দিদি কখনও

সেই মেয়েকে বাড়িতে ঢোকাবে? আজকাল পাড়াগাঁয়ের সব খবর টিভিতে দেখায়। বিশেষ করে এসব মার্ডারের খবর তো বটেই। টিভিটা খুলবে একবার? দেখবে কী বলছে? কিন্তু উঠতে ইচ্ছেই করল না তার। থম ধরে সে বসে রইল ফোনের পাশে। সময় গড়াতে লাগল।

এই ফ্ল্যাটটা দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা। এখন গ্রীষ্মকাল, সারা দিন সব ঘর রোদ খাচ্ছে। তা ছাড়া একদম রাস্তার ওপর বাড়ি, রাতদিন গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজে, হর্নের আওয়াজে মাথা পাগল পাগল লাগে। তাই দিদি তাকে যতটা সম্ভব জানলা বন্ধ রাখতে বলেছে। জানলায় ডাবল করে কাচ বসানো শব্দদূষণ থেকে বাঁচার জন্যে। আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, হলের পরদাগুলো সরিয়ে একটা একটা করে খুলে দিল জানলা। অমনি রাস্তার আওয়াজ ঝাঁপিয়ে পড়ল ভিতরে। ঠিক এই সময়টায় মহারানিতে শুরু হয়ে যায় কচুরি, শিঙাড়া ভাজা। চারপাশের অফিস-কাছারি থেকে বেরিয়ে লোকজন ভিড় জমায় দোকানের সামনে। চা খায়, শিঙাড়া, কচুরি খায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। এই সময়টায় বাতাসে ডালডার গন্ধ কড়া হয়ে ভাসে। সে দুধ আনতে যায় একটু পরে, বেরিয়ে এক- আধ দিন হয়তো দুটো শিঙাড়া কিনে এনে খায়, চা বানায় নিজের জন্যে।

এখন একটার পর একটা কাজ থাকে তার। জুরাকে ধৈর্য ধরে খাওয়ানো, মুখ-হাত মুছিয়ে দিয়ে জামাপ্যান্ট পরিয়ে লেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। ফিরে জুরার সঙ্গে খেলতে খেলতে রাতের আটা মাখা, রুটি করা, রান্না করা। তারপর আবার জুরাকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো। যত রাত বাড়ে জুরার তত বাড়ে বায়না! কেবলই ছনছন করতে থাকে ও। সে বুঝতে পারে মাকে খুঁজছে শিশু। এক-আধটা বুলি সবে ফুটেছে বাচ্চাটার মুখে। মাঝে মাঝেই খেলতে খেলতে হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে তার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় 'মা?' সে বলে ওঠে, 'এই তো মা আসবে এক্ষুনি, তুমি খেয়ে নাও!'

একটা সময়ের পর ছটফট করতে থাকে জুরা মায়ের জন্যে। ঘুমোতে চায় না কিছুতেই, ফোনটা দেখায় বারবার। সে তখন ফোন করে দিদিকে, মায়ের গলা শুনতে পেলে জুরা হাততালি দিয়ে ওঠে, ফোন নামিয়ে রাখামাত্র বিমর্ষ হয়ে যায়।

হলের শোকেসের ওপর সাজানো একটা ছবি—এক সুদর্শন পুরুষের। নাতাশা মাঝে মাঝে জুরাকে কোলে নিয়ে সেই ছবির সামনে দাঁড়ায়, আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে, "বাবা, বাবা, জুরা—তোমার বাবা!" জুরা মন দিয়ে দেখে ছবিটাকে, হয়তো বলে ওঠে 'বাবা!' এক-এক সময়। এ বাড়িতে আসার পর একদিনই সে দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'জুরার বাবা কবে আসবে দিদি?'

"জানি না সীতা, আসবে কি আসবে না!" বলেছিল নাতাশা। এত বছর ধরে অনেক ধরনের সংসার দেখতে দেখতে সীতা জানে জীবনের হেঁয়ালি কত রকম। সে আর দিদিকে প্রশ্ন করেনি কিছু এই নিয়ে, বুঝে গিয়েছে কোন খানে নাতাশার অনটন। এর বেশি জানতে চাওয়া কাজের মেয়ের পক্ষে সমীচীন নয়।

ক'দিন আগে দিদিকে ফোনে কথা বলতে শুনেছে সীতা, 'জুরাকে এবার স্কুলে ভরতি করে দেব, দু'বছর বয়স হয়ে গেল," কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দিদি বলল, "তুমি ওর বাবা, তোমাকে জানিয়ে দিলাম।"

দিদির মাথায় সিঁদুর নেই, হাত খালি, এয়োতির চিহ্ন কোথাও নেই সর্বাঙ্গে। বিমলাদি বলে, দিদির নাকি বিয়েই হয়নি!

ঘুম থেকে উঠে পড়েছে জুরা। সীতা ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর ফোন করল নাতাশাকে। ঠিক কীভাবে কী বলবে ভেবে পেল না সে—তবু বলতে তো হবেই। বিমলাদির কাছে সাহায্য চাইতে পারত, কিন্তু এ-সব এমন কথা যে বিমলাদিকে বলার সাহস হল না তার। যদি কাউকে বলে দেয়? দিদির নম্বর টিপতে টিপতেই সে ঠিক করল বিরূপাক্ষ জ্যাঠাকে ফোন করবে। অনেকক্ষণ ফোন বাজার পর অপর প্রান্তে দিদির গলা পেল সে। জুরা বুঝতে পেরেছে, মাকেই ফোন করা হচ্ছে, হাত থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে রিসিভার। দিদি বলল, 'হ্যাঁ সীতা, বল, আমি এই ফোন করতাম। জুরা কী করছে রে? উঠেছে?'

"তুমি আগে ওর সঙ্গে একটু কথা বলে নাও দিদি।"

সে ফোনটা জুরার কানে ধরল। কী খুশি বাচ্চাটা! বড় বড় চোখ করে শুনছে মা কী বলছে, তারপর কোল থেকে ঝুঁকে পড়ে ফোনের বোতাম টিপতে লাগল প্রবল উৎসাহে। সীতা রিসিভার নিতে চাইলে কিছুতেই দেবে না। এ সবের মধ্যে ফোনটা কেটেই গেল। পরমুহূর্তেই আবার ফোন এল দিদির। দিদি হাসছে। সে বলল, "কথা বলতে পারে না তো, তাই কী করবে ভেবে পায় না।"

দিদির কণ্ঠস্বরের তারতম্য ধরা পড়ল তার কানে, "হ্যাঁ, কথা বলতে একটু দেরি করছে জুরাটা!"

"না, না, আমার আগের বাড়ির বাচ্চাটা, সেই ঝুমও তো প্রায় আড়াই বছর পার করে কথা বলেছিল দিদি!" তৎক্ষণাৎ প্রবোধ দিল নাতাশাকে সীতা।

"তুই একটু ওর সঙ্গে বকবক করবি, কথা বলতে না শুনলে কথা বলতে শিখবে কোথা থেকে? আমি তো থাকিই না..."

সে বলল, "দিদি, একটা ঘটনা ঘটেছে, খুব খারাপ ঘটনা, খুব বিপদে পড়ে গেছি, সেটা তোমাকে বলব বলেই ফোন করলাম!"

ভীষণ অবাক হল নাতাশা, "তাই তোর গলাটা ভারী ভারী শোনাচ্ছে। কাঁদছিলিস? কী হয়েছে সীতা?"

"দিদি, আমার বোন পুতুল, আমার থেকে দেড়-দু'বছরের ছোট, ছ'মাস আগে বিয়ে হয়েছিল ওর। আজ দুপুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওর বর পুলককে মার্ডার করে দিয়েছে কারা!"

আঁতকে উঠল নাতাশা ও প্রান্তে, "কী বলছিস?"

সীতা কেঁদে ফেলল, "হ্যাঁ দিদি!"

"তোকে কে জানাল?"

"মা ফোন করেছিল! বেশি কথা বলতে পারেনি, ভীষণ ভয় পেয়েছে মা, যারা ডেকে নিয়ে গেছিল পুলককে, তাদের সবাইকে চেনে পুতুল। পুতুল ওদের দেখেছে। পুতুল তাই পালিয়েছে গ্রাম ছেড়ে। আমার ভাই ওকে কলকাতার ট্রেনে তুলে দেবে। মা বলছে এই অবস্থায় পুতুলের গ্রামে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়! তাই ওকে...."

বাকিটা উহ্য রেখে দিল সে, বলার সাহস হল না!

"কী সর্বনাশ! একটা মার্ডারের কথা শুনছিলাম বটে। খবর এসেছে। তোর বোনের বর?" বলে চুপ করে গেল নাতাশা কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "বোন কি তোর কাছে আসছে?"

সে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল কথাগুলো। "শিয়ালদায় আমার যে জ্যাঠা থাকেন, তিনি ওকে রাখতে রাজি হবেন না দিদি। জ্যাঠার বাড়ি কোথায়, সে তো গ্রামের বহু লোক জানে। আর তা ছাড়া, তিনি আমাদের

গ্রাম সম্পর্কের জ্যাঠা। নিজের কেউ তো নন। এ সবের মধ্যে থাকতে রাজি হবেন না।"

"আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না সীতা!"

এবার সীতা আরও ভেঙে পড়ল, "তা ছাড়া পুতুল কলকাতায় জীবনে আসেনি। কখন কত রাতে এসে কলকাতায় পৌঁছোবে তাও আমি জানি না। আমার দারুণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আমি কী করব তুমি বলে দাও দিদি?"

সে উৎকর্ণ হয়ে নাতাশার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। একটা-দুটো করে সেকেন্ড কাটছে, ভীষণ বিরক্ত করছে জুরা এদিকে। সীতা জুরাকে নামিয়ে দিল কোল থেকে। জুরা ছুটে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দায় অমনি, গ্রিলের ভিতর দিয়ে নাক গুঁজে দিল।।

তখন নাতাশা বলল, "এভাবে তো হয় না সীতা, তোর বোন কোন ট্রেনে আসছে না আসছে তুই তো জানিস না। তুই কীভাবে ওকে খুঁজে পাবি? এক যদি খুব চালাক চতুর মেয়ে হয়, তা হলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে ওর হাওড়ায় নেমে ফোনের বুথ থেকে তোকে ফোন করা উচিত। তা হলে গিয়ে নিয়ে আসা যাবে!"

একটা ভারী পাথর নেমে গেল যেন সীতার বুক থেকে।

"ওকে কি তুমি এখানে থাকতে দেবে দিদি?"

"সে দেখি কোথায় রাখি, আমার কাছে হোক, অন্য কোথাও হোক, সে একটা ব্যবস্থা হবে। তুই এক কাজ কর, তুই আজ আর বেরোস না। ফোনের কাছেই থাক। ওর ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে ও তোকে ঠিক ফোন করবে। নইলে আমাদের কিছু করার নেই সীতা। তোদের গ্রাম থেকে কলকাতা আসতে কতক্ষণ লাগে?"

"সে তো অনেকক্ষণের ব্যাপার। কলকাতায় পৌঁছোতে ওর প্রায় মাঝরাত হয়ে যাবে। যদি আদৌ এসে পৌঁছোয়," সে বলল, "দিদি, আমাকে তো জুরার দুধ নিতে যেতেই হবে, বাড়িতে দুধ নেই এক ফোঁটা।"

দিদি কী ভাবল যেন, "শোন সীতা, দুধ নিয়ে বাড়ি চলে আয়। আর একটা কথা, এ সব ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলে ফেলিস না যেন। কান্নাকাটি থামা, চোখেমুখে জল দে, কান্না কান্না মুখ নিয়ে বেরোলেও পাঁচটা লোক পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করবে, তোর বিমলাদি তো আগে ধরবে তোকে। স্বাভাবিক ভাবে যা, দুধ নিয়ে চলে আয়। আমি আধ-এক ঘণ্টা পরে আবার ফোন করছি।"

সে বলল, "তোমার ফিরতে রাত হবে?"

"না, চলে আসব দশটা নাগাদ।"

"দিদি, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। পুতুলের বিয়েটা ভাল হয়নি। পুলক পার্টির জন্যে অনেক খুনটুন করেছে। দু'-তিনটে গ্রামের লোক ওকে ভয় খায়। জেলখাটা ছেলে। তাকেই ভালবেসে বিয়ে করে ফেলল আমার বোন এমন আহাম্মক! আমি ভেবেছিলাম খুনখারাপির ব্যাপার, এসব শুনে পুতুলকে তো তুমি থাকতে দেবেই না, উলটে ঝুটঝামেলা এড়াতে আমাকেও কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে।"

"ধুর!" হেসে উঠল নাতাশা, "খবরের কাগজে চাকরি করি, এসব ঘটনা রোজই ঘটতে দেখেছি, গ্রামের পার্টি পলিটিক্স তো? ওরা তোর বোনকে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেনি—দেখেছে তো ওদের তাতে বয়েই গেছে। কী করবে তোর বোন ওদের বিরুদ্ধে? পুলিশ যাবে? পুলিশ তো ওদের কথায় চলে! ওদেরই আর এক শ্রেণির পোষা গুন্ডা। দ্যাখ হয়তো তোর বোনের বরকে মেরে ফেলার পিছনে পার্টিরই হাত আছে! নইলে দিনে দুপুরে

ডেকে নিয়ে গিয়ে সবার সামনে খুন? কী বললি যেন? মাত্র ছ'মাস আগে বিয়ে হয়েছিল? আহা রে, কী অবস্থা মেয়েটার!" নাতাশা ফোন ছেড়ে দিল।

এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে সীতার—একটা বড় সমস্যার তো সমাধান হয়ে গেল, বাকিটা নির্ভর করছে পুতুলের ওপর।

চটপট পোশাক বদলাল সীতা নিজের, জুরার। জুরা অমনি খুব খুশি, ও ভাবছে এখন সীতার কোলে চড়ে দিব্যি বেড়াতে যাবে রোজ যেমন যায়। লেকে বিকেলে প্রচুর বাচ্চা আসে আয়ার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, দাদুর সঙ্গে। জুরা তাদের সঙ্গে খেলে। এই বেড়াতে যাওয়াটা ওর একটা নেশা। বিকেল হলেই কেবল রাস্তার দিকে দেখাবে। সে জুরার চুল আঁচড়ে দিতে দিতে বলল, "না সোনা, আজ আর বেড়ু বেড়ু হবে না, দুধ নিয়েই বাড়ি চলে আসতে হবে!" জুরা তার কথার মানেই বুঝল না, লাফাতে লাগল কোলে ওঠার জন্যে। তারপর লিফটে করে তিনতলা থেকে নীচে নামল। সিঁড়ির মুখটায় দারোয়ান আর ফ্ল্যাটের ড্রাইভারদের জটলা। গোয়েঙ্কাদের ড্রাইভারটা আজ নেই। কালো মতো লোকটার দৃষ্টিটা মোটেও সুবিধের নয়। জুরাকে তার কোলে দেখলেই আদর করার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সে ছিটকে দূরে সরে যায়। এই বাড়ির বেসমেন্টে চাকরবাকর ড্রাইভারদের থাকার জায়গা আছে। লোকটা সেখানেই থাকে। যে ক'দিন রাতে দিদি বাড়ি ফেরেনি সে ক'দিনই লোকটা মাঝরাতে দরজায় শব্দ করেছে। আই হোল দিয়ে দেখেছে সীতা লোকটাকে। লোকটার নাম শিবনাথ। সে দরজা খোলা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটি করেনি। ভয়ে তখন গা ছমছম করেছে তার। কিন্তু নাতাশাকে বলবে কি বলবে না বুঝতে না পেরে এখনও পর্যন্ত চুপ করে আছে। ভাগ্যিস দিদি তাকে ফ্ল্যাটেরই দ্বিতীয় টয়লেটটা ব্যবহার করতে দেয়, নইলে বাড়ির অন্য কাজের মেয়েদের মতো দিনদুপুরে, রাতদুপুরে নীচের বাথরুমে যেতে হলে লোকটা তাকে নির্ঘাত জড়িয়ে ধরে খামচাখামচি করত। এ সব সীতাকে আগেও সহ্য করতে হয়েছে। সে জানে প্রতিবাদ করে লাভ হয় না—নিজেকেই শিখতে হয় নিজেকে বাঁচাতে।

দুধের দোকানের সামনে বেশ ভিড়। উলটো দিকেই বিমলাদির ভাতের হোটেল। এই সময়টা সাধারণত বিমলাদির বর স্টলটা আগলায়, গোছগাছ করে। সেই কোন ভোর থেকে উঠে রান্নাবান্নার জোগাড় শুরু হয় বিমলাদির। চারটে-সাড়ে চারটে অবদি খদ্দেরের আসার বিরাম নেই। লেক গার্ডেন্সের বস্তিতে থাকে বিমলাদিরা। বাড়ি ফিরে স্নান করে ঘুমটুম দিয়ে আবার বিমলাদি সাতটা নাগাদ দোকানে চলে আসে। রাতের ভাত করে, রুটি করে, সেই পাট মিটতে মিটতে কোনও দিন রাত বারোটা। খাটতেও পারে বটে মানুষটা! সীতা দেখেছে বিমলাদির বর শুধু বাজারটা করে দেয় আর বাকি সময় ফুঁকফুঁক বিড়ি ফোঁকে বসে বসে। লোকটা গাঁজাখোরও বটে! বিমলাদি পারলে বরকে দিয়ে বাজারটাও করাত না—পয়সা মারে লোকটা।

আজ কিন্তু তাকাতেই সীতা বিমলাদিকে দেখতে পেল। একটা ব্যাটারির বাক্সর ওপর হাঁটুর ওপর শাড়ি গুটিয়ে বসে আছে। চোখটা রাগ রাগ। উসকোখুসকো চুল। তেল তেল করছে মুখ, স্নানটান হয়নি দেখেই বোঝা যায়। অন্য দিন জুরাকে দেখতে পেলে বিমলাদি এগিয়ে আসে, গাল টিপে আদর করে, তারও ইচ্ছে হলে দু'-চার মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলে বিমলার সঙ্গে। আজ বিমলাদি তাকে দেখেও দেখল না বলে কেমন খারাপ লাগল। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে মানুষটার নইলে বিমলার মুখে হাসি লেগেই থাকে। দিদির বারণ সত্ত্বেও সে রাস্তা পার হয়ে অন্য ফুটে গেল। এটা মহারাজা নন্দকুমার রোড, এই রাস্তার ষোলো নম্বর বাড়ির কাজ

ছেড়ে দিদির কাজ নিয়েছে সীতা। রাস্তা পার হতে হতে ষোলো নম্বর বাড়ির দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে নিল সে একবার।

"কী গো? তোমার মুখ ভার কেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

বিমলা বুকের আঁচলটা এ পাশ ও পাশ করল, দরদর করে ঘামছে, "বাবু কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি! আজ ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজখবর করে জানতে পারলাম ও আর একটা ছেলে বম্বে পালিয়েছে। বম্বেতে নাকি কাজ করবে, চাকরি করবে! কেমন বদমাইশ ছেলে আমার ভাব সীতা? এত কষ্ট করে দোকানটা দাঁড় করিয়েছি, কোথায় মাকে সাহায্য করবি তা না ও বম্বে গেছে কাজ খুঁজতে! কলকাতায় যেন কাজের অভাব! তা গেলি গেলি, বলে যেতে পারতিস। আমরা কাল থেকে ভেবে ভেবে মরছি! ছেলেটা আমাকে সারা জীবন জ্বালিয়েছে, বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে পড়াশুনো ছেড়ে দিল হারামজাদা। সে দিন আমার কাছে তিনশো টাকা চেয়েছিল চুল রং করবে বলে, দিইনি, তখনই শাসিয়েছে, 'দিলে না তো, এবার আমাকে নিজেকেই টাকা রোজগারের ধান্দা দেখতে হবে!'" বিমলাদি আঁচল দিয়ে চোখ মুছল, "আমার কপালটাই খারাপ, স্বামীটাও সারা জীবন আমার ঘাড়ে বসে খেয়ে গেল। এখন আবার জুয়া ধরেছে। রোজ কুড়ি টাকা, পঁচিশ টাকা গেঁড়িয়ে নিয়ে যায়।"

সে বলল, "যাক, তাও একটা নিশ্চিন্ত, জানতে তো পেরেছ বাবু কোথায় গেছে?"

"কী জানতে পেরেছি বল? বম্বে গেছে, বম্বে কি একটা এইটুকুনি জায়গা। ওই তো আঠেরো বছর বয়েস, বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু আছে? কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়বে! যে শুনছে সেই বলছে বম্বের মতো খারাপ জায়গা আর হয় না। সেখানে রাতদিন খুনখারাপি, যত রাজ্যের গুন্ডা, বদমাইশ, মাফিয়াদের আড্ডা। তার ওপর দ্যাখ না দ্যাখ বোম ফাটছে আর বেড়াল কুকুরের মতো লোক মরছে। কী করতে ও গেল ওখানে তুই বল?"

বিমলা আরও কাঁদতে লাগল, "এই সে দিন বলল 'ঘড়ি কিনে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি কিনে দিলাম। এমন রাগ যে যাওয়ার সময় জামাকাপড়ও নিয়ে যায়নি, ঘড়িটাও ফেলে গেছে। শয়তান একটা!"

খুনখারাপি, গুন্ডা, বদমাইশ শব্দগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধল এসে সীতার মাথায়, সে আর দাঁড়াল না। লাইনে দাঁড়িয়ে ক্যানে দুধ ভরতি করে সে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। বড় রাস্তা পার হয়ে পেট্রোল পাম্পের সামনে পৌঁছে হঠাৎ তার মনে হল কে যেন পাশে পাশে হাঁটছে! চকিতে সে মুখ ঘোরাল, একটা ঢ্যাঙা মতো মেয়ে, ঢেউ খেলানো এক মাথা চুল, উঁচু করে একটা নতুন ছাপা শাড়ি পরা, বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ কেমন ছলছলে। মেয়েটার হাতেও একটা দুধের ক্যান। সে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটার মুখোমুখি। মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জুরার মুখের দিকে। সে দাঁড়াতেই আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল জুরার গাল।

পথেঘাটে যেই জুরাকে দেখে—তাকায়, আদর করে। বিশেষত এ অঞ্চলে তাকে যেমন অনেকে চেনে, তার কোলে ঘুরে বেড়ানো জুরাকেও চেনে। সে হাসল মেয়েটার দিকে তাকিয়ে, দেখলেই বোঝা যায় কোনও বাড়িতে কাজটাজ করে মেয়েটা। হাতের কাচের চুড়ি, পায়ের নুপূর, প্লাস্টিকের চটি, পায়ের ছেতরে থাকা আঙুল, কালো হয়ে থাকা নখ—কে জানে আর কী কী দেখে এমনটা বোঝা যায়, কিন্তু বোঝা যে যায় এটা সত্যি। এই যে মেয়েটা যেমন করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দাঁড়ানোটা দেখলেও বোঝা যায় হয়তো।

সে বলল, "তুমি কি এ পাড়ায় নতুন?"

"হ্যাঁ," মেয়েটা দুধের ক্যানটা ফুটপাতে নামিয়ে রেখে জুরার দিকে হাত বাড়াল। জুরা যাবে না, আঁকড়ে ধরল তার গলা।

“কাজ করো? কোন বাড়ি?”

দুঃখিত মুখ করে মেয়েটা হাত দিয়ে দেখাল কোন রাস্তা, ওটা লেক রোড।

বেশিক্ষণ দাঁড়ানোর সময় নেই, অথচ মেয়েটাকে দেখে কৌতূহল হচ্ছে তার খুব, সে জিজ্ঞেস করল, “তোমার নাম কী?”

“শুভঙ্করী। তোমার নাম?”

“সীতা।”

“তুমি কোন বাড়িতে কাজ কর?” শুভঙ্করী চারপাশে চোখ বুলাল।

“এই তো, এই বাড়িটা, তিনতলা। এবার যাই, বাচ্চাটা খাবে।”

“আচ্ছা।”

কিন্তু সীতা হাঁটতে শুরু করলে শুভঙ্করীও হাঁটতে লাগল পাশেপাশে। সীতা অবাক হল একটু, মেয়েটার যেন কেমন বোকা বোকা হাবভাব। একবার জুরা আর একবার তাকে দেখেই যাচ্ছে। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সীতা। এক পা সিঁড়িতে তুলে দিয়ে সে বলল, “আমি যাই তা হলে?”

“আমার এখন বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। ওই বাড়িতে এখন এত লোকজন, গেলেই বলবে এটা কর, ওটা কর। সব সময় খাটিয়ে মারে, বসতে দেয় না এক মুহূর্ত,” শুভঙ্করী আপন মনে বলে গেল কথাগুলো। সীতা চুপ করে রইল।

“আমি তো কাজ করতে চাই না,” আবার বলল শুভঙ্করী, “আমি তো আমাদের গেরামে ফিরে যেতে চাই। আমাদের গেরামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বিদ্যেধরী নদী—আমার এই শহর একদম ভাল লাগতেছে না!”

মেয়েটা অসহায় চোখ তুলে তাকাল তার দিকে, “পথ চিনি না তাই। নাইলে পালিয়ে যেতাম। যমুনাদি যা বাক্যি ঝাড়ে না—যদি শুনতে?”

অভিযোগের ভারে নত হল শুভঙ্করীর চোখ। মেয়েটা তাকে চেনেও না, তবু কত কথা বলছে। ‘যমুনা’ শুনে তার মনে হল এটা হেনা যে বাড়িতে কাজ করে সেই বাড়িই হবে।

সে বলল, “তুমি কি হেনা যে বাড়িতে কাজ করে সেই বাড়িতে কাজে ঢুকেছ?”

শুভঙ্করী ঘাড় হেলাল।

“পাগলের বাড়ি তো? ওরা কিন্তু লোক খুব ভাল, যমুনাদিও মানুষ খারাপ নয়, তুমি বোধহয় সদ্য সদ্য গ্রাম থেকে এসেছ? অনেকেরই প্রথম প্রথম গ্রাম থেকে এসে শহর একদম ভাল লাগে না, তোমারও তাই হয়তো মনটা খারাপ!”

“মনের আমার দোষ নেই গো,” শুভঙ্করী দু’পাশে মাথা নাড়ল, “বাচ্চা হয়নি বলে আমার বর ঘরে সতিন আনল, তারপর আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিল!”

হু হু করে জল উঠে এল শুভঙ্করীর চোখে, সীতার দু’চোখের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে যেন এর একটা বিহিত খুঁজছে শুভঙ্করী। হঠাৎ কেমন সচকিত হয়ে বলল, “আমি এখন কিছুতেই ওখানে ফিরব না, আমি এখন লেকে গিয়ে বসে থাকব।”

বলেই হনহন করে পা ফেলে হাঁটা দিল।

জুরা আর কোলে থাকতে চাইছে না, নেমে পড়তে চাইছে। গোলগাল বাচ্চা, সীতারও হাত ব্যথা করছে এতক্ষণ জুরাকে কোলে রেখে। তা ছাড়া এবার সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে তার। তবু শুভঙ্করীর হাবভাব দেখে সে পিছু ডাকল ওকে, "শোনো!"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটা, এগিয়ে এল তার দিকে, "সন্ধে নামছে এখন, তুমি লেকে যেও না। এ সব অঞ্চল তো তুমি চেনোও না, কী দরকার এ দিক ও দিক যাওয়ার? এখন তুমি বরং বাড়িই ফিরে যাও শুভঙ্করী।"

কী ভাবল মেয়েটা কে জানে। একটা ঘোরের মধ্যে মাথা নাড়ল, বলল, "তাই যাই!"

অন্ধকার নামল একটু পরেই। জুরাকে খাওয়ানো হয়ে গেল সীতার। হলের কার্পেটের ওপর বসে সে খেলা দিতে লাগল বাচ্চাটাকে। মনটা ফোনের দিকেই পড়ে আছে। দিদি বলেছিল ফোন করবে কিন্তু করেনি। যতই দুর্ভাবনা হোক দিদিকে আর একবার ফোন করার সাহস হচ্ছে না। সে পুতুলের কথাই ভাবছে বসে বসে। পুতুলটা যে এখন কোথায়! যদি শেষ অবদি এসে পৌঁছোয় পুতুল তার কাছে তা হলে কত বছর পর দেখা হবে দুই বোনের। তাও এমন বীভৎস একটা ঘটনার পটভূমিকায়। একটু আগে পর্যন্ত মনের কোণে পুতুলের কোনও অস্তিত্বই ছিল না—ছিল না মায়া-মমতা এতটুকু। কিন্তু এখন সে যে কতটা কাতর বোঝানো শক্ত। অস্থির অস্থির করছে ভিতরটা।

ফেলে আসা জীবনের একটাই অংশ তাকে আজও কাঁদায়—ললিত! ললিত ফিরেছে গ্রামে জানতে পারলে মনটা বিধুপুর ছুটে যাওয়ার জন্যে আনচান করে। কিন্তু ভবানী তাকে এত বছরে কখনও বলেনি, 'বাড়ি আয় সীতা!' কত দুর্গাপুজো কেটে গেল, কত পালাপার্বণ চলে গেল, সে বিধুপুর ফিরল না। এখন আর সীতা বুঝতেই পারে না সে স্বেচ্ছানির্বাসন ভোগ করছে নাকি তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। একবার সিঁড়ি থেকে পড়ে হাত ভেঙে গেল তার, কাজের বাড়ি থেকে ছুটি দিতে চাইল তাকে—ভবানীর কাছ থেকে তখনও পায়নি সে দেশে ফেরার আহ্বান। যে সব বাড়িতে সে কাজ করেছে তারা কোথাও বেড়াতে চলে গেলে সীতা একাকী বসে থেকেছে বাড়ি আগলে। এক বাড়ি তো তার হাতে বাড়ি ছেড়ে যাবে না বলে ছাড়িয়েই দিল কাজ থেকে। সীতা বিমলাদিকে ধরে করে গিয়ে ঢুকল অন্য বাড়িতে, তাদের তখন ছেলের বউয়ের বাচ্চা হবে—রাতদিনের থাকাখাওয়ার মেয়ের খুব দরকার।

আজকাল ফোনের ও প্রান্তে ভবানীর গলা শুনলে তার মনে হয় এ কি তার গর্ভধারিণীর কণ্ঠস্বর নাকি আসলে এই স্বর চন্দ্রার? ভবানী কি মরে গিয়েছে? ষড়যন্ত্র করে সেই খবরটা তাকে দেওয়া হচ্ছে না? না হলে তার নিজের মা তাকে একবার দেখতে চায় না?

এই এলাকার যত চেনা কাজের মেয়ে, তারই বয়েসি—সীতা জানে তাদের প্রত্যেকের জীবনে অন্তত একটা প্রেম আছে। ওই যে শুভঙ্করী বলে মেয়েটা, ও যে বাড়িতে কাজ করে ওই বাড়িতেই কাজ করে হেনা। হেনার সঙ্গে প্রেম জয়ন্তর। দু'জনকে সে কত দিন লেকে বেড়াতে দেখেছে। সে কখনও আর কারও প্রেমে পড়ল না। তার চোখ কখনও কোথাও আটকালে সে নিজেই নিজেকে দুমড়ে-মুচড়ে গুটিয়ে নেয়। নয়ন তাকে এখনও পথেঘাটে দেখতে পেলেই বিরক্ত করে। নয়ন তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছিল একসময়। সে কঠোর, সে প্রত্যাখ্যান ছাড়া কিছু জানে না। নয়ন তাকে এত বছরেও টলাতে পারেনি।

ফোন বাজছে। সীতা হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কানে তুলে ধরল রিসিভার। নাতাশা।

"কোনও খবর পেলি?"

"না দিদি!"

"জুরা কী করছে রে?"

"খেলছে।"

"আচ্ছা, আমি বেরোচ্ছি। পৌঁছে যাব তাড়াতাড়িই। ভীষণ খিদে পেয়েছে সীতা।"

"আমি আটা মেখে রেখেছি দিদি, তুমি এসো।"

"আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু যাচ্ছে। রাতে খাবে, সেই মতো রুটি বানাস।"

সে খেয়ালই করেনি ন'টা প্রায় বাজে। বসে বসে এ কথা ও কথা ভাবতে ভাবতে সময় কেটে গিয়েছে। অন্য দিন টিভি দেখে, এফ এম শোনে, দোতলার কাজের মেয়ে ঐশ্বর্যা এসে বসে কখনও কখনও, গল্প করে, জুরাকে একটু খেলায় সীতা চটপট রান্না সেরে নেয় কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে! ঐশ্বর্যা মেয়েটা ভীষণ হাসিখুশি, মজার আর তেমনি সাজগোজ। ওর বাপ-মায়ের দেওয়া নাম নাকি কেকা। সেই নামটা ওর পছন্দের নয় বলে ও বদলে ঐশ্বর্যা করে নিয়েছে। দু-তিন বছর আগে 'মোহব্বতেঁ' বলে যে সিনেমাটা এসেছিল সেটার নায়িকা ছিল ঐশ্বর্য রাই। তখনই কেকা সিদ্ধান্ত নেয় ও ঐশ্বর্যা বনে যাবে। ঐশ্বর্যার মুখে দিনরাত সিনেমা আর্টিস্টদের কথা, তারা কী খায়, কী মাখে, কার সঙ্গে কার 'চক্কর' চলছে। দোতলার লোকেরা পঞ্জাবি। ঐশ্বর্যার মুখে অনবরত হিন্দি শব্দ চলে আসে কথা বলতে গেলে। নাতাশা সীতাকে বলেছে ঐশ্বর্যার কাছ থেকে পারলে ক'টা পঞ্জাবি রান্না শিখে নিতে।

পৌনে দশটা নাগাদ বেল বাজল দরজায়। নাতাশা। পিছনে দাঁড়িয়ে ফরসা, লম্বাচওড়া এক যুবক। দিদির বয়েসিই হবে। দিদি বলে উঠল, "কী রে, ফোনটোন এসেছে? দশটা তো প্রায় বাজে।"

সে মাথা নেড়ে দরজার পাশটায় সরে গেল। জুরা তার ঘরে ছিল, মা এসেছে টের পেয়েছে, দৌড়ে এসে উঠে পড়ল কোলে। নাতাশা বুকে চেপে ধরল বাচ্চাটাকে। যুবককে বলল, "এর চোখে ঘুম নেই। দ্যাখো, দশটা বাজে এখনও কটমট করে তাকিয়ে আছে। এসো, ভিতরে এসো অভী।"

জুরা নতুন লোক দেখে অবাক হয়েছে। সীতা দেখল যুবকের মুখে মৃদু হাসি, একটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল জুরার গাল। জুরা এক মুহূর্ত কী ভাবল তারপর ঝাঁপিয়ে চলে গেল যুবকের কোলে। অপ্রস্তুত নিজেকে সামলাতে সামলাতে হেসে উঠল যুবক। দিদির মুখটা যেন আলোয় ভরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। লজ্জিত গলায় বলল, "আশ্চর্য! ও তো অচেনা কারও কাছে যায় না!"

যুবক লম্বা শ্বাস টেনে গন্ধ নিল জুরার শরীরের। তারপর বলল, "বাচ্চাদের গায়ে একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ থাকে!"

"ওকে আমায় দাও," বলল নাতাশা।

"থাক না।"

"নিয়ো আবার, আগে জুতো খোলো, বসো। সীতা ওকে একটু নে, আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে নিই। অভি, সীতারই বোনের ব্যাপারটা তোমাকে বলছিলাম। আই ডোন্ট নো হাউ টু হেল্প হার আউট?"

ইংরেজিটা শুনে শুনে এখন সীতা অনেকটাই বুঝে নিতে পারে। তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে তৈরি করে দিয়েছিল যে, সে তুলতুলিই। কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, ওঠাবসা—শেখাত খুব। কেন যে অত খারাপ ব্যবহার করল পরে?

নাতাশা যুবককে নিয়ে গেল নিজের বেডরুমের টয়লেটে। পনিরটা গরম করতে বসিয়েছিল সীতা গ্যাসে। জুরাকে নিয়ে কিচেনে ঢুকে একটু নেড়েচেড়ে গ্যাস অফ করে দিল সে। এবার জুরা দিদির কাছে থাকবে আর টেবিল সাজিয়ে খেতে দিয়ে দেবে সীতা। হলে ফিরে সে দেখল দিদি বোতল নামিয়েছে টেবিলে। এই এক মাসে খুব কম দিনই সে মদ খেতে দেখেছে দিদিকে। এক দিনই রাত দুটো নাগাদ সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরেছিল নাতাশা। ব্যস, আর কখনও ওরকম করেনি। বাড়িতে যে খায়, খুব সামান্যই খায় বলে মনে হয়। স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে, ঘোরেফেরে। পরের দিন ছুটি থাকলে রাত অবদি জেগে গান শোনে, বই পড়ে আর একটু একটু চুমুক দেয় গ্লাসে। সীতাকে একদিন বলেছিল দিদি, "একটু খাবি?"

"না বাবা!" বলে ছুটে পালিয়েছিল সীতা।

হেসেছিল নাতাশা, "অ্যাই সীতা, আরে ধ্যাৎ, মজা করছিলাম তোর সঙ্গে, পাগলি একটা!"

সে আবার গুটিগুটি ফিরে এসেছিল দিদির কাছে, "তুই ভাবলি সত্যি সত্যি খেতে বলছি?"

সে হেসেছিল। দিদি বলেছিল, "আচ্ছা বল, একটু চেখে দেখতেও ইচ্ছে করছে না? মিথ্যে বলবি না সীতা, ধরে ফেলব।"

এবার হাতে মুখ ঢেকে হেসে উঠেছিল সীতা জোরে।

"একশো বার তোর ইচ্ছে হওয়া উচিত। সব কিছুর ইচ্ছে হওয়া উচিত! যা ইচ্ছে হবে আমাকে বলবি।"

জুরাকে নিয়েই সীতা আবার ফিরে গেল কিচেনে। একটা ট্রে-তে দুটো গ্লাস নিয়ে গিয়ে রাখল কাচের টেবিলের ওপর।

"বরফ দেব দিদি?" জানতে চাইল সে।

"আমরা একটা ড্রিঙ্ক নিয়েই খেতে বসে যাব সীতা। তুই সব রেডি কর। এর মধ্যে যদি তোর বোনের ফোন আসে আমাকে দিবি।"

আর ঠিক তাই হল। দিদিরা যখন খেতে বসতে যাচ্ছে ঠিক তখনই এল ফোনটা। পুতুলের গলা শুনে হাত কেঁপে গেল তার। সে ঘুরে তাকাল দিদির দিকে। দিদি রিসিভার টেনে নিল হাত থেকে, "হ্যালো, তুমি বলো তো কোথায় আছ? হ্যালো? হ্যালো? একী! কথা বলছ না কেন? হ্যালো?"

পাশ থেকে অভীদা বলে উঠল, "ও বোধহয় তোমার গলা শুনে ঘাবড়ে গেছে, ফোনটা সীতাকে দাও!"

"পুতুল, আমি দিদি, তুই কোথায় আছিস বল? আমি তোকে নিয়ে আসব গিয়ে, তোর কোনও ভয় নেই। যে বাড়িতে আমি কাজ করি, সেই বাড়ির দিদিই ফোনে কথা বলছিল; তুই কথা বললি না কেন? কথা বল," সীতা এক নিশ্বাসে বলল।

পুতুল কী বলল কে জানে। সে বলল, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ও কোথায় আছে। হাওড়া স্টেশনেই আছে অবশ্য।"

দিদির কপালে চিন্তার ভাঁজ!

অভীদা বলল, "ওকে ফোন ছাড়তে বারণ করো, আমরা একটু ভেবে নিই। বড় ঘড়িটুড়ি ওকে বলে লাভ নেই, কোন দিকে যেতে কোন দিকে চলে যাবে... এত রাতের হাওড়া স্টেশন, খারাপ খপ্পরে পড়ে যায় যদি? নাতাশা, ও কি কোনও বুথ থেকে ফোন করছে?"

অভীদার কথায় বুথের মালিককে ডেকে আনল পুতুল ফোনে। অভীদা ভালভাবে বুঝে নিল ঠিক কোন জায়গায় বুথটা। পুতুলকে বারবার করে বলা হল ওই বুথের সামনে থেকে এক পা-ও না নড়তে। এক্ষুনি ওকে নিতে যাওয়া হচ্ছে, ও যেন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। জুরাকে নিয়ে বাড়িতে থেকে গেল দিদি। অভীদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সীতা হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে। দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময় দিদি বলল, "আর চিন্তা কী তোর? যা, গেলেই পেয়ে যাবি বোনকে।"

রাস্তাঘাট এখন অনেক ফাঁকা, প্রায় এগারোটা বাজে। অভীদার গাড়ির পিছনের আসনে গিয়ে বসল সীতা। হুহু করে ছুটে চলল গাড়ি। মাঝখানে একটা ফোন এল অভীদার, "হ্যাঁ বলো, এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে যাব। না, আমিই যাচ্ছি মেয়েটাকে নিতে। নাতাশা বাচ্চাটাকে নিয়ে থেকে গেল বাড়িতে। চিন্তা কোরো না— ওকে। ছাড়ছি।"

গাড়ি হাওড়া স্টেশনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল অভীদা। দ্রুত হাতে লক করল। সীতাকে বলল, "এসো!"

জোরে জোরে হাঁটছে দাদা। সে তাল রাখতে ছুটছে প্রায় পিছন পিছন। এত রাতেও স্টেশনে কত লোক, কত ভিড়, ঠেলাওলা, মুটেদের ছড়াছড়ি, মাইকে ট্রেন আসা আর ছেড়ে যাওয়ার খবর। এ দিক দিয়ে ও দিক দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাদা থেমে গেল এক জায়গায়। সেখানে পরপর সারি দিয়ে কতকগুলো ফোনের বুথ। দাদা তাকাল তার দিকে, "বাঁ দিক থেকে দু'নম্বর বুথ। সীতা দ্যাখো, আশেপাশেই থাকবে ও। তুমি খোঁজো।" সে এগিয়ে গেল, বেশি খুঁজতে হল না। দু'নম্বর বুথের ঠিক সামনে চাদরটাদর বিছিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে হরিনাম সংকীর্তনের একটা দল। তাদের দলে মেয়েরাও আছে। পুতুল সেই দলটার প্রায় গা ঘেঁষে বসে আছে। ঠিক উলটো দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের মণি ঘুরিয়ে ভিড়ের ভিতর তোলপাড় করে খুঁজছে ও ওর দিদিকে, আজ রাতে যে ওর উদ্ধারকর্ত্রী! সীতার একটা বদগুণ হল কথায় কথায় তার চোখের কোল জলে ভেসে যায়। কিন্তু আজ এমন একটা সময়ে পুতুলকে দেখেও তার চোখে জল এল না। সে পিছন থেকে ডাকল পুতুলকে, "আয় পুতুল!"

পুতুল তাকাল, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো উঠে এল, শুকনো চোখ, কঠোর মুখ, মাথা ভরা উসকোখুসকো চুলের খোঁপাও উঠে দাঁড়াতে খসে পড়ল পিঠের ওপর। ওড়না ঠিক করল পুতুল; বলল, "চল।" সীতা ভাবল হাতটা ধরে বোনের, কিন্তু কেন কে জানে পারল না। অভীদা এগিয়ে চলল ভিড় ঠেলে, পিছন পিছন তারা দু'জন।

ফেরার পথে গাড়িতে একটাও কথা হল না তার সঙ্গে পুতুলের। পুতুল চুপচাপ তাকিয়ে রইল জানলা দিয়ে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিয়ে দিদি একবার দেখল পুতুলকে ভাল করে। বলল, "যা, ওকে ঘরে নিয়ে যা।" হল পার হয়ে যেতে যেতে সীতা শুনল নাতাশা বলছে, "তুমি একটু বসে যাও অভী, তোমার তো খাওয়াও হল না!"

শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল এই ভেবে যদি দিদির দরকার পড়ে তাকে। দাদা বলল, "না নাতাশা, আমি আর ঢুকব না, পিউ বারবার ফোন করছে। আমি বলেছি ওদের পৌঁছে দিয়েই বেরিয়ে আসব।"

“বেশ, তা হলে তোমাকে আর আটকাব না,” দিদির বলাটা যেন অতলে তলিয়ে গেল, “আমি ভাবিনি এত সহজে মিটে যাবে ব্যাপারটা।”

“মিটেছে কি মেটেনি তা তুমি বুঝতে পারবে না এখনই।”

“আপাতত... তারপর দেখা যাক। আমি ওকে এখানে রাখব না, রিস্‌ক হয়ে যাবে। সরিয়ে দেব দু’-এক দিনের মধ্যেই।”

“সেটাই উচিত হবে নাতাশা।”

“তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।”

দাদা কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর আস্তে করে একটা হাত রাখল দিদির মাথার ওপর। চলে গেল।

দিদি দাঁড়িয়েই রইল দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মতো একটা কথা চমকে উঠল সীতার মনে—এই যুবক দিদিকে ভালবাসে। খুব ভালবাসে।

পুতুলকে নিজের জামাকাপড় দিয়ে বাথরুমে পাঠিয়ে সীতা হলে এসে দেখল দিদি আবার একটা ড্রিঙ্ক বানাচ্ছে। ধীর স্বরে সে জানতে চাইল দিদি খেয়েছে কি না। সে কথার উত্তর না দিয়ে খুব অন্যমনস্ক গলায় দিদি বলল, “সীতা, আজ ওর কথা বলার মতো অবস্থা নেই। কাল আমি একটু বেলায় বেরোব। অতএব কথাবার্তা যা হবে সকালেই হবে, আমি আমার ঘরে চলে যাচ্ছি। তুই দ্যাখ ও যদি একটু খায়টায়, পারলে তুই-ও খেয়ে নে একটু।”

“জুরার জামাটামাগুলো বদলে একটু পাউডার লাগিয়ে দিই দিদি?” বলল সে। দিদির ঘরে ঘুমোচ্ছে জুরা।

“আমি করে নেব।”

গ্লাস আর মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল দিদি। হলের বড় বড় আলোগুলো নিবিয়ে দিল সীতা। পুতুল বেরিয়েছে বাথরুম থেকে। হাতে ধরা পরে আসা সালোয়ার-কামিজ। চুল দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। সিঁথি-ভরতি সিঁদুর, হাতে শাঁখা-পলা, কাচের চুড়ি। কে বলবে এই সেই পুতুল ছ’বছর আগে দেখার স্মৃতি অনুযায়ী? এখন ভরন্ত শরীর, উপচানো যৌবন—বিধ্বস্ত চোখমুখ সত্ত্বেও চোখে পড়তে বাধ্য। সীতার মনে হল এ যেন আর এক ভবানী। সীতার শরীরে এত ওলটপালট হয়নি। আজও সে মোটামুটি ক্ষীণকায়া সেই সতেরো বছরের মতোই প্রায়, মাঝখানে সিঁথি করে একটা বিনুনি বাঁধে আগেরই মতো।

হঠাৎ চেতনার তন্ত্রীতে ঘা পড়ল যেন—এ সব সিঁদুর, শাঁখা তো খুলে ফেলতে হবে পুতুলকে। সেই যে জ্যাঠামশাই মারা যাওয়ার পর সুপ্রভা জেঠিমা নিজেই নিজেদের পুকুরের ঘাটে নেমে গেল, সব ধুয়েমুছে, ভেঙে ফেলে উঠে এল একদম শ্রীহীন সাদা—সীতার চোখে ভেসে উঠল কবেকার সেই দৃশ্য। পুতুলকে কি এই কথা মনে করিয়ে দিতে হবে তাকে? অসম্ভব! সে কিছুই বলল না সে সব, খাওয়ার কথাও জিজ্ঞেস করল না, ওর হাত থেকে জামাকাপড় নিয়ে ফেলে দিল বালতিতে। তারপর কাঁধ স্পর্শ করল বোনের। পুতুল চোখ তুলে তাকাল তার দিকে, “ও ভাত খেতে বসেছিল তখন, ওরা ডেকে নিয়ে গেল। সমর, বিনয়, নান্তু।”

সে মুখ চেপে ধরল পুতুলের, “আমি শুনতে চাই না।”

পুতুল হাত সরিয়ে দিল তার, "আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল ওদের চোখ দেখে। একটা চিৎকার করে বড় ভাশুরকে ডেকে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম খিড়কির দরজা দিয়ে। দেখলাম সমররা ধান খেতের ভেতর দিয়ে দৌড়োচ্ছে আর আলের ওপর পড়ে ছটফট করছে ও। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি পেটটা পুরো ফাঁক! চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল যেন। দিদি, ও আমাকে ডেকেছিল হাত তুলে, আমি কাছে যেতে পারিনি।" পুতুল মাটিতে বসে পড়ল ধপ করে, "ওই তো আমাকে বলল, 'পালাও, পুতুল পালাও!'"

তারপর আর কিছুই বলল না পুতুল, সে হাত ধরে টানতে উঠে এল তার সঙ্গে। সে শুইয়ে দিল বোনকে। টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল পুতুল, আলো নিবিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পর সীতা বুঝল পুতুলের চোখ খোলা, জ্বলজ্বল করছে মণি, তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে বাইরে। শিরীষ গাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে সেখানে কালো আকাশ দেখা যাচ্ছে। রাস্তাকে নিষ্ঠুরভাবে পিষে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে রাতের লরিগুলো। প্রতিদিন রাত একটা নাগাদ কালো হেলমেটে মুখ মাথা ঢেকে দুরন্ত গতিতে ছুটে যায় এক বাইক আরোহী। এক সেকেন্ড সময় মাত্র লাগে তার এই পথটা পার হয়ে যেতে। সেই এক সেকেন্ড সময় সীতার নিজস্ব সময়, এক অজ্ঞাতকুলশীল চলে গেলে তার দিন শেষ হয়ে যায়—তখন শুতে যায় বিছানায়, আজ কখন সে চলে গিয়েছে সীতা টের পায়নি।

সীতা শুয়ে পড়ল ঠিকই কিন্তু ঘুমোতে পারল না। কারণ পুতুল ঘুমোল না এক ফোঁটা। শুয়ে আছে, শুয়ে আছে, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসছে— কতবার এরকম করল ও। সীতা ওকে জলের বোতল, এগিয়ে ধরল। একবার 'বমি করব' বলে পুতুল ছুটে গেল বাথরুমে, বমি হল না, উবু হয়ে বসে রইল কতক্ষণ।

এই করতে করতে ভোরের আলো ফুটে গেল বাইরে। উদ্বেগ এবং শোক মানুষকে ঘুমোতে দেয় না, রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখে, কিন্তু ভোরের দিকে তদ্‌সত্ত্বেও চোখে আপনা থেকে নেমে আসে সুপ্তি, আপনাআপনিই ঢলে পড়ে মানুষ ঘুমে। পুতুলের ক্ষেত্রে তা ঘটল না—সীতা দেখল তখনো পুতুলের শরীরটা শক্ত, কাঠ কাঠ, চোখ ধক ধক করছে। ভেবে যাচ্ছে ও, ভেবে যাচ্ছে। ভাবনার শেষ নেই যেন ওর, ভীষণ এক সংঘর্ষ চলছে ওর মনের জগতে। এতখানি ধকল, এত বড় একটা ঝড় মাথায় নিয়ে ধেয়ে এসেও ও নিস্তেজ হতে পারেনি, ফুরিয়ে যায়নি।

সীতা বিছানা থেকে নামতেই পুতুল উঠে বসল খাটের ওপর। বলল, "খুব বড় একটা ভুল হয়ে গেছে দিদি।"

সে বলল, "কী?"

"পুলকের বাইকের কেরিয়ারে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা ছিল। কালই পেয়েছিল ও। ইটভাটাগুলোর তোলার টাকা, আমার সুটকেসেও বেশ কয়েক হাজার টাকা ছিল। ভুল হয়ে গেল রে, তখন মনেও পড়েনি! যদি গৌরাঙ্গকেও বলে দিতাম—বড়দুয়ারে গিয়ে সবার আড়ালে ও ঠিক বের করে আনত। আমার হার, আংটি, দুল সে সবও সুটকেসের ভিতর পড়ে আছে।"

বড়দুয়ার পুলকদের গ্রাম, বিধুপুর থেকে চারটে গ্রাম ছাড়িয়ে যেতে হয়। সে অবাক হয়ে গেল পুতুলের কথা শুনে, "তুই টাকার কথা ভাবছিস পুতুল?"

নিষ্পলকে দেখতে লাগল পুতুল তাকে, "তা ছাড়া এখন আর কী ভাবব?"

দিদি উঠল অনেক বেলায়। তখন প্রায় দশটা বাজে। হাউসকোট জড়িয়ে হলের সোফায় এসে বসল। কাচের টেবিলের ওপর রাখা খবরের কাগজ খুলে ধরল চোখের সামনে। আবার ভাঁজ করে রেখে দিল। কিচেন থেকেই লক্ষ করল সীতা দিদির চোখেমুখে একটা অশান্তির ছায়া। কেন? পুতুলকে নিয়ে দুর্ভাবনা করছে কি নাতাশা? তাই হবে নিশ্চয়ই!

"সীতা!" ডাকল দিদি।

চায়ের কাপটা ট্রে-তে বসিয়ে তাড়াতাড়ি দিদির সামনে এসে দাঁড়াল সে, "অভীর বউ খুব রাগারাগি করেছে কাল এত রাত হওয়ার জন্যে। সত্যি, পরে আমার মনে হল তুই-আমিও তো একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যেতে পারতাম পুতুলকে নিতে, ওকে না আটকালেই ভাল হত। মাঝে মাঝে আমার মাথা একদম কাজ করে না। যাই হোক, তোর বোন উঠেছে? কী করছে? ওকে ডাক, কথা বলি একটু।"

অভিদার ব্যাপারেই তবে মনমেজাজ বিগড়ে গিয়েছে দিদির। বিপদে পড়ে মানুষ মানুষের সাহায্য চায়—এতে ওই দাদার বউয়ের এত রাগ করার কী ছিল?

"পুতুল তো রাতে একটা বারও দু'চোখের পাতা এক করেনি," বলল সে।

"হুঁ, বুঝতে পারছি," চায়ে চুমুক দিল দিদি, "দ্যাখ সীতা, পুতুলের কী দোষ বল? ও এখন কত অসহায়, এই মানসিক অবস্থায় তোর কাছে থাকলে ও একটু কথা বলতে পারবে, কেঁদেকেটে নিজেকে হালকা করতে পারবে। কটা দিন ও এখানেই থাকুক, শোকটা সয়ে যাক, তারপর তুই তোর বিমলাদিকে বলিস ওকে কোনও বাড়িতে কাজে ঢুকিয়ে দিতে। কলকাতায় লুকিয়ে থাকতে হলে পুতুলকে সেটাই করতে হবে। এই অঞ্চলে কাজের লোকের ভীষণ ডিমান্ড। একটা ভাল বাড়িতে ঢুকে গেলে নিরাপদে থাকবে, কাজ করবে, খাওয়াপরার চিন্তা থাকবে না। একটু দূরে হলেও ক্ষতি নেই সীতা, বরং তোর কাছাকাছি না থাকাই ভাল। এটা একটা সহজ হিসেব, পুতুল গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে যখন তখন ও কলকাতায় তোর কাছেই আসবে, আর যাবেটা কোথায়? আর তোর ঠিকানা খুঁজে বের করা এমন কিছু কঠিন নয়! যদি ওদের আদৌ পুতুলকে নিয়ে মাথাব্যথা থাকে ওরা সেটা করবে। তুই পুতুলকে বলিস, ও যেন ব্যালকনিতে কক্ষনও না দাঁড়ায় আর বাইরেও না বেরোয় একদম!"

মোবাইলটা বাজছে দিদির বেডরুমে। সীতা ছুটে গিয়ে এনে দিল ফোন। দিদি ফোন ধরল, ক্ষোভ ঝরে পড়ল দিদির গলা থেকে যেন, "অভি, তুমি পিউকে এইটুকু বোঝাতে পারলে না যে আমি বিপদে পড়েই তোমাকে ডেকেছিলাম।" নাতাশা উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে, নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল, "এখন আমার ভীষণ ভীষণ আফশোস হচ্ছে তোমায় কেন ডাকলাম এই ভেবে, আমার অ্যাবসোলিউটলি উচিত হয়নি অভি, তাও এত সামান্য কারণে!" দড়াম শব্দে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল দিদি। জুরা ছুটে গেল দরজা লক্ষ করে। সে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল বাচ্চাটাকে।

পুতুল শুয়ে আছে পাশ ফিরে। সীতা বলল, "চা খাবি না পুতুল? উঠবি না?"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল পুতুল, "হ্যাঁ, চা দে।"

"দিদি বলল, তুই ক'টা দিন এখানেই থাক, তারপর আমি তোর কাজের জন্য একে ওকে বলব।"

"কী কাজ?"

"এই আমার মতো কাজ।"

এই প্রথম চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়তে দেখল সীতা বোনের, "ঝিগিরি? তোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও?"।

সে কঠোর চোখে তাকাল পুতুলের দিকে, "অন্য কাজ কী করবি তুই? পড়াশুনো শিখেছিস?"

পুতুল বলল, "পুলক আমাকে কত যত্নে রেখেছিল দিদি, তুই জানিস না। এই গেল মাসে কালার টিভি এনে দিল একটা। প্রায় দিনই সন্ধের সময় বাইকে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে যেত এ দিক ও দিক। আমি সেলাই শিখছিলাম। সেই গোঁসাইনগরের আইসক্রিম কারখানাটা—'মুক্তি' আইসক্রিম—তোর মনে আছে, ওটা তো পুলক কিনে নেবে কথা হয়েছিল। কারখানাটা আমিই চালাব, বলেছিল পুলক। এখন আমাকে অন্যের বাড়ি কাজ করে খেতে হবে?"

সীতা মনে করত সে নিজে খুব জেদি, একগুঁয়ে এবং একই সঙ্গে হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল একটা মেয়ে। এই ছ'বছরে তার নিজের সম্পর্কে এই সব ভুল ধারণা ভেঙে গিয়েছে। সে দেখে নিয়েছে এখন আর তার মধ্যে কোনও জেদ কাজ করে না, খুব সহজেই নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে সে পিছিয়ে যেতে পারে কয়েক পা। যে দোষ সে করেনি সেই দোষও কতবার মাথা পেতে মেনে নিয়েছে, 'বুঝতে পারিনি, ভুল হয়ে গেছে' বলা রপ্ত করেছে। পুতুলের কথা শুনতে শুনতে তার মনে হল পুতুল তার বোন, কিন্তু পুতুলের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। এই মুহূর্তে পুতুল যত না স্বামী হারানোর শোকে মুহ্যমান, তার থেকে অনেক বেশি আচ্ছন্ন নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায়। যে সব নিরাপত্তা সুখ ও পেতে পেতে উদ্বাস্তু হল, তারই প্রতি ওর যাবতীয় আক্ষেপ।

সীতা বলল, "পুলক তোকে খুব ভালবাসত?"

জুরা পুতুলকে দেখে প্রথমে যথেষ্ট অবাক হয়েছিল, এখন বিছানায় উঠে বসেছে নিজের ছবির বইটই নিয়ে। পুতুল বলল, "পুলক আমার জন্যে সব করতে পারত দিদি।"

"তোকে শাঁখা-পলা সব খুলে ফেলতে হবে পুতুল। পুলক তো আর নেই!"

চমকে উঠল পুতুল অর কথা শুনে, হাঁ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে, ভুরু কুঁচকে উঠল আস্তে আস্তে, "এতক্ষণে কি ওকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে? থানা, পুলিশ হচ্ছে নিশ্চয়ই! গ্রাম তোলপাড় হচ্ছে? দিদি, মাকে ফোন করবি একটা? একবার টিভি খুলে দেখবি, কিছু বলে কিনা?"

সে মাথা নাড়ল, "মাকে আমি ফোন করব না পুতুল, যখন পারবে মা-ই ফোন করবে।"

"পুলিশ কি আমার খোঁজ করবে না দিদি?" বলতে বলতে পুতুল হাতথেকে সব গয়না খুলে খুলে ফেলতে লাগল, তারপর উঠে গেল বাথরুমে। বেশ একটু সময় নিয়ে বেরোল ও। সীতা দেখল সিঁদুর ধুয়ে ফেলেছে সম্পূর্ণ। কেঁদেছে।

থেকে গেল পুতুল এ বাড়িতে। সাত-আটদিন কেটে যাওয়ার পর ফোন এল মায়ের, পুলিশ বিধুপুরও ঘুরে গিয়েছে। এস আই লোকটা পুতুলের খোঁজখবর নিয়ে আড়ালে ডেকে মাকে বলে গিয়েছে পুতুলের এখন গ্রামে ফিরে আসার কোনও দরকার নেই। ময়নাতদন্তের পর পুলকের মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বের করেছিল পার্টি। সেই মিছিলে গৌরাঙ্গ-সমর, বিনয়, নান্তু সবাইকে স্লোগান দিতে দিতে হাঁটতে দেখেছে। পুলকের মৃত্যুতে এমনকী বিধুপুরের স্টেশনবাজারও আধবেলা বন্ধ রাখা হয়েছিল। এখন আবার সব আগের মতোই স্বাভাবিক। একটা কাজ পেয়েছে গৌরাঙ্গ ধানবাদে। মাসটা পড়লে চলে যাবে। যদি পারে একবার দেখা করবে সীতা আর পুতুলের সঙ্গে তার আগে। চন্দ্রার শরীর খুব খারাপ বেশ কিছু দিন, সেই কারণেই হয়তো এত যে কাণ্ড ঘটে

গেল—চন্দ্রা একেবারেই নীরব ছিল এই ব্যাপারে। পুলক খুব শাশুড়ি অন্ত প্রাণ ছিল, এলেই হাতে করে এটা সেটা আনা; এই ভবানীর ঠাকুরের জন্যে একটা সিংহাসন কিনে আনল, কি একটা টেবিলফ্যান হাওয়া খাওয়ার জন্যে এনে দিল। ভবানীর পুতুলের বিয়েটায় আপত্তি ছিল প্রথমে। আজ পুলকের প্রতি মায়ায় ভবানী স্থির থাকতে পারছে না।

সে দিন শনিবার, দিদি দেরি করে বেরোবে, ফ্ল্যাটবাড়ির কেয়ারটেকার রক্ষিতবাবু এসে বলে গিয়েছিলেন বাড়ির মেন্টেন্যান্সের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে একটা মিটিং ডাকা হয়েছে ছ'তলায় গোয়েঙ্কাদের ফ্ল্যাটে। এগারোটা নাগাদ বসবে মিটিং। দিদি রেডি হচ্ছিল যাওয়ার জন্যে। সে সেই ফাঁকে বাজার, রান্না এ সব সংক্রান্ত ছুটছাট কথাবার্তা সেরে নিচ্ছিল দিদির সঙ্গে। এমন সময় পুতুল এসে বলল, "দিদি, এই বাথরুমের নর্দমাটা আটকে গেছে, জল যাচ্ছে না, সারা বাথরুম জল থইথই করছে! কী হবে?" শুনে নাতাশা বলল, "পুতুল, তুই বেসমেন্টের বাথরুমে চলে যা। এখনকার মতো সেরে আয়। তারপর সুইপার এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। চুল ফেলেছিস বোধহয় বাথরুমে, তাই নর্দমা আটকে গেছে!"

জামাকাপড় নিয়ে নীচে চলে গেল পুতুল। সে কাজে ব্যস্ত, দিদি ফোনে কথা বলছে, হঠাৎ বেল বাজল। সে ভাবল হয় সুইপার নয় পুতুল। দরজা খুলে দেখে বেঁটে দারোয়ানটা দাঁড়িয়ে, 'সীতা, তোমার বোন নীচে কী কাণ্ড করছে, মারপিট করছে।'

মারপিট করছে পুতুল? কার সঙ্গে? কেন? সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল সে। বুঝতে পারল জুরাকে কোলে নিয়ে দিদিও নেমে আসছে পিছনে পিছনে। একতলাটায় লিফটের সামনে, করিডরে, বেসমেন্টের মুখটায় লোকে লোকারণ্য। বাড়ির যত চাকরবাকর, ড্রাইভার সব ভিড় করে আছে। নীচ থেকে ভেসে আসছে প্রবল চেঁচামেচি। পুতুল কাঁদছে চিৎকার করে। পুতুলের গায়ে জড়ানো শুধু কামিজটা। সে পুতুলের হাত ধরে টানল, "কী হয়েছে পুতুল?"

কথা বলতে পারছে না পুতুল, হাউমাউ করে কাঁদছে। সে তাকাতেই দেখল সেই কালো ড্রাইভারটা বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে, ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। পিছনে এসে দাঁড়াল দিদি, "সীতা, তোর ওড়না দিয়ে ঢেকে দে ওকে আগে।" সে দ্রুত ওড়না খুলে ঢেকে দিতে চেষ্টা করল বোনের শরীর।

রাগে ফেটে পড়ল দিদি এবার, "আমি জানতে চাই পুতুলের কী হয়েছে? আমাকে সত্যি কথা বলো, নইলে আমি এক্ষুনি পুলিশ ডাকব। পরিমল? বলো, কী হয়েছে!"

বেঁটে দারোয়ান পরিমলকে বলতে হল না, পুতুলই বলল সব কাঁদতে কাঁদতে। ও বাথরুমে ঢুকে স্নান করছিল, ছিটকিনিটা বন্ধ হচ্ছিল না ভাল করে বলে বালতি দিয়ে চেপে রেখেছিল দরজাটা। হঠাৎ শিবনাথ দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ে ভিতরে, তারপর পুতুলের মুখ চেপে ধরে জোর জবরদস্তি অত্যাচার করার চেষ্টা করে। পুতুলের হাতের কাছে ছিল স্টিলের ভারী মগটা, পুতুল সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করে শিবনাথের মাথায়। মাথা ফেটে যায়। পুতুল চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে। ওর এই অবস্থা দেখেও বাকি দারোয়ান বা চাকরবাকর কাছেপিঠে যে ছিল কেউ সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেনি। সব মজা দেখছিল।

শুনতে-শুনতে দিদি এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় কাল পরিমলের গালে, "তুমি বললে পুতুল মারপিট করছে? তোমাকেও আমি পুলিশে দেব পরিমল।"

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ঐশ্বর্যা, "দিদি, শিবনাথ একা নয়, এখানে অনেকেরই স্বভাব মন্দ। আবরু রক্ষা করে চলাই মুশকিল। ছিটকিনি সারালেও ইচ্ছে করে ভেঙে দেয়। শিবনাথ গোয়েঙ্কাদের ড্রাইভার, তুমি গিয়ে নালিশ করো। আমরা কিছু বললেই এরা বলবে, আমাদের নাকি কোনও মান ইজ্জত নেই...আমরা তো কাজের লোক না? ঝি-চাকর!"

হাজার কথা, হাজার গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে ওপরে তুলে আনা হল পুতুলকে। একতলার লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফ্ল্যাটওনার কয়েকজন। সবই শুনেছেন তাঁরা। পাঁচতলার মি: চক্রবর্তী অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, "ছিঃ, ছিঃ নাতাশা, এটা ভদ্রলোকেদের বাড়ি। এই সব কথা কি চাপা থাকবে? লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।" মিসেস চক্রবর্তী তো রেগে আগুন, "শিবনাথকে এক্ষুনি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হোক। আমরা গোয়েঙ্কাদের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।"

বিকেল হতে হতে দেখা গেল পুতুলের সারা শরীরে আঁচড়কামড়, কালশিটের দাগ। মাথা ঠুকে গিয়েছিল দেওয়ালে, ফুলে আছে কপালটা। অভিদা এল সন্ধে নামার পর, দিদি আজ বেরোতে পারেনি বাড়ি থেকে। ভীষণ একটা মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছে সমানে। অভীদাকে দেখামাত্র ভেঙে পড়ল দিদি, "পুতুলকে আমি এই প্রোটেকশন দিলাম অভি?"

"তোমার পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল নাতাশা," বলল অভীদা।

"আরে, শোনো না। সকলে মিলে ছুটে গেল গোয়েঙ্কাদের ফ্ল্যাটে— এক্ষুনি ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হবে শিবনাথকে। আমার যাওয়ার অবস্থা ছিল না। ডক্টরকে কল দিয়েছিলাম পুতুলের জন্যে। ঘণ্টাখানেক বাদে চক্রবর্তী আঙ্কল নেমে এসে বললেন, 'গোয়েঙ্কাকে হ্যান্ড্ল করা আমাদের কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ও ধুরন্ধর, পাজি, নইলে অত টাকা ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিল, রেড হয়ে গেল বাড়িতে অথচ ওর টিকি ছুঁতে পারল কেউ? শিবনাথকে ও ছাড়বে না। শিবনাথ ওর সব কাজকর্মের হদিশ জানে। উলটে গোয়েঙ্কা আমাকেই শাসিয়ে দিল, ও আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে।' চক্রবর্তী আঙ্কল এই বলে চলে গেলেন আর আমার পাশের ফ্ল্যাটের বনশালের বউ এসে আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেল, 'ওদের আর কী দোষ দেবে নাতাশা? ফ্যামিলি ছেড়ে, বউ-বাচ্চা ছেড়ে দেশ থেকে এত দূরে পড়ে থাকে, শরীর তো ওদেরও আছে। ভুল করে ফেলেছে, শাস্তিও তো পেয়েছে নাকি? মাথা তো ফাটিয়ে দিয়েছে তোমার মেয়ে? ব্যস, বরাবর হয়ে গেল কিনা? ' "

দিদি উঠে চলে এল সীতার ঘরে, সেখানে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে পুতুল। দিদি খাটের একপাশে বসল, পুতুলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, পুতুল হাত সরিয়ে তাকাল দিদির দিকে। ঠোঁটের ধারটা ফেটে গিয়েছে বেচারার। ঠোঁটটা ফুলে উঠেছে অনেকখানি। সারা মুখে ক্ষতচিহ্ন। শিবনাথের হাতে একটা ফাঁক করা স্টিলের বালা ছিল। টানাহ্যাঁচড়ার সময় সবচেয়ে ক্ষতি করে গিয়েছে সেটাই।

রাতে সব কাজ সেরে যখন সীতা শুতে এল তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছ পুতুল। ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে ওকে খেতে। সে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে হল কিছুক্ষণ। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে হলের সংলগ্ন ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। রাতের মোটরসাইকেল এখনও যায়নি। ঘুম পায়নি সীতার। জুরার আজ একটু পেটটা ছেড়েছে। দিদি শুতে গিয়েছে ওকে নিয়ে অনেকক্ষণ। দিদির মনটা কত ভাল! কতই বা হবে দিদির বয়েস এখন? তিরিশ! এই ক'দিনে আরও একটু জেনেছে সীতা দিদির সম্পর্কে। পুতুলকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাকে আর পুতুলকে নিজের জীবনের গল্প অনেকটাই শুনিয়েছে নাতাশা।

আজ নাতাশা জুরাকে নিয়ে একা। দিদির ঘরে যে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার হাসিমুখ ছবি রাখা—তারা দিদির বাবা, মা। তাদের কোলে ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়েটা দিদি। ঠিক জুরারই সাদাকালো ছবি যেন। এই যে ফ্ল্যাটটা, ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়ার সময় যৌথ পরিবার থেকে বের হয়ে এসে দিদির বাবা এই ফ্ল্যাটটা কিনেছিল। দিদি ছিল বাবা-মায়ের ভীষণ আদরের। একমাত্র মেয়ে। মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে দিদি যা চাইত হাজির করত দিদির বাবা। সেই বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। দিদি তখন কলেজে উঠেছে সবে। হঠাৎ অভিভাবকহীন হয়ে যাওয়া, হঠাৎ পাওয়া স্বাধীনতা, অল্প বয়েস, পুরুষদের সান্নিধ্য—এই সব উলটোপালটা হাওয়া দিদির জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল। সেই সময়ই দিদির সঙ্গে অভীদার পরিচয়।

অভীদা আর দিদি দু'জনেই দু'জনকে ভালবাসত। অভীদা দিদির থেকে বয়েসে পাঁচ-সাত বছরের বড়। অভীদা চেয়েছিল দিদিকে বিয়ে করতে। কিন্তু দিদির তখন বিয়েটিয়েতে বিশ্বাস ছিল না। স্বাধীনতা ভোগ করতে চেয়েছিল দিদি, জীবনটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে চেয়েছিল। প্রথম চাকরি নিয়ে দিদি চলে গেল ব্যাঙ্গালোর। সেখানেই আলাপ জুরার বাবার সঙ্গে।

বিমলাদি কানাঘুষো যা শুনেছিল তা ঠিকই। দিদির সঙ্গে জুরার বাবার কখনও বিয়ে হয়নি। দু'জনে একসঙ্গে থেকেছে দু'বছর। যখন দু'জনের মনে হল সম্পর্কটা টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তখনই জুরা পেটে আসে দিদির।

সীতা শুনতে পাচ্ছে দিদির কণ্ঠস্বর, "অতুল ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের একটা জলজ্যান্ত, প্রতিদিন বেড়ে উঠবে—এরকম চিহ্ন রাখতে চায়নি। ঠিকই ছিল ওর যুক্তি। কিন্তু ওই, আমার মন মতির কোনও স্থিরতা নেই। অতুল তখন ব্যাঙ্গালোরের পাট গুটিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম, 'তুমি যাও, আমি অ্যাবরশন করিয়ে নেব।' কিন্তু আমি করালাম না," কাঁধ ঝাঁকিয়ে, চুল ঝাঁকিয়ে হেসেছিল দিদি, "আমি চাকরি করতে করতেই জুরাকে জন্ম দিলাম। একা একা যেতাম আমি ডাক্তারের কাছে। সব প্রায় একাই করলাম। অতুল জানতই না। একমাত্র জানত অভী। তার ঠিক আগে আগেই বিয়ে করে নিয়েছিল ও পিউকে। পিউ আমার আর অভীর ব্যাপারটা জানত। ও আমাকে একদম সহ্য করতে পারত না। এখন তো আরওই পারে না। বাচ্চাটা জন্মাল, অতুলকে জানালাম। অতুল জুরাকে দেখতেও এল না। সেখানেও আমি ওর দোষ দেখি না। আমি চেয়েছিলাম, আমি যা করেছি আমার দায়িত্বে করেছি। যেমন পুতুল, তুই পুলক খুনি, জেল ফেরত আসামি, গুন্ডা, তোলাবাজ জেনেও ওকে বিয়ে করেছিলি? সেরকম।

"তারপর জুরার এক বছর বয়েস হল। আমি বিদেশ যাওয়ার অফার পেলাম। ভাবলাম কলকাতায় ফিরি, এখানকার সম্পত্তিটম্পত্তি সব বিক্রি করে পুরোপুরি বিদেশ চলে যাই। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ফিরলাম কলকাতায়। এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। যখন ইচ্ছে হবে চলে যাব। হয়তো যাবই না—এখানেই থাকব। এই দ্যাখ না—এক বছর কলকাতায় আছি, অভীর সঙ্গে একবারও যোগাযোগ করিনি। সে দিন পুতুলের ব্যাপারটায় হঠাৎ মনে হল কাউকে বলি কথাটা, একটা পরামর্শ নিই, ফট করে অভীকে ফোন করে ফেললাম! আমি এরকমই, যেটা মনে হয় করে ফেলি। আর অভীও দ্যাখ—যেন অপেক্ষাই করেছিল আমার ফোনটা আসবে বলে। অথচ অভীকে আমি কত দুঃখ দিয়েছি একসময়! কিন্তু ওর কোনও অভিযোগ নেই সে সব নিয়ে!"

পুতুল জানতে চেয়েছিল, "জুরার বাবার জন্যে তোমার মনে কষ্ট হয় না?"

ঠোঁট কামড়েছিল নাতাশা, "জুরার যদি ওর বাবার জন্যে কখনও কষ্ট হয়, তখন আমার কষ্ট হবে পুতুল। এখন আমার কোনও কষ্ট নেই।"

দূর থেকেই সীতা টের পেল মোটরবাইকের শব্দ, দ্রুতগতিতে কাছে এগিয়ে আসছে শব্দটা। দু'দিন আগেই সে খবরের কাগজে পড়েছে রাতের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে যেতে গিয়ে এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। সে নিশ্চিত একদিন এই ছেলেটিও এইভাবে মারা যাবে। কোনও দিনও গতি সামান্য কম করে না ছেলেটা। আর দুর্ঘটনা একদিনই ঘটে!

একটা আতপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। নাতাশা যদি এখান থেকে চলে যায় তা হলে আবার কাজ খুঁজে নিতে হবে তাকেও। সে ঠিক করল এবার সে এই এলাকাটা ছেড়ে দেবে। অন্য জায়গায় চলে যাবে কাজ নিয়ে। এমনকী কলকাতার বাইরে দিল্লি, বম্বে যেতেও তার আপত্তি নেই। একসময় সে বিধুপুরের সঙ্গে দূরত্ব চেয়েছিল। দূরত্বের সঙ্গেই দূরত্ব রচিত হয়ে গিয়েছে এখন। এই অঞ্চলটার আর তার ভাল লাগছে না; আর কোন জায়গাটা যে ঠিক দূর তাও সে জানে না।

প্রথম সেই যে সীতা কাজ করতে এসেছিল উলটো দিকের পাড়ার তুলতুলির বাড়িতে বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে, তুলতুলিকে কিন্তু সে বুঝতে পারেনি। প্রথম প্রথম বেশ স্নেহ বর্ষণ করত তুলতুলি তার ওপর। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই সে দেখল তুলতুলির মন কত ছোট। একদিন তুলতুলি সকাল সকাল হলুদ তাঁত ভেঙে পরেছে, বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন। হঠাৎ তার মনে পড়ল বাড়িতে বাজার বলতে কিছুই নেই, এমনকী সকালের জলখাবারের পাউরুটিটা পর্যন্ত নেই। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল তুলতুলিকে, 'দিদি, বাজারটাজার কিছুই নেই, পাউরুটিও নেই। তুমি টাকা দিয়ে যাও, আমি সব গুছিয়ে এনে নেব।' ততদিনে লেক মার্কেট তার সড়গড় হয়ে গিয়েছে বেশ।

তুলতুলি চুল আঁচড়াচ্ছিল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখটা কেমন বেঁকিয়ে বলে উঠল, 'কেন? সকালে মাখন পাউরুটি ছাড়া মুখে কিছু রোচে না সীতা? ছোটবেলার অভ্যেস বুঝি?'

আবার আয়নার দিকে ঘুরে গেল তুলতুলি। সে তখন স্তম্ভিত, এই সুরে যে কথা বলতে পারে তুলতুলির মতো স্নিগ্ধ, সুন্দর মেয়ে, তা তখন তার ধারণার বাইরে। তুলতুলি বলেছিল, "স্বভাব নষ্ট করে ফেলিস না সীতা—যে দিন যেরকম থাকবে, সে দিন সেরকম খাবি। মুড়িফুড়ি আছে তো, তাই খা। কাল ফিরব, কাল দেখব বাজারটাজার!"

ভীষণ অভিমান হয়েছিল সীতার তুলতুলির ওপর। পাউরুটিতে মাখন মাখিয়ে খাওয়া ছেড়ে দিল সে। মুড়িটুড়িই খেত সকালে, না থাকলে খেতই না—বেলায় সব কাজ সেরে ভাত খেতে বসত। যে দিন তুলতুলির সেই প্রেমিকের বিয়ে, সেই দিন পাগলের মতো কান্নাকাটি করেছিল তুলতুলি। আর সে দিনই তার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল দামি কাচের বাসন। ছুটে এসে একটা চড় কষাল তুলতুলি তাকে। সে কিছু মনে করেনি—ভেবেছিল তুলতুলির মাথার ঠিক নেই, ঠিক থাকে না যে, এ কথা তো সীতা জানত।

তুলতুলির বাড়ি কাজ করার প্রায় চার মাস পরে প্রথম ফোন এসেছিল ভবানীর। ভবানী খবরাখবর নিয়েছিল তার। অঞ্জনদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বউয়ের সঙ্গে জেঠিমার মোটেই বনিবনা হয়নি, সুমিত্রা প্রায়ই বাপেরবাড়ি গিয়ে থাকে। তার জিনিসপত্র সবই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল জেঠিমা, গানের খাতাটাও।

ভবানী বলেছিল, "এক দিক থেকে তুই ঠিকই করেছিস সীতা। সংসারে আয়ের একটা তত পথ খুলে গেল। যা পারিস একটু পাঠাসটাঠাস আমার হাতে। রিকশাগুলো যে সারাব তার টাকা নেই। এভাবে চললে রিকশাগুলো বসে যাবে এবার। তখন আর পেটে ভাত জুটবে না।"

সেই দিন প্রথম তুলতুলির কাছে মাইনের প্রসঙ্গ তুলল গিয়ে সীতা। ততদিনে সে জেনে গিয়েছে এই এলাকায় রাতদিনের কাজের মেয়ের চড়া দাম এবং তারা কেউ-ই তার মতো ঘর মোছা, বাসন মাজা থেকে যাবতীয় সব কাজ করে না। তার জন্যে সব বাড়িতেই আলাদা ঠিকে ঝি আছে, লেক গার্ডেন্সের বস্তি থেকে কাজ করতে আসে তারা।

তুলতুলি বলল, "হ্যাঁ, মাইনেপত্র নিয়ে তো কোনও কথাই হয়নি তোর সঙ্গে।"

"বাড়িতে একটু টাকা পাঠালে ভাল হত, মা ৰলছিল।"

"ও, তোর মায়ের অমনি তোর রোজগারের টাকা না হলে আর চলছে না? আমি তো ভেবেছিলাম তোর হাতে আর টাকা দেব না, একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেব,তোর নামে। মাসে মাসে জমা করে দেব। নিজের খরচ বলতে তোর তো কিছু নেই—সবই তো আমি দিচ্ছি।"

আবার করে একই কথা বলতে বাধল তার। এটা সেটা ভেবে তুলতুলি বলল, "ঠিক আছে, দু'মাসের টাকা মাকে পাঠিয়ে দে মানিঅর্ডার করে, আর বাকি টাকা ব্যাঙ্কে রাখ।"

সেই বারোশো টাকা মাকে পাঠাল সীতা। তুলতুলির প্রতি আজও কৃতজ্ঞ সে অ্যাকাউন্টটা খুলে দেওয়ার জন্যে। সেই অ্যাকাউন্টেই আজও টাকা রাখে সে। সেই সাতানব্বই-আটানব্বইয়ে ছশো টাকা মানে তার কাছে অনেক টাকা। ছ'বছরে আয় বাড়তে বাড়তে নাতাশার কাছে এখন সে দু'হাজার টাকা পাচ্ছে। সে হয়তো থেকেই যেত তুলতুলির বাড়িতে, চুপচাপ, মুখ বুজে নিজের মতো। তুলতুলির মেজাজের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে। কিন্তু দিন দিন উপদ্রব বাড়ছিল নয়নের। হঠাৎ হঠাৎ পিছন থেকে এসে চোখ চেপে ধরত নয়ন তার কিংবা তার ওড়নাটা দিয়ে মুখ মুছে নিল। সে চাপা গলায় বারণ করত নয়নকে, 'দ্যাখো, নয়নদা—এবার কিন্তু আমি তুলতুলিদিকে বলে দেব। নয়ন যেন এমন মজার কথা আর শোনেনি, হেসে উঠত এভাবে, 'কী করে নেবে বউদি আমাকে? বলেই দ্যাখ না!' বুকে আঙুল ঠুকে বলত, 'বউদি আমাকে সমঝে চলে, বুঝলি। বউদির সব কাজ কারবার আমার জানা আছে। আমাকে ঘাঁটাবে না। আর তার সঙ্গে আমি কি খারাপ কিছু করেছি! একটু বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করতে পারি না?'

"দ্যাখো, আমি গ্রামের মেয়ে, এসব বন্ধুত্ব আমি বুঝি না, আমি নিজের মতো থাকি, কাজ করি, আমাকে বিরক্ত কোরো না।"

একদিন ভীষণ রেগে গেল নয়ন এই কথা শুনে, তাকে টানতে টানতে চেপে ধরল দেওয়ালে, "ফালতু কথা বলবি না— তোকে কী বিরক্ত করেছি রে?" হাত দিয়ে চোয়াল চেপে ধরে তাকে চুমু খেল নয়ন। সীতা হকচকিয়ে গিয়েছিল দারুণ, ঠোঁট জ্বলছে, সারা শরীরে ঠেলে রেখেছে নয়ন নিজের শরীর! সীতা প্রাণপণ একটা থাপ্পড় কষাল নয়নের গালে, "কী মনে করেছ কী তুমি? আমি এখুনি বলব দিদিকে, দূর দূর করে যদি না তাড়িয়ে দেয় তোমায়!"

নয়ন হাত মুচড়ে ধরল তার, "তারপর তুই এই পাড়ায় টিকতে পারবি?"

চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল সীতা। দোতলা থেকে সেই শব্দে নেমে এসেছিল তুলতুলি, "কী হয়েছে সীতা?"

সে ব্যথায় বসে পড়েছিল মাটিতে, "এখানে এক মুহূর্ত থাকব না। এক মুহূর্ত থাকব না!" কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল সে। গালে হাত বোলাতে বোলাতে নয়ন বলেছিল, "প্রচুর মাথা গরম মেয়ে বউদি। একটু মজা মেরে কথা বলেছি, চড়িয়ে দিল মাইরি—পাগল-ফাগল নাকি বলুন তো? ডেঞ্জারাস!"

তুলতুলি সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল নয়নের দিকে, "কী মজা করেছিস শুনি? তোকে কে বলেছে ওর সঙ্গে মজা করতে? আজকাল সব সময় বাড়িতে ঢুকে আসিস কেন তুই?"

"ভীষণ গরম—একটু বরফ দিয়ে জল খাব বলে ঢুকেছি।"

"মিথ্যে কথা! নয়ন সব সময় আমার সঙ্গে এরকম অভদ্র আচরণ করে তুলতুলিদি, তোমাকে বলে দেব বললে শাসায়। ও আমাকে দেওয়ালে চেপে ধরে... আমি তাই ওকে একটা থাপ্পড় মেরেছি।"

নয়ন আঙুল নেড়ে নেড়ে বলে ওঠে, "আই তুই আমার দিকে তাকাস না, ইশারা করিস না?"

"কোনও দিনও করিনি। প্রথম দিন থেকে তুমি আমাকে বিরক্ত করেছ— তোমাকে দেখলে আমি রান্নাঘরে ঢুকে যাই, তুমি সেখানেও ধাওয়া করো।"

তুলতুলি ধন্দে পড়ে যায়, "আমি কারও কথা শুনতে চাই না, ইতরামির একটা শেষ আছে।"

সীতা উঠে দাঁড়ায়, "আমি কী করেছি দিদি? আমি তো কিছুই করিনি।"

"চুপ কর, তোদের ব্যাপার আমার জানা আছে। তুই প্রশ্রয় না দিলে নয়নের এত দূর সাহস হল কী করে?"

"তুমি আমাকেই অবিশ্বাস করছ? যেখানে আমি কোনও দিনও নয়নের দিকে চোখ তুলে তাকাইনি? ও একটা বাজে স্বভাবের ছেলে দিদি," কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল সে।

"কে বাজে কে ভাল সেটা তোর কাছে আমাকে শিখতে হবে না সীতা।"

সতেরো বছরের মেয়ে সীতা, রেগে বলে উঠেছিল, "যদি তোমার সঙ্গে এরকম করত নয়ন তা হলে বুঝতে পারতে।"

খেপে লাল হয়ে গেল তুলতুলি নিমেষে, "কী? আমি আর তুই এক হলাম? এত বড় কথা? বেরিয়ে যা এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে।"

চোখের জল মুছে উঠে গিয়েছিল সীতা ছোট্ট ঘরটায়। মাথা খারাপ খারাপ লাগছে তখন তার। ব্যাগে ভরে নিয়েছিল নিজের জামাকাপড়, টুকিটাকি সব ক'টা জিনিস। তারপর বেরিয়ে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, তুলতুলি ছুটে এসে মুখের ওপর ছুড়ে মারল ক'টা টাকা, "গুনে নে আর এক্ষুনি চলে যা!"

ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল সে তুলতুলি আর নয়নের দিকে। হঠাৎ তুলতুলি যেন মরিয়া হয়ে উঠল তাকে আরও কোণঠাসা করতে, "আমার দেওয়া একটা জিনিসও নিয়ে যেতে পারবি না সঙ্গে, সব রেখে যা। কাজ করেছিস, টাকা নিবি চলে যাবি। সোজা কথা।"

ব্যাগ কেড়ে নিল তুলতুলি তার হাত থেকে। উপুড় করে ধরল মাটিতে। নিজের দেওয়া সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি, চুড়ি, হার, সব সরিয়ে নিয়ে ফেলে দিল ফাঁকা ব্যাগটা। সীতা ধীরেসুস্থে নিজস্ব জামাকাপড় আবার ভরে ফেলল ব্যাগে, বেরিয়ে এল দরজা খুলে। তখন বেলা দেড়টা। মাথার ওপর গনগনে জ্বলছে সূর্য। সকাল থেকে ঝাড়পোঁছ, পরদা, সোফার কাভার এ সব বদলানো, সেই সঙ্গে রান্না করতে গিয়ে তার সকালে সে দিন

খাওয়াই হয়নি। বিস্রস্ত পায়ে বেশ কিছুক্ষণ এ দিক সে দিক ঘোরার পরে সে বুঝতে পারে সত্যিই সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোথায় যাবে স্থির করতে পারে না। এখানে সে অর্থে কেউই তার পরিচিত নয় তখন। সে এগোতে থাকে লেকের দিকে ফুটপাত ধরে—গাছের ছায়ায় বসবে যতক্ষণ পারে, ভাববে, ভেবে বের করবে ঠিক করে কিছু একটা যা হোক।

তখনও সে পরিপক্ক কাজের মেয়ে হয়ে ওঠেনি—একটা কাজ চলে গেলেই যে আর একটা কাজের খোঁজ করবে। মুষড়ে পড়বে না, কষ্ট পাবে না। হাঁটতে হাঁটতে সে টের পায় খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আর তখনই তার চোখে পড়ে ফুটপাতে একটা ভাতের হোটেল, বেঞ্চে বসে বেঞ্চেই থালা রেখে লোকে গোগ্রাসে ভাত চটকে মেখে খাচ্ছে। সে ভাত খাবে স্থির করে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। একটা ছোট প্লেটে ভাত তুলে তুলে ঢেলে দিচ্ছে লোকের পাতে যে, সে একজন মধ্য চল্লিশের মোটাসোটা মহিলা, ছাপা শাড়ি ঘামে জবজবে। সীতা ভাত-মাছের দর করে তার কাছে, বসে গিয়ে বেঞ্চে। মহিলা তাকায় তার দিকে। ভাত আর আলুভাজা থালায় করে এগিয়ে দিতে দিতে জানতে চায়, "তুমি হনুমান মন্দিরের ও দিকের একটা বাড়িতে কাজ করো না?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে সীতা।

"তা এখানে ভাত খাচ্ছ? কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"এই ভরদুপুরে বের করে দিল বাড়ি থেকে, দুটো ভাতও দিল না খেতে?"

সে বলল, "ওই রাগারাগির মাঝখানে বেরিয়ে এলাম।"

"ও? তা হলে তো আবার কাজ ধরবে নিশ্চয়ই?"

শুনে সোজা হয়ে বসেছিল সীতা-সত্যিই তো কাজ গেলে নতুন কাজ তো ধরাই যায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে সে সায় দিয়েছিল কথাটায়।

"এখন কোথায় যাবে?"

"জানি না!"

কী ভেবে নিয়েছিল মহিলা তক্ষুনি, "আমার কাছে একটা কাজের সন্ধান আছে। উলটো দিকের রাস্তা, যতীন দাস রোডে, আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি কিন্তু হাত খালি হওয়া অবদি বসতে হবে।"

সে প্রকাণ্ড আশা নিয়ে বসে থেকেছিল ব্যাটারির বাক্সের ওপর দু-দুটো ঘণ্টা। ততক্ষণে বেশ আলাপ জমে গিয়েছে তার বিমলাদির সঙ্গে। বিমলাদি তাকে বারণ করেছিল কাঁদতে, "চোখের জল অত সস্তা নয় সীতা! নিজের লোক কষ্ট দিলে বুকে বাজে। এরা তো কেউ নয়, দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক, দু'দিনের সম্পর্ক; গতর খাটাবি খাবি, সঙ্গে যদি একটু ভাল ব্যবহার পাস ধরে নিবি ওটা ফাউ, তাই বলে মাইনেটা থুতু দিয়ে গুনে নিতে ভুলবি না যেন!"

যতীন দাস রোডের কাজটা হয়ে গেল। জয়েন্ট ফ্যামিলি। লোকজন গমগম করছে বাড়ি। চার বছরের একটা মেয়েকে দেখাশোনার কাজ তার। সেই মেয়েটাই ঝুম ঝুম ছিল তার ভীষণ ন্যাওটা। এক বছর প্রায় ছিল সীতা ওই বাড়ি। তারপর তাকে কাঁদিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিদেশ চলে গেল ঝুম। মাইনেপত্র ভালই ছিল। ভাল খাওয়াপরাও দিত ওরা; তবু তার অন্তর এমন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেল ঝুমের চলে যাওয়ায় যে, সেই

নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে সীতা বেরিয়ে পড়ল আবার। এবার পূর্ণ দাস রোড। বিধবা, মধ্যবয়সিনী এক অধ্যাপিকার বাড়ি। ছেলে থাকে বিদেশে, মেয়েও তাই। সুধীনামাসি তাকে দেখেই বলেছিল, "তুই বাড়ির মেয়ের মতো থাকবি।' সুধীনামাসি অনেকটাই কথা রেখেছিল বলা যায়। অনেক ইংরেজি শিখিয়েছিল তাকে। গোল বাধল ছেলে, ছেলের বউ দেশে ফিরে আসায়। শান্ত, গাছঘেরা, নিরালা বাড়িটা ভরে উঠল অশান্তিতে। মাসি হরিদ্বারের এক আশ্রমে চলে গেল থাকতে। সে-ও একদিন খুব ঝগড়া করে ছেড়ে দিল বাড়িটা। সেবার তলে তলে আগেই অন্যত্র কাজ খুঁজে নিয়েছিল সীতা।

যমুনা সারা বাড়ি তোলপাড় করে খুঁজে এল হেনাকে— কোথাও পেল না। রান্নাঘরে ঢুকে ফেটে পড়ল ও, "বাড়ি ভরতি লোক, এর এটা দরকার, ওর সেটা দরকার, আমি পাগলের মতো ছুটোছুটি করছি, নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না, আর হেনা ঠিক এর মধ্যে কেটে পড়েছে? একবার বলে পর্যন্ত বেরোয় না বাড়ি থেকে, এত সাহস! বউভাতটা কেটে যাক, হেনার ব্যবস্থা আমি করব এই তোমাকে বলে রাখলাম প্রতিমা।"

শুভঙ্করী বসে ময়দা মাখছিল। দিন তিনেক আগে চিংড়িমাছ ছাড়াতে গিয়ে তার হাতে খোলা বিঁধে যায়। ঝরঝর করে রক্ত পড়েছিল। বেশ পেকে উঠেছে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা। এত বিশাল একটা ময়দার তাল ঠেসতে গিয়ে ব্যথায় চোখে জল চলে আসছে। কেটে যে গিয়েছে তাই নিয়েও কম হম্বিতম্বি করেনি যমুনা, "হাসব না কাঁদব রে শুভঙ্করী? সুন্দরবনের মেয়ে তুই, সুস্থির হয়ে বসে দুটো চিংড়িমাছও ছাড়াতে শিখিসনি? কত যে ঢং জানিস। যে কাজই করতে দাও, কিছু না কিছু বিপত্তি ঘটাবি। টিকিস টিকিস করছিস তো করছিস। এমনি এমনি মানুষের কপালে ঝাঁটা-লাথি জোটে না রে। আর কী অদ্ভুত মেয়ে বাবা! যত গালাগালিই দাও, কোনও হেলদোল নেই।"

আর সত্যিই, শুভঙ্করী চিরকাল বাপের ঘরে, শশুরঘরে বদনামই কুড়িয়েছে কুঁড়েমির জন্যে। অলসতার জন্যে। এই যে যমুনাদিরা মনে করে হদ্দগ্রামের মেয়ে যখন তখন দিনরাত চরকিবাজির মতো কাজ করে যাবে —মোটও তার ক্ষেত্রে এটা সত্যি নয়। সে কোনও দিন ভোরে উঠতে পারত না। উপেন গুছাইতকে সে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পান্তা বেড়ে দিতে পারেনি জীবনে কখনও। সে বেলায় ঘুম থেকে উঠত আবার রোদ চড়তে না চড়তে এক পেট খেয়ে ফেলে ঘুমে চোখ ঢুলে আসত তার। গৃহপালনের থেকে বেশি ভাল লাগত গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে। মাজারের পিছনের আশশেওড়া গাছগুলোর ভিতর ছিল তার গ্রামের কচিকাঁচাদের সঙ্গে চু-কিত-কিত খেলার জায়গা।

যমুনার বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি, "প্রেম, প্রেম, প্রেমে পাগল সব। এই সব উঠতি বয়েসি মেয়েদের এখন মাথায় প্রেম ছাড়া কিছু নেই। কাজকর্ম করবে কী? সব সময় একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। আমাদেরই আর কিছু হল না—সেই কোন ছোট বয়েসে স্বামী ছেড়ে দিল, আজ অবদি একটা পুরুষ মানুষকে কাছে ঘেঁষতে দিইনি।"

অসময়ের ফুলকপি কেটে কেটে গামলার জলে ফেলছে প্রতিমা। মাথা না তুলেই বলল, "দ্যাখো গিয়ে, হেনা এখন জয়ন্তর সঙ্গে খুনসুটি করছে। আজকাল সাজগোজ কেমন বেড়েছে মেয়েটার। এ মাসে তো মাইনের টাকা বাড়িতে পাঠায়নি। ওই জয়ন্তকে জিনসের প্যান্ট কিনে দিয়েছে।"

যমুনা বলল, "তোমার মনে আছে প্রতিমা, মিনুর কথা?"

"তা আবার মনে নেই?"

"তা হলে বলো, ছেলেটাকে সব জমানো টাকাপয়সা দিয়ে দিল—কিনা লেকের সামনে ভোরবেলা থেকে ফলের দোকান নিয়ে বসবে! সে কী করল, সব টাকা নিয়ে চম্পট দিল দেশে। জানা গেল অমন মিচকে পোড়া চেহারা, আসলে দু'-দুটো বাচ্চার বাপ! মিনু জানতই না ছেলেটা বিবাহিত। রাস্তায় পিছন পিছন ঘুরল, অমনি প্রেম হয়ে গেল—অমনি তাকে সর্বস্ব দিয়ে বসে রইল। অবাক ব্যাপার!"

হলঘরে জমাটি আড্ডা বসেছে সবার। নতুন বউকে সাজিয়েগুছিয়ে বসানো হয়েছে মধ্যমণি করে। কাছের-দূরের প্রচুর আত্মীয় চার দিন ধরে রয়েছে এ বাড়িতে। বউভাত কাটিয়ে যাবে। কাল বিয়ের তত্ত্ব-তাবাস নিয়ে অনেক লোকের সঙ্গে শুভঙ্করীও গিয়ে পৌঁছেছিল কনের বাড়ি। এরা যেমন বনেদি বড়লোক, কনের বাড়ি মোটেও তেমন নয়। দেখতে সুন্দরী, শিক্ষিত মেয়ে, তবে সব দেখেশুনে শুভঙ্করীর মনে হল এবং অন্যরাও বলাবলি করছিল—মেয়েকে টিলটিলে গয়না দিয়েছে, খাওয়াদাওয়াও তেমন বলার মতো কিছু না। তত্ত্ব নিয়ে যারা গিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের হাতে মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছে বকশিশ ! সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল যমুনা, "বাবা, ভোলাভেটকি ছিল ফ্রিশ ফ্রাইয়ে, আমার তো খেয়ে গা গুলিয়ে গেছে! আর বিয়েবাড়ি ম-ম করছে পেচ্ছাপের গন্ধ! মাগো, আমিই পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি তা হলে এদের কী অবস্থা হচ্ছিল বলো?" এদের বলতে বরপক্ষ।

যমুনার আড়ালে প্রতিমা প্রতিবাদ করেছিল অবশ্য, "অবস্থা ভাল হলে কেউ পাগলের বংশে মেয়ে দেয়? এ তো গুষ্টি পাগল। ছোটখোকাও সেদিন দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটে ফেলে রক্ত দেখে যেমন কাণ্ড বাধাল, আমার বিশ্বাস ছোটখোকার শরীরেও পাগলামির বীজ আছে। না থেকে যায়ই না! যমুনাকে বলতে যাও, তেড়ে আসবে—'পাগলই যদি হয় তা হলে ব্যাবসা চালাচ্ছে কী করে?' ব্যাবসা কি ছোটখোকা চালাচ্ছে? সে তো চালাচ্ছেন মামাবাবু!"

সে দিক থেকে দেখতে গেলে ছোটবউয়ের ঠাকুমার হাত থেকে পাওয়া কড়কড়ে পঞ্চাশ টাকাটাই শুভঙ্করীর জীবনের প্রথম রোজগার। একতলার একটা বড় ঘরে মাটিতে বিছানা পেতে শোয় সে। খাটে শোয় প্রতিমা আর হেনা। টাকাটা শুভঙ্করী নিজের বালিশের খোলের ভিতর গুঁজে রেখেছে। তার বালিশ হেনা বা প্রতিমা কেউ ছোঁয় না, কারণ সে সারা রাত কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলে। হেনার কাছে 'নিঘিন্নে' ব্যাপার।

এখন গুটিকতক জিনিস তার নিজের হয়েছে। তিনটে পুরনো শাড়ি আর বিয়ে উপলক্ষে পাওয়া আরও দুটো নতুন শাড়ি। তিনটে নতুন ব্লাউজ, একটা চেন দেওয়া ব্যাগ, একটা তোশক, চাদর, বালিশ। একটা মশারি, একটা চিরুনি আর এক কৌটো সিঁদুর। সিঁদুর কৌটোটা সে কেঁদেকেটে নেপালকাকাকে দিয়ে আনিয়েছে। এ ছাড়া আরও টুকিটাকি কটা জিনিস নিজের ব্যাগে এনে ভরেছে শুভঙ্করী। তত্ত্ব সাজানোর জন্যে আনা রেশমের ফিতে এক বান্ডিল, এক কৌটো পানমশলা, একটা সিনেমা আর্টিস্টদের ছবির বই, একটা ভীষণ সুন্দর গন্ধওলা ধূপ, কালীঠাকুরের ছবি একখানা।

মাস খানেক গড়িয়ে গিয়েছে এ বাড়িতে আসার পর। দ্বিতীয় দিন দিদিই ফোন করেছিল তাকে। সে ছুটে এসে কেঁদে পড়ল ফোনের ওপর, পারলে ফোনের মধ্যে দিয়েই দিদির গলা জড়িয়ে ধরত। কিন্তু দিদি কিছু শুনলই না; বলল, কর্তাগিন্নি এক মাসের জন্যে পুরী যাচ্ছে থাকতে। সঙ্গে যাচ্ছে চপলাও। ফিরে আসার পরও

যদি শুভঙ্করীর দেশে ফিরে যেতে মন চায় তা হলে চপলা ভাইকে খবর দিয়ে আনাবে, শুভঙ্করী তখন অনায়াসে দেশে ফিরে যেতে পারে, কেউ বারণ করবে না। তা এক মাস তো কেটেই গেল, দিদি ফিরল কোথায়? অপেক্ষায় অপেক্ষায় কেটে গেল শুভঙ্করীর দিনগুলো।

কিন্তু কীসের অপেক্ষা? শয়নে, জাগরণে উপেনকে ভাবতে ভাবতে সে এখন ক্লান্ত। তাকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে, অনেক স্তোকবাক্য শুনিয়ে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে সতিন ঘরে আনল তার স্বামী—অন্য কোনও কারণ নয় শুধু একটি সন্তান লাভের আশায়। অথচ দু'-দিন যেতে না যেতে তার অবস্থা হল সংসারে প্রায় দাসী-বাঁদির মতো; ক্ষণে ক্ষণে তারই চোখের সামনে ঘরে খিল দিতে লাগল উপেন ওই ময়নাকে নিয়ে। সে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল, পাগল পাগল লাগত তার। নতুন বিয়ে করে উপেন একটা রাত্তিরও শুতে এল না তার কাছে। আদর ভালবাসা তো দূর, ডেকে কথা বলাও বন্ধ করে দিল। আর সেই সঙ্গে বাড়ল শাশুড়ির গালিগালাজ, শাপমন্যি। কাজকর্মে সে কোনও দিনই পটু নয়, তাই নিয়ে আকথা কুকথা তাকে কম শুনতে হয়নি। কিন্তু এবার যেন মাত্রা ছাড়াল। শুভঙ্করীও ছেড়ে দেওয়ার মেয়ে নয়। পাঁচ কি ছ'দিনের মাথায় উঠোনে শুকাতে দেওয়া নতুন বউয়ের একখানা শাড়ি দেখা গেল ফালা ফালা করে কাটা। ময়না তো দাওয়ায় আছড়ে পড়ে কাঁদছে আর তাকেই দায়ী করছে। যত শুভঙ্করী বলে সে এ কাজ করেনি—কেউ শোনে না। একসময় সে দেখল দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ময়না, উপেন আর তার শাশুড়ি এককাট্টা হয়ে চেঁচাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আর উঠোনে দাঁড়িয়ে একা লড়ে যাচ্ছে সে। মাথায় আগুন জ্বলে গেল তার—যত নষ্টের গোড়া তো ওই ময়না। ওরই জন্যে না তার এত দুর্গতি? বাঁশের বেড়ার গায়ে গোঁজা ছিল কাটারি। এক ছুটে সেটা টেনে বের করে সে ঝাপিয়ে পড়তে গেল ময়নার ওপর। উপেন গুছাইত শক্তসমর্থ পুরুষ, ময়নাই তখন তার কামনার ধন। এক ঝটকায় তাকে পেড়ে ফেলল উপেন। তারপর হাত থেকে কাটারি কেড়ে নিয়ে একের পর এক লাথি মারতে লাগল তার বুকে, পেটে, পিঠে। সেই শরীরে—যার জন্যে কত না পাগলাপনা ছিল উপেনের দশ দিন আগে পর্যন্ত। সে যেমন আত্মহারা হয়ে চাইত উপেন তার শরীর ধামসে শেষ করে দিক, উপেনের দিক থেকেও তো হ্যাংলামি কম ছিল বলে টের পায়নি শুভঙ্করী কখনও। আর সে তো এক-দু'বছরের ব্যাপার নয়! কত বছর কেটেছে তার উপেনের নিষ্পেষণ সহ্য করে! সে সব কি কিছুই সত্যি নয়? সে মরে গেলেও বিশ্বাস করবে না। এ সব কুলতলির ওই মেয়েটার তুকতাকের ফল। কুলতলিতেই তো থাকে মহেশ্বর ওঝা। খুব নামকরা গুনিন সে। ওর মন্ত্রের বলেই স্বামী তার এমন পাষণ্ড বনে গেল। কুকুর-বেড়ালের মতো মেরে তাড়াল তাকে। একটুকু দয়ামায়া করল না।

তবে যত দিন যাচ্ছে, বাড়ছে ক্ষোভ, রাগ। সে দিনমানে হাসতে পারে, উদাসীন হয়ে থাকে। রাতে কামনাতাড়িত গুমরিয়ে কাঁদে। দেহের সুখ, আনন্দে যে বড় বেশি অভ্যস্ত ছিল সে!

যমুনা এবার তাকে নিয়ে পড়ল, "অ্যাই শুভঙ্করী, তাড়াতাড়ি হাত চালা। ময়দা মেখে চট করে দুধ নিয়ে আয়। আর সন্ধে হয়ে গেলে দুধ পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে গণেশের দোকানে ফর্দটা রেখে আসবি। ফর্দের ওপরই বাড়ির নাম-ঠিকানা লেখা আছে। ওরা লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে, আর হেনাকে দেখতে পেলে বলবি যমুনাদি ওর জিনিসপত্র সব রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে।"

একে তো বাড়ি গিজগিজ করছে লোকে, ভোর থেকে উঠে কাজ করেই যাচ্ছে তো করেই যাচ্ছে, তার ওপর এমনিতেই চার দেওয়ালের ভিতর কেমন দমহারা হয়ে পড়ে শুভঙ্করী। বাইরে বেরোতে পারবে এই

আশায় সত্যিই উবু হয়ে বসে আপ্রাণ ময়দা ঠাসতে লাগল সে। ধোঁয়া, ধুলো, গাড়িঘোড়া, চিৎকার—যেন নটরাজ অপেরার যাত্রা হচ্ছে। কিন্তু তবু একটা মুক্তি তো? খোলা আকাশ দেখতে পাবে, লেকের রাস্তায় গেলে গাছগাছালি, জল এ সব দেখতে পাবে। লেকের জলে নৌকো চরছে, মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে... বড় বড় গাড়ি থেকে নেমেই হনহন করে হাঁটতে শুরু করছে হোঁতকা হোঁতকা মেয়েছেলে, বেটাছেলেগুলো। বলে মানুষ খেতে পায় না, সাত টাকা কেজি চাল কিনতে সারা সকাল, সারা দুপুর কোমর জলে ডুবে মীন ধরে যাচ্ছে। সাপ আর বাঘের ভয় তুচ্ছ করে জঙ্গলে ঢুকছে কাঠ আনতে, মধু আনতে; আর এরা কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার ধ্বংস করে খেয়ে ফুলে ফেঁপে ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে আবার যেমন খাচ্ছে তেমন রোগা হবে বলে পাঁই পাঁই ছুটছে এমন যেন পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে কেউ!

ঠিক সন্ধে হব হব সময়ে নাইলনের ব্যাগ ভাঁজ করে নিয়ে দুধ আনতে বেরোল শুভঙ্করী। ফর্দ আর টাকা ব্যাগেই আছে। দশ প্যাকেট দুধ নিতে হবে। একটু এগোতেই বিউটি পার্লারের সামনে হেনা আর জয়ন্তকে দেখতে পেল সে। ফুটপাতের ওপর ফোনের বড় বাক্সের গায়ে ঠেকো দিয়ে বানানো জয়ন্তর পান, সিগারেট, চকোলেট, কোল্ড ড্রিঙ্ক, চিপসের দোকান। বিক্রিবাটা মন্দ নয়। তার ওপর জয়ন্তর খুব সাজগোজের বাহার। একদিন দুপুরবেলা চৌধুরী বাড়ির সামনে দিয়ে ছেলেটাকে চোখে গগলস পরে হেঁটে যেতে দেখেছে শুভঙ্করী। হেনাকে যে কিছু বলা দরকার, সে কথা মনে পড়ল না তার। সে আপন মনে হাঁটতে লাগল। হাঁটছে তো হাঁটছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই—বেশ কিছুক্ষণ পরে তার খেয়াল হল মোটামুটি চেনা আশপাশটা বদলে গিয়েছে। একবার থমকে গেল শুভঙ্করী। বড় রাস্তায় এসে পড়েছে। একটা অটো প্রায় চাপা দিতে দিতে চলে গেল। সরতে যাবে, ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল লাল রঙের বাস একটা! কে একটা টেনে নিল হাত ধরে, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল বাসটা। লোক জমে গেল মুহূর্তে। কনডাক্টর নেমে পড়ে তাকে এই মারে তো সেই মারে। একটা বয়স্ক লোক তাকে বলল, "কী, পার হবে?"

সে মাথা নেড়ে দিল অমনি। লোকটা বলল, "আমার সঙ্গে এসো।" লোকটার সঙ্গে বড় বড় দুটো রাস্তা পার হয়ে গেল সে। লোকটা তারপর তাকে ফেলে এগিয়ে গেল। কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে ক্রমশ আরও এগোতে লাগল শুভঙ্করী—এবার একটু গাড়িঘোড়া দেখেশুনে। আবার অনেকক্ষণ হাঁটল সে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে গিয়েছে, দোকানে দোকানে ঝলমল করছে রংবেরঙের আলো। লোকজন কেনাকাটা করছে, চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে, মিষ্টির দোকানের সামনে দাড়িয়ে শিঙাড়া-কচুরি খাচ্ছে।

এক জায়গায় ফুটপাত আর রাস্তার অনেকটা জুড়ে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। সামনে বেশ কয়েক সারি চেয়ার পাতা, জোরালো আলো দেওয়া হয়েছে মঞ্চে, মাইক, টেবিলের ওপর হারমোনিয়াম সাজানো। মঞ্চে উঠে এল প্রায় দশ-বারোজন নারীপুরুষ। আকাশ ফাটিয়ে হইহই করে গান গাইতে লাগল তারা সমস্বরে। ফটাফট চেয়ার দখল করে নিচ্ছে লোকে। শুভঙ্করী ভাবল, নির্ঘাত একটা ফাংশান হচ্ছে এখানে। সে ভুলে গেল দুধের কথা, চৌধুরী বাড়ির কথা, যমুনার টেরাবেঁকা কথা— সে-ও একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল। পরপর বেশ কয়েকটা গান হওয়ার পর যখন দেখা গেল লোকজন জমে উঠেছে, বক্তৃতা দিতে উঠলেন একজন সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বয়স্ক লোক। সে বুঝল এটা কোনও গান নাচের জলসা নয়। ভোটের ব্যাপার, যেমন দেখেছে সে গ্রামে—নেতারা যেখানে বলে-টলে। কিন্তু তাও বেশ ভাল লাগল শুনতে শুভঙ্করীর। লোকটার

কথা বলার ঢংটা এমন যে, সে হাঁ করে শুনতে লাগল। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল। একটানা কথা বলে থামল লোকটা, নেমে গেল মঞ্চ থেকে। উঠল আর একজন।

কতক্ষণ পরে কে জানে তাকে পিঠে হাত দিয়ে ডাকল কেউ, "অ্যাই তুমি এখানে কী করছ?"

চমকে উঠে তাকিয়ে শুভঙ্করী দেখল সে দিনের সেই মেয়েটা। ফুটফুটে একটা বাচ্চা নিয়ে দুধ আনতে এসেছিল, সেই মেয়েটা। নাম বলেছিল 'সীতা'। আজ সীতার সঙ্গে বাচ্চাটা নেই এবং পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদেরই বয়েসি আর একটা মেয়ে। দু'জনেই দুটো সুন্দর সালোয়ার-কামিজ পরেছে, পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। শুভঙ্করী উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে; হাসল, "এই একটু শুনছিলাম!"

"ওমা, রাত ন'টা বাজে, তুমি এত দূরে এসে বসে আছ কেন? তুমি কি এ দিকে কাজ করো নাকি? হেনাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছ?"

দু'পাশে মাথা নাড়ল সে।

"তবে?" জানতে চাইল সীতা, "তোমার কি মাথা খারাপ নাকি? বাড়িতে বলে এসেছিলে?" আবার মাথা নেড়ে না বলল সে। সীতা বলল, "বোঝে ঠেলা! তা বাড়ি ফিরবে না? অনেক রাত হল তো?"

"বাড়ি এখান থেকে কতদূর?"

"তা জেনে তুমি কী করবে? ফিরবে তো আমার সঙ্গে চলো। বাস ধরতে হবে।"

"তুমি কোথায় গেছিলে?"

সীতা অপর মেয়েটাকে দেখাল, "আমার বোনের জন্যে একটা কাজের সন্ধানে, তারা আবার স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে, রাত আটটার আগে দেখা করার উপায় নেই।" বলতে বলতে হাঁটতে লাগল সীতা।

"কাজ হয়ে গেল?"

"না, আমার বোন থাকবে না বলছে। বিরাট একটা কুকুর রয়েছে বাড়িতে, পুতুল ভয় পাচ্ছে।"

"কুকুরে আমারও ভীষণ ভয়," বলল সে।

"আর পাগলে ভয় নেই?" হাসল সীতা।

সে-ও হাসল একমুখ, "পাগল তো লোহার গেটের ভেতর বন্ধ করা থাকে!"

"ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছিলে কেন? কিছু কিনতে বেরিয়েছিলে নিশ্চয়ই?"

সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভঙ্করী, "হেই ভগবান। দুধ নেওয়া হল না তো?"

"তোমার কপালে আজ দুঃখ আছে। যমুনাদি তোমাকে কড়মড় করে চিবিয়ে খাবে। কখন বেরিয়েছ বাড়ি থেকে?"

"সেই সন্ধে হয় হয় সময়ে !"

"তাড়িয়ে দিলে যাওয়ার জায়গা আছে?"

"নাহ্!"

"আমার কাছে চলে এসো, রাতটুকু থাকতে দিতে পারব!"

"তোমার কাজের বাড়ির লোকেরা খুব ভাল, তাই না সীতা?"

"লোকেরা কেউ নয়, ওই যে বাচ্চাটাকে দেখেছিলে, ও আর ওর মা, আমার দিদি—আর দ্বিতীয় প্রাণীটি নেই!"

সীতার সঙ্গে কথা বলতে তার আবারও খুব ভাল লাগল। বিয়েবাড়ির গল্প বলতে লাগল শুভঙ্করী সীতাকে। নতুন বউকে কেমন দেখতে হয়েছে জানতে চাইল সীতা। সে ঠোঁট উলটে বলল, "সাদাপানা, গড়নটড়ন ভালই; আমার মাথায় মাথায় !"

"ও তা হলে তো ভীষণ লম্বা? এখন তো লম্বা মেয়েদের খুব কদর!"

এইসব কথা বলতে বলতে তারা বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে। সীতা জিজ্ঞেস করল, "কী গো, তোমার দেখছি ভয় করছে না একটুও!"

সে উত্তর দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা রোগা মতো ছেলে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সীতার সামনে--সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সীতা; বলল, "কী চাই?"

"এত রাতে তুই এখানে কী করছিস?"

"তাতে তোমার কী?" বলে উঠল সীতা বিরক্তিভরে

"ঝাঁঝ খুব না তোর?"

"তুমি এখান থেকে কেটে পড়ো তো। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।"

"তোর বোনকে নিয়ে নাকি এখানে অনেক কেস হয়ে গেছে? এইটা তোর বোন?" পুতুলের দিকেই ঘুরে তাকাল ছেলেটা।

"দ্যাখো নয়ন, আমি কিন্তু চিৎকার করে লোক জড়ো করব।"

"তা তুই পারিস সীতা! কিন্তু একটা মাত্র প্রেমিক তোর, একদম সাচ্চা প্রেমিক, তাকে লোকে ধরে মারলে তোর দেখতে ভাল লাগবে? এত বছরেও তুই এই সামান্য কথাটা বুঝলি না যে আমি তোকে ভালবাসি? এমনি এমনি পেছনে ঘুরছি তোর?"

পুতুল বেশ জোর গলায় বলল, "দিদি, কে রে এই ছেলেটা? ঘাড়ের ওপর উঠে আসছে? একটা বাসে উঠে পড় না!"

"অ্যাই! চুপ কর—কথার মধ্যে কথা বলিস না", ধমকে উঠল নয়ন পুতুলকে।

"নয়ন!" হিসহিস করে উঠল সীতা। "তোমার এত সাহস আমার বোনকে ধমকাচ্ছ? কী চাই তোমার বলো তো? আমাকে তুলতুলির বাড়ি থেকে, তাড়িয়েও তোমার শান্তি হয়নি? এত বছর ধরে ছায়ার মতো পড়ে আছ পেছনে! যেখানে যাই সেখানেই তুমি! আমাকে একটু কাজ করে খেতে দেবে না?"

"এত দোষারোপ করিস কেন সব সময় সীতা? ইচ্ছে করে বুঝতে চাস না? দিল্লিতে আমার ভাল চাকরি হয়েছিল, যাইনি শুধু তোর জন্যে...! কিন্তু অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই—বুঝলি? আর তোকে ফলো করব না। কারণ লাভ নেই। তোর মন বলে কিছু নেই। রাখ রাখ, তুলে রাখ, লফটে তুলে রাখ, মাঝে মাঝে নামিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখিস, তারপর আবার তুলে দিস—তুলে রাখ ওই গ্রামের মাস্টারটার জন্যে! কাউকে দিতে গেলে সাহস লাগে, অত সাহস যে তোর নেই তা বুঝে গেছি আমি। চললাম।"

নয়ন চলে যেতে উদ্যত হল। সীতা কেমন করে উঠল যেন, "নয়ন, এসব তুমি আমাকে কী বলে গেলে? আমি মানে বুঝতে পারিনি।"

ঘুরে তাকাল নয়ন, "আমি ছ'বছর আগের নয়ন নেই সীতা। তোর চোখ থাকলে দেখতে পেতিস!" লাফ দিয়ে একটা বাসে উঠে চলে গেল ছেলেটা।

হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল পুতুল, "কী দিদি, এখনও অঞ্জনদাকে ভালবাসিস? ওই মেনিমুখোটাকে, অ্যাঁ? বউয়ের আঁচল ধরা, ওটা তো বউয়েরও চাকর, বউয়ের বাবারও চাকর! তার থেকে এই ছেলেটা অনেক ভাল!" থামল পুতুল একটু, "পুলক অনেকটা এরকম ছিল।"

বাস থেকে নেমে সীতা বলল, "তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই শুভঙ্করী।"

সে সায় দিল মাথা নেড়ে। একটু এগোতেই গেটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল গেটের সামনে জটলা। দারোয়ান, নেপাল কাকা, হেনা, হেনার প্রেমিক জয়ন্ত এবং আরও দু'-একজন। হেনাই প্রথম দেখতে পেল তাদের, ছুটে এল, "এ কী, সীতা? ও তোর সঙ্গে ছিল? বাড়িতে বলে যেতে কী হয়েছিল?"

শুভঙ্করী গিয়ে দাঁড়াল সীতার পিছনে। নেপালকাকা বলল, "তোর মতো বেয়াদব মেয়ে তো দুটো দেখিনি। কাজের বাড়ি, তার মধ্যে শুভঙ্করী কোথায়, শুভঙ্করী কোথায় করে তোলপাড় হচ্ছে আর তুই দুধ আনতে বেরিয়ে লোকের বাড়ি বসে গল্প করছিস!"

সীতা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ভুলটা ধরিয়ে দিতে। হাঁ-হাঁ করে ওঠে সবাই। কী কাণ্ড, অত দূর চলে গিয়েছিল মেয়েটা? সেই হাজরা মোড় অবদি? কী দুঃসাহস! যদি সীতার সঙ্গে দেখা না হত তা হলে তো মেয়েটা বাড়িই ফিরতে পারত না! সব শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল হেনা, "বক্তৃতা শুনছিল, ও শুভঙ্করী, তুই কী শুনলি আমাকে একটু বল! মা গো, পাগলের বাড়িতে আর একটা পাগল এসে জুটুল!" সীতা আর পুতুলেরও দেরি হয়ে যাচ্ছিল, জুরার খাওয়ার সময় কখন পার হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস দিদি আজ ছুটি নিয়েছে তাই! ওরা চলে গেল।

ব্যাপারটা এখানেই মিটল না। হল ভরতি লোকজন, নতুন বউ, সকলের সামনে মাথা নত করে দাঁড়াতে হল শুভঙ্করীকে। মামাবাবু বললেন, "আমরা তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না তোমাকে কোথায় খুঁজব! পুলিশে খবর দিয়ে তো লাভ হত না। তোমার কি ছবি আছে আমাদের কাছে?"

পাশ থেকে গিন্নির ছোটবোনের মেয়ে বলে উঠল, "কেন? আমার ক্যামেরায় ছবি আছে ওদের সবার, তখন তো খুব পোজটোজ দিয়ে ছবি তুলল!

অন্য এক আত্মীয় সোফার হাতলে চাপড় মেরে বললেন, "আমি তো শিয়োর ছিলাম, চুরিটুরি করে পালিয়েছে। বিয়েবাড়ির ব্যাপার। সব তো হইহুল্লোড়ে মত্ত, কারও খেয়ালই নেই জিনিসপত্র কোথায় কী রাখছে। হয়তো সোনাগয়না কিছু হাতে পড়ে গেছে—নিয়ে পালিয়েছে।"

গিন্নি গম্ভীর চোখে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। বললেন, "আচ্ছা, তোর কি মনেও হল না একবার যে বাড়িতে সবাই ভাবছে? যত দিন তুই আমার বাড়িতে আছিস তত দিন তোর ভালমন্দের দায় তো আমার কাঁধে— নাকি শুভঙ্করী? ছিট আছে মাথায় তোর? এবার থেকে তোর বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ। থাকতে হলে থাক—নইলে বিদেয় হ। তা ছাড়া বিয়ের পাট চুকে গেলে এত কাজের লোকের আমার দরকারও নেই।"

সে নতুন বউকে দেখছিল। এখনও মিলেমিশে যায়নি বউ সবার মধ্যে। একটা হলুদ রঙা বেনারসি পরে, গা ভরতি গয়না পরে বসে আছে চুপচাপ। তার কেন জানি মনে হল নতুন বউ মেয়েটা খুব ভাল। শান্তশিষ্ট। পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, শুইয়ে দিলেই শুয়ে পড়বে। ছোটখোকা বসে ছিল একটা সোফায়। এইসব নানাবিধ মন্তব্যের মধ্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, "যমুনা, যমুনা!" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

ছুটে এল যমুনা, তাকে একঝলক কড়া চোখে মেপে নিয়ে ছোটখোকাকে বলল, "কী হয়েছে ছোটখোকা?"।

"কখন থেকে বসে আছি। খেতে দিচ্ছিস না কেন? আমার ঘুম পেয়ে গেছে, বিছানা করে দে। আমি ঘুমোব। খাটের ওপর রাজ্যের জিনিস, হটা সব!"

গিন্নিসহ অনেকেই ছোটখোকার চোটপাট শুনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। গিন্নি বললেন, "ওমা, তোর আবার হঠাৎ কীসে মেজাজ খারাপ হল? তখন কত করে বারণ করলাম। কালরাত্রি, বউয়ের মুখ দেখিস না, তখন জেদ করে এসে বসলি!"

যমুনা বলল, "থাক, থাক, ছোটখোকার মন চেয়েছে এসে বসেছে, ওতে কোনও ক্ষতি নেই। আয় ছোটখোকা, আমি তোকে এক্ষুনি বিছানা করে দিচ্ছি। এ সি চালিয়ে দিচ্ছি। তুই একটু খেয়ে শুয়ে পড়।"

"না, আমি আর খাব না। আমি ঘুমোব!"

মামাবাবু বলে উঠলেন, "তাই ঘুমে গিয়ে বরং! বিকেলে তো অনেক খাওয়াদাওয়া হয়েছে! কাল সকাল থেকে আরও লোকজন এসে পড়বে বাড়িতে, রেস্ট হবে না, ছোটখোকা একটা টানা লম্বা ঘুম দিয়ে নিক।"

শুভঙ্করী দেখল বাকি সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে আর কঙ্কাবতী, নতুন বউ, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে নতুন বিয়ে করা বরের দিকে।

ছবি তুলেছিল যে মেয়েটা সে কঙ্কাবতীকে বলল, "ছোড়দা এমনিতে মাটির মানুষ কিন্তু একবার রেগে গেলেই হল! ভীষণ মুডি গো ছোটবউদি!"

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, "অ্যাই, ছোটবউদি বলছিস কেন? আমাদের তো একটাই বউ। ওকে সোনাবউদি বলবি। আর রেগে গেলে কারই বা মাথার ঠিক থাকে?"

যমুনা চলে গেলে ছোটখোকাকে সঙ্গে নিয়ে। হেনা দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। চাপা স্বরে বলল, "তুই আজ যমুনার ঝাড়ের হাত থেকে বেঁচে গেলি মনে হয় !"

রান্নাঘরে ঢুকে শুভঙ্করী দেখল প্রতিমার আজ বেজায় মেজাজ খারাপ। শুভঙ্করীর কাণ্ড দেখে যাকে বলে একেবারে রেগে কাঁই। একা হাতে অধিকাংশ কাজ সারতে হয়েছে ওকে। মুখ গোমড়া করেই রইল প্রতিমা— একটাও কথা বললনা তার সঙ্গে। শুভঙ্করীর আবার খিদে পেলে তক্ষুনি খাবার চাই। উপেনের জন্যে তখন মর্মাহত অবস্থায় খিদেই পায়নি তাই, পেলে চোখের জল গড়াতে গড়াতেই সামনে যা পেত গোগ্রাসে খেয়ে ফেলত সে। এখন তার বড়ই খিদে পেয়েছে। প্রতিমার ভাবভঙ্গি দেখে সে নিজের থালায় ক'টা লুচি আর তরকারি তুলে নিয়ে খেতে লাগল। প্রতিমা আর থাকতে পারল

না। বলল, "খুব না?"

সে ভালমানুষের মতো বলল, "কী?"

"সাধে তোর বর তোকে খেদিয়ে দিয়েছে শুভঙ্করী? কী নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে বাবা-এসেই খেতে বসে গেলি? খা যত পারিস--কিন্তু সবার খাওয়া হলে সব বাসন মেজে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে তবে শুতে যাবি। আজ আমি তোকে ছাড়নেওলা নই, বদ মেয়েছেলে কোথাকার! যমুনা কী বলবে, আমারই তোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। বেড়াতে যাওয়ার আর দিন পেলি না?"

হেনা এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। বলল, "বাবা গো, কী রগড়! এই মেয়েটা একটা জিনিস বটে! ও বসে বসে নেতাদের বক্তৃতা শুনছিল। পেটে খিল ধরে গেছে হাসতে হাসতে।"

ঠিক এই সময় রান্নাঘরে এল যমুনা। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া থেমে গেল তার। প্রতিমা আর হেনাও অপেক্ষা করছে শুভঙ্করীর হেনস্থা দেখার জন্যে। সবার মুখের দিকে তাকাল যমুনা, "কথা শুনলি! গা-পিত্তি জ্বলে যায় কিনা?"

হেনা বলল, "কোন কথা গো?"

ঠোঁট টিপে একটা মুখভঙ্গি করল যমুনা, "ওই যে, আমি তো ভাবলাম চুরি করে পালিয়েছে। বড় জামাইয়ের কথা।"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, সে তো কাজের লোক মানেই চোর-ছ্যাঁচোড় !"

"নিজে তো ঘুষ খেয়ে খেয়ে বাড়ি, গাড়ি করে ফেলল— নিজে চোর নয়! চোর নয় ডাকাত !"

"ছোড়দা ঘুমাতে গেল?" ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল হেনা।

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল যমুনা, "আমি তো কেঁপে উঠেছি একেবারে। মনটা কু গেয়ে উঠল না?"

"কেন?"

"বাবা, সে তো তুই দেখিসনি হেনা, বড়খোকা ছিল কেমন ভাল মানুষটি, বিয়ের তিন দিন আগে হঠাৎ একদম খেপে উঠল, একেবারে পাগল! দাঁড়াতে পারছে না, মুখ থেকে লালা ঝরছে। বাড়িতে তো কান্নাকাটি পড়ে গেল। ভেঙে দেওয়া হল বিয়ে সঙ্গে সঙ্গে, সেই থেকেই তো বড়খোকা উন্মাদ। আমার শুরু থেকেই মনে আশঙ্কা ছিল—এত লোকজন দেখে, হইহট্টগোলে ছোটখোকাও না বিগড়ে যায় ! ঘটলও তাই।"

"নতুন বউয়ের মুখের অবস্থা যা হল—দেখার মতো," বলল হেনা।

"তুমিই তো মানতে চাও না ছোটখোকারও মাথায় ছিট আছে," বলে উঠল প্রতিমা।

অমনি রেগে উঠল যমুনা, "থাক, অনেক রাত হয়েছে। সব খেতে বসবে—চটপট হাত চালাও। স্যালাড বানিয়েছিস হেনা? জলদি কর।"

যমুনা চলে যাচ্ছে, হেনা বলল, "তুমি শুভঙ্করীকে কিছু বললে না?"

"আমার এত টাইম নেই ফালতু বকার।"

বাসন মেজে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে শুভঙ্করী যখন একতলায় নামল তখন নিশুত রাত। দোতলায় একটা লোকও জেগে নেই, যে যেখানে জায়গা পেয়েছে শুয়ে পড়েছে। বাড়িটা বিশাল। বিয়ের আগের দিন থেকে এসে পড়া জনাপনেরো-আত্মীয়স্বজনকে থাকতে দেওয়া, শুতে দেওয়া নিয়ে কোনও সমস্যাই হয়নি।

আলোটালো নিভিয়ে সে একতলায় নামল। বীভৎস গরম, গায়ে আঁচল রাখা যাচ্ছে না এমন। একটু গা না ধুলে চলবে না। দারোয়ানের ঘরে ছোট একটা বালব জ্বলছে, বাকি পুরো বাড়িটা অন্ধকার। একতলায় তাদের ঘরের দরজা ভেজানো রয়েছে, সে এসে দোর দেবে। শুভঙ্করী ঘরে ঢুকে ব্যাগ খুলে একটা শাড়ি বের করল শুধু। পিছনের দিকের ঘর, একটু গুমোট ধরনের যদিও সাঁই সাঁই পাখা ঘুরছে। এখন তো এসে শুধু শুয়ে পড়া, সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার আর কে পরে! অঘোরে ঘুমোচ্ছে প্রতিমা আর হেনা, ফঁৎ ফঁৎ নাক ডাকছে প্রতিমাদি —সবার তুলনায় হাড়ভাঙা পরিশ্রমটা ওই করে, তাতে শুভঙ্করীর অবশ কিছু যায় আসে না। গায়ে পড়ে প্রতিমাকে সাহায্য করবে তেমন মেয়ে সে নয়।

ভাল করে গা ধুল সে। তারপর শরীরটা না মুছেই কাপড় জড়িয়ে বেরিয়ে এল। ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে হঠাৎ একটা ছায়া নড়ে উঠল সিঁড়ির ওপর। সে চমকে উঠল, আঁতকে উঠল ভয়ে। কিন্তু তেমন ভয়ডরও তার নেই বলে, শ্যাওড়া গাছে অনেকবার পেতনিকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখেছে বলে, আট-দশ হাত দূর থেকে বাচ্চা মুখে তুলে লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছে বাঘ স্বচক্ষে দেখেছে বলেই হয়তো ভয় কাটিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করল ছায়াটা কার। অত ডাঁটো লম্বা চেহারার কে আছে এখন বাড়িতে? অস্ফুটে বলল শুভঙ্করী, "কে গো?"

ধীর পায়ে আরও দুটো সিড়ি নেমে এল ছায়ামূর্তি—আর অন্ধকারে চোখ সইয়ে সে দেখতে পেল—পাগল! বড়খোকা! বাঘের মতো জ্বলজ্বল করছে চোখ আঁধারে। টানটান দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। সে নিজেকেই বলল, "ওমা, ও যে নেমে হাঁটা দিয়েছে। নেপালকাকা কই?"

পাগল আরও নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। শুভঙ্করী আর দেরি করল না—'যা পারে করুক গে' ভেবে টুক করে ঘরে ঢুকে পড়ে খিল তুলে দিল দরজায়। দিয়ে কান পেতে শুনতে লাগল বাইরের শব্দ। মাগো, এ তো বদ্ধ পাগল দেখেছে যা বার তিন-চার এই এক মাসে! শান্ত হয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন উন্মত্ত হয়ে উঠবে ঠিক নেই। সেই জন্যেই তো সব সময় কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়ে পাগলকে আটকে রাখা হয়। স্নান করাতে, খাওয়াতে সেখানে একমাত্র যে যায় সে নেপালকাকা, আর কারও সাহস হবে না পাগলকে ছুঁতে। কিন্তু এ গেট খোলা পেল কী করে? নিশ্চয়ই বিয়েবাড়ির গন্ডগোলে গেটে তালা দিতে ভুলে গিয়েছে নেপালকাকাই! বা তালাটা ঠিকমতো আঁটেনি। সন্ধের পর থেকে নেপালকাকার একটু নেশা করা স্বভাব। অন্য দিন যমুনা একবার সরেজমিনে দেখে আসে সব কিছু—আজ হাজার ফ্যাচাঙে ভুলে গিয়েছে, পেরে ওঠেনি।

কেমন ধারা পাগল বাবা মানুষটা—মাঝে মাঝে মাঝ রাতে গান গেয়ে ওঠে বড়খোকা। তেমন গানের মাথামুন্ড বোঝে না শুভঙ্করী। কথা আছে কি নেই, শুধু গলা কাঁপানো; কিন্তু শুনলে মনে হয় ঝড়ের মুখে পড়ে উলটে যাচ্ছে বড় বড় গাছ, উড়ে যাচ্ছে পাখির বাসা, নদী নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছে প্রবাহে। কেমন হু হু করে মনটা যেন, মাথা খারাপ খারাপ লাগে। অন্যরা কেউ শুনতে পায় কি না কে জানে! নিঃস্তব্ধ রাতে শুয়ে শুয়ে স্বামীর অন্যায়ের ওপর চোখের জল ফেলে যে, সে শোনে ঠিকই। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই, পাগলের হাড়হিম করা হাসি নেই, লোকজনের জেগে ওঠার শব্দ নেই। সে ভাবল, কী করবে। শুয়ে পড়বে, নাকি বেরিয়ে দেখবে ব্যাপারখানা একবার। দেখবার নেশা তার খুব। অতএব সে শাড়িটাকে ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে এল বাইরে, নিঃশব্দে। নাহ্, কেউ কোথাও নেই! —সে দু'-এক পা এগোল, গাড়ি বারান্দার দিকের বাড়ির মূল দরজা বন্ধ। পাগল বাড়ির বার হতে পারেনি অবশ্যই। তা হলে কি উঠে গেল আবার ওপরে? শুভঙ্করী অসীম কৌতূহলবশত উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। দোতলা পর্যন্ত উঠল, থামল, শঙ্কিত বোধ করল একটু, ফিরে যাবে ভাবল, কিন্তু পারল না—আবার উঠতে লাগল। তিনতলার কোলাপসিবল গেট হাট করে খোলা, বড়খোকার ঘর অন্ধকার, প্যাসেজটা অন্ধকার, কোথা থেকে সামান্য আলো এসে চকচক করছে শ্বেতপাথরের মেঝে।

এইখানে পৌঁছে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারত শুভঙ্করী নামের মেয়েটা— কিন্তু স্বভাব—সে উঠে গেল তিনতলায়, দরজা ঠেলল। আর কোনও শব্দ নেই? ওই মানুষের নিশ্বাস পড়ার শব্দ...? সে ঝুঁকে পড়ল খাটের দিকে।

আর তাকে লম্বা দুটো হাতের বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল কেউ পিছন থেকে। পরম নির্জন সেই জড়িয়ে ধরা, কিন্তু শক্ত বাঁধন। মুখ ঘোরাল শুভঙ্করী— বড়খোকা! তার নিতম্বে বিঁধে যেতে চাইছে পুরুষের লাঙল। বড়খোকা আস্তে আস্তে পিঠে মুখ ঘষছে তার। 'মা গো!' বলে উঠল সে। বুক ধকধক করছে ভীষণ। ভয় হচ্ছে আঁচড়ে কামড়ে দেবে কিংবা দিল হয়তো গলা টিপে! কিন্তু ও মা, মনের ভয়কে কলা দেখিয়ে শরীর তার এক ভয়ানক বস্তু। সে শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল পাগলের স্পর্শে। পিঠের আঁচল গুটিয়ে গেল। শাড়ি খসে পড়ল, কোমরের কাছে টিকে রইল শুধু গিট বাঁধা অংশটা। বড়খোকা তাকে ফিরিয়ে নিল নিজের দিকে, খেলতে লাগল দুধকুঁড়ি নিয়ে, ঠোঁট খুঁজে চেপে ধরল নিজের ঠোঁট। সময়ের কোনও জ্ঞান রইল না শুভঙ্করীর, সে টের পেল বড়খোকা পথ হাতড়াচ্ছে। সে থাকতে পারল না, পথ বাতলে দিল।

তারপর মাথার ভিতর পাক খেতে লাগল তার একটাই শব্দ সুখ, সুখ, সুখ—আহ্, বড় সুখ! এই সুখ যে শরীরে থাকে তা সে কোনও মাটির দলা বয়েস থেকে জানে; কিন্তু দীর্ঘ উপোসের পর, দীর্ঘ তাড়না, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এই পাগল এক দূত হয়ে ঢুকে এল তার শরীরে, বোধহয় আবার চিনিয়ে দিতে যে, এই সুখ কী মর্মান্তিক! দুলে দুলে উঠতে লাগল তার স্তন কর্তব্যক্রিকিন্তু তার খিদে মেটার আগেই উপুড় হয়ে গেল পাগল তার মধ্যে। গোঙানির শব্দ বেরোতে লাগল মুখ থেকে। শুভঙ্করী নিজেই তখন উন্মাদপ্রায়। আর একটু কাঠিন্যের প্রত্যাশায় সে ঝাঁকাতে লাগল লোকটাকে এবং সামান্য যেটুকু চেতনা ছিল তখনও তাতেই হঠাৎ মনে হল শুভঙ্করীর, খোলা দরজাটা কেউ বন্ধ করে দিচ্ছে টেনে, নিঃশব্দে! কাচের চুড়ির আওয়াজ পেল সে। যমুনা?

সে যেমন মেয়ে—ধীরেসুস্থে উঠল কিছুক্ষণ পরে, শাড়ি জড়াল গায়ে। দরজা টানতেই খুলে গেল। সে নামল দোতলায়। অন্ধকারে কাচের চুড়ির শব্দ আবার। শুভঙ্করী শুনল যমুনার চাপা স্বর, "খবরদার, দিনেরবেলায় যেন একদম বেশি ঘেঁষতে না দেখি শুভঙ্করী। খুব সাহস হয়েছে না তোর?"

সে উত্তর দিল না, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল, তখনও টনটন করছে তার শরীরের এক টুকরো জমি।

পরের দিন— বউভাত! ভোর থেকে কর্মতৎপরতা বাড়িতে। উৎসবের প্রস্তুতি। বিরাট বড় ছাদ— সেখানেই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়েছে। হলঘর সাজানো হচ্ছে ফুল দিয়ে। জোড়া সিংহাসন এসেছে বর-কনে বসার জন্যে। ফুলের গেট বসানো হচ্ছে বাইরে। ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে বাড়ির কম্পাউন্ডের ভিতর, লাগানো হচ্ছে ঝাড়বাতি। ক্যাটারারদের বিরাট বিরাট কড়াই, ডেকচি, বারকোশ, ড্রাম, হাতা, খুন্তি তোলা হচ্ছে ছাদে। আজ আর প্রতিমাদিকে রান্নাবান্না করতে হবে না। ওর শুধু চা, কফির দায়িত্ব। শুভঙ্করীকে যমুনার হুকুম, নতুন বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। তাই থাকছে সে কিন্তু কঙ্কাবতীর তেমন কোনও দাবিদাওয়া নেই। তাকে দেখাচ্ছে সামান্য অন্যমনস্ক, উতলা। কেন কে জানে?

বেলা বাড়তে বাড়তে বাড়ির সবার মধ্যে বইতে লাগল একটা চাপা উত্তেজনার স্রোত। ছোটখোকা সকাল থেকে ঘরের বাইরে বেরোচ্ছে না। ভিতর থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ, গান শুনছে ছোটখোকা। যমুনা, মামাবাবু, গিন্নি কারও বলায় কাজ হয়নি। সামনেই ডাকাডাকি করছে সবাই—কিন্তু কোনও ফল হচ্ছে না। অথচ জানলা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলেটা। যেন দিব্যি খুশি মেজাজ! একটা সময় পর মামাবাবু সবাইকে বললেন, "ছেড়ে দাও। যখন মতি বদলাবে বেরোবে।"

কারও মনেই-লিনেই আর, ভ্রূ কুঞ্চিত, কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। গিন্নি শুয়ে পড়েছেন নিজের ঘরে। কঙ্কাবতী এক-দু' বার এসে ঘুরে গিয়েছে বন্ধ দরজার সামনে থেকে। ভাত-কাপড়ের অনুষ্ঠান সব বাতিল হয়ে গেল। কেউ শত সাধ্যসাধনা করেও খাওয়াতে পারল না নতুন বউকে। দু'চোখ ভরা বিস্ময় বেদনা নিয়ে সে তাকাতে লাগল সকলের মুখের দিকে। বলল, "আমার বাবা-মা কখন আসবে?"

বিকেল হতে হতে বাজতে লাগল সানাইয়ের সুর। খুব মৃদুভাবে, যেন ভয়ে ভয়ে। উৎসবের বাড়ি চুপসে গিয়েছে। কঙ্কাবতীকে শাড়ি, গয়না, ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে গেল বিউটি পার্লারের দুটো মেয়ে। কার পরামর্শে কে জানে, একটা সিংহাসন সরিয়ে নেওয়া হল, অন্যটায় বসানো হল কঙ্কাবতীকে। লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে। মামাবাবু পরিবারের অন্য পুরুষদের নিয়ে তাদের তদারকিতে ব্যস্ত। গিন্নি মোটে বেরোচ্ছেনই না ঘর থেকে। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। হাসিঠাট্টা করার চেষ্টা করছে কেউ কেউ কিন্তু জমছে না। বড় বড় ঝাড়বাতির আলোতেও ম্লান দেখাচ্ছে পরিবেশটা। যারা এসেই খোঁজ করছে শুভেন্দুর মানে বরের, তাদের তাড়াহুড়ো করে খেতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খুব নিকটজনদের কানে কানে বলা হচ্ছে, 'ছোটখোকার শরীরটা ভাল নেই, ডাক্তার শুয়ে থাকতে বলেছে।' শুভঙ্করী সেই তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে নতুন বউয়ের পাশটিতে। হাত থেকে উপহারসামগ্রী নিয়ে সরিয়ে রাখছে। আচমকা সে-ই দেখল বসে থাকতে থাকতে চোখ বুজে ফেলল কঙ্কাবতী। তারপর ঢলে পড়ল নিজের কোলের ওপর। তাড়াতাড়ি ছোট মেসোমশাই কঙ্কাবতীকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেলেন ঘরে। কারা ছোটখোকার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল, 'ছোটখোকা, শিগগিরি খোল, তোর বউ অজ্ঞান হয়ে গেছে!' ছোটখোকা নিরুত্তর। তারস্বরে গান বাজছে তখনও।

এরই মধ্যে হইহই করে ঢুকে এল কনেযাত্রীর দল। ডাক্তার এসে পৌঁছানোর আগেই জ্ঞান ফিরে এল কঙ্কাবতীর। মা আসেনি মেয়েটার, বাবা এসেছে, মাসিরা এসেছে। কঙ্কাবতী একবার বাবাকে, একবার মাসিদের জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। দ্রুত হাতে খুলে ফেলতে লাগল ফুলের মুকুট, মালা, সোনাদানা সব। সে থাকবে না এখানে, এখনই বাড়ি চলে যাবে। দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল কনের আত্মীয়স্বজন। একদল বলল, তাই তোক, ভুল হয়ে গিয়েছে বিয়েটা, সেটা টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কী! এখনই ফয়সালা হয়ে যাক, এখনই ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাক। কিন্তু বউয়ের বাবা বারবার অসহায়ের মতো উলটো কথা বলতে লাগলেন। এম এ পাশ করা ছেলে, দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক। পারিবারিক ব্যাবসা দেখাশোনা করছে পাঁচ-সাত বছর ধরে, গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সে অমনি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে? হয়েছে কিছু একটা, যা হোক—ঠিক হয়ে যাবে সব। বিয়ে দিয়েছেন যথাসাধ্য খরচ করে—এখন তিনি মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবেন? তা আর হয় না। বউভাতের রাতেই যদি মেয়ে নিয়ে ফিরে যান তিনি, তা হলে মানসম্মান ধুলোয় মিশে যাবে না তাঁর? আর তা ছাড়া বিবাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, একটা বন্ধন, স্বামী একদিন অসুস্থ হলেই স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে চলে যাবে? এ কি একটা কথা? অনেক কান্নাকাটি করেও ফল হল না যখন, কঙ্কাবতী চুপ করে গেল। কনেযাত্রীরা কেউ-ই কিছু খেল না। আট-দশটা তত্ত্বের ট্রে বেওয়ারিশ মালের মতো পড়ে রইল একটা ফাঁকা ঘরে। চলে গেল সবাই! কঙ্কাবতীর বাবা বলে গেলেন, কালই আসবেন আবার।

ছোটখোকার ঘর থেকে তারও অনেক পরে গান বন্ধ হল। ক্লান্তিতে তখন ভেঙে আসছে শুভঙ্করীর শরীর। হেনা আর সে একসঙ্গে নামল নীচে। শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল আজ শুভঙ্করী। সে এমনকী টেরও পেল না আজই

প্রথম উপেন গুছাইতকে একবারও মনে পড়েনি তার। নিজের অজান্তেই অন্যের সংসারের, অন্যের জীবনের অংশীদার হয়ে পড়ছে সে। নিজের দুঃখ, কষ্ট এইভাবে ক্রমশ পার হয়ে যাচ্ছে শুভঙ্করী। এমনকী এখানেই, এই অনাত্মীয় বাড়ির ভিতরই, নতুন করে গড়ে উঠছে তারও নিজস্ব একটা জীবন। তার চেনা জীবনের মূল স্রোত থেকে হঠাৎই জল যেন বেরিয়ে এসে বইতে শুরু করেছে একটা নতুন খাতে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে গিয়ে ঢুকছে কঙ্কাবতীর ঘরে, তারই বয়েসি মেয়েটার বিষণ্ণ মুখের দিকে অনেক অনুকম্পা নিয়ে তাকিয়ে থাকছে।

দিদির মনটা আজ ভীষণ খুশি খুশি। প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে হলের সোফায় চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকে নাতাশা— দেখে মনে হয় দিনটাকে শুরু করতে দিদির মনে অনেক দ্বিধা, অনেক সংশয়। সীতার তখন সাংসারিক খুঁটিনাটি বিষয়ে কথা বলতে ভয়ই করে একরকম। চায়ের ট্রে কাচের টেবিলে নামিয়ে রেখে চুপচাপ সরে যায় সে। আজ দিদি ঘুম থেকে উঠেই হুটোপাটি করে খেলছে জুরার সঙ্গে। এই মুহূর্তে জুরাকে কোলে নিয়ে দিদি দক্ষিণের বারান্দায়। বেশ একটু কথা ফুটেছে বাচ্চাটার মুখে। সামনের পলাশ গাছটায় বসে মুহুর্মুহু ডাকছে একটা কোকিল। কী তীব্রভাবে ডাকছে। মা গো, মে মাস শেষ হয়ে জুন মাস পড়ে গেল—এখন আবার কোকিল ডাকে? কিন্তু ডাকছে তো? যেমন পলাশ গাছটা এখনও ফুল দিচ্ছে দুটো-চারটে।

কোকিলের ডাক শুনেই দিদি বারান্দায় গিয়েছে জুরাকে নিয়ে। কোকিলটাকে খুঁজে বের করে দেখাচ্ছে। যতবার কোকিল ডাকছে, জুরা বলছে ‘আবাল বলো! কোকিলটাকেই বলছে জুরা কথাটা।

সে আর হেসে বাঁচে না। দিদি ডাকল তাকেও, ডাকার সময় লেজটা কেমন বারবার তুলছে কোকিলটা সেটা দেখাবার জন্যে। সে গিয়ে দাঁড়াতেই নীচে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল পুতুলকে। পুতুলও তাদের দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে জানতে চাইল, “কোথায় যাচ্ছিস?”

“লন্ড্রি,” পুতুলের হাতে একটা বড় চটের ব্যাগ, “তারপর একটু বাজার করব!” পুতুল হাত নাড়ছে জুরাকে। অমনি লাফাতে লাগল জুরা, তাই দেখে পুতুল বলল, “দাঁড়া আসছি, আসছি বাব্বা!” সে দরজা খুলে দিল, ঝাঁপিয়ে চলে গেল পুতুলের কোলে জুরা। দিদি এসে বসল সোফায়, এবার আর এক কাপ চা চাই দিদির। চা করতে করতে সে শুনল নাতাশা প্রশ্ন করছে বোনকে, “কী রে, তোর কেমন লাগছে ওদের?”

পুতুল বলল, “খুব মজার বাড়ি গো! অর্ক তো রাতদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে ড্রাম পেটাচ্ছে। বন্ধুবান্ধবরা আসছে যখন-তখন, গানবাজনা করছে, ওরা তো গানের দল খুলেছে একটা; কী একটা খটোমটো নাম সেই দলের। কাল আবার একজন বাউলকে ধরে এনেছিল অর্ক। সে নাকি গাইবে ওদের সঙ্গে।

“আর মেয়েটা?” দিদির দেখা যাচ্ছে খুব আগ্রহ।

“তার কথা আর বোলো না। আলমারি হাট করে খুলে ফেলে যত জামাকাপড় সব বার করে ফেলছে। তার মধ্যে থেকে একটা পরছে, আবার পছন্দ হচ্ছে না, খুলে ফেলছে। দিনের মধ্যে তিনবার এই কাণ্ড! জামাকাপড় গুছিয়ে, ইস্ত্রি করে কূল করতে পারি না। একটা মানুষের এত জামাও লাগে? কলেজে যাবে একরকম, বন্ধুদের সঙ্গে কফি খেতে যাবে আর একরকম, রাতে পার্টিতে যাবে আর একরকম। মামা নতুন ফোন কিনে দিয়েছে মেয়েকে, রাতদিন কানে ফোন, মামি তো তাই নিয়ে চেঁচাচ্ছে খুব। পড়াশুনো করে না, শুধু ফোনে গল্প করে। দিদা আবার নাতনিকে বকলে রেগে যায়, ফুলটুসিকে কিচ্ছুটি বলা যাবে না। এই নিয়ে মামার সঙ্গে মামির,

মামির সঙ্গে দিদার ঝগড়া। কিন্তু দুই ভাইবোনের তাতে বয়েই গেল—তারা তাদের মতো যা ইচ্ছে তাই করছে।”

বিমলাদি এই পাশের রাস্তাতেই কাজ খুঁজে দিয়েছে পুতুলকে। দিন দশেক হল পুতুল গিয়ে ঢুকেছে ওই বাড়িতে। বড় তিনতলা বাড়ি। আরও চাকরবাকর আছে। পুতুলের তেমন ভারী কাজ কিছু নেই। ওই যাকে বলে ফাইফরমাশ খাটা। ছুটে গিয়ে এটা-সেটা এনে দেওয়া।

প্রথম প্রথম দূরে দূরেই পাঠাতে চেয়েছিল সীতা বোনকে। দিদি তাই বলেছিল কিন্তু ক'দিন আগে ভবানী ফোন করেছিল, “আপদ বিদেয় হয়েছে। সমর আর বিনয় একটা পুরনো খুনের মামলায় জেলে চলে গেছে হঠাৎ আর নান্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলছে নান্টু গুমখুন হয়েছে, কেউ বলছে ফেরার। গত ইলেকশনে সুখময় তালুকদারকে জেতানোর পর থেকে বড্ড বাড় বেড়েছিল বিনয়দের।” মাঝখান থেকে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছে ভবানী। পুতুলকে মা ফিরে আসতেই বলছিল। সেই এস আইকে জিজ্ঞেস করে এসেছে মা—এখন আর গ্রামে ফিরতে কোনও বাধা নেই পুতুলের। কিন্তু পুতুল নিজেই বাতিল করে দিল সেই প্রস্তাব। গ্রাম তাকে আর টানছে না । দেড় মাসেই মায়া কাটিয়ে ফেলেছে বোন তার। শিবনাথের নৃশংস আঁচড়-কামড়ের দাগও মিলিয়ে গিয়েছে ধীরে ধীরে। দিদিকে পুতুল বলেছে, “তুমি কষ্টে ভুগো না দিদি। তুমি কী করবে? চারদিকে কত খারাপ লোক, কাকে কাকে জেলে ভরবে তুমি? এই যে পুলককে আমার চোখের সামনে মেরে ফেলল, আমি তো নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে এসেছি। এখন আমাকে কেউ সাক্ষী মানলে আমি তো বলব দেখিনি, জানি না।”

বিমলাদির হাতে এই কাজটা ছিল। পুতুল যেতেই পছন্দ হয়ে গেল ওদের পুতুলকে। একটু মিথ্যে বলতে হল অবশ্য, মিথ্যেও না ঠিক—জোর করে, আগ বাড়িয়ে আর বলা হল না যে, পুতুলের বিয়ে হয়েছিল, এখন ও বিধবা। আর পাঁচটা কুমারী মেয়ের মতো চুলে শ্যাম্পু করে দিদির দেওয়া একটা সালোয়ার-কামিজ পরে, কপালে টিপ, নাকে নাকছাবি পরে সেজেগুজেই গিয়েছিল পুতুল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফরসা রং, ঢলঢলে চোখমুখ—ওদের মনে ধরে গেল ওকে। সীতার সামনেই দিদা বলল, “ও মা! কী মিষ্টি মেয়ে রে! এ তো বাড়ির লোকের মধ্যে দিব্যি মিলেমিশে যাবে!”

মামি বলল, “আমি তো তাই চাই মা। সব সময় চোখের সামনে ঘুরবে ফিরবে, একটু ঠিকঠাক না হলে চলে? ঘেমো চেহারা, ময়লা নখ এসব দেখলে বড্ড অস্বস্তি হয়! এক-একজন যা নোংরা হয়—যতই সাবান দাও, যতই শ্যাম্পু দাও কিছুতেই স্বভাব বদলাবে না। দেবী ছিল না, মা? এই নাক খুঁটছে, এই গা চুলকাচ্ছে, ফাটা ফাটা হাত-পা। কত বলতাম বেশি করে গুড়ো সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচ, কিন্তু যে কে সেই, যে তেলচিটে সেই তেলচিটে!”

পুতুল বেশ ভালই আছে। রাতে ও ফুলটুসির ঘরের মেঝেতে শোয় বিছানা করে। ফুলটুসিকে এ পাড়ায় কে চেনে না? যেমনি সুন্দর দেখতে তেমনি হাসিখুশি। হনুমান মন্দিরের উলটো দিকে লেক রোড় সর্বজনীনের দুর্গোৎসবে ফুলটুসিকে বিসর্জনের বাজনার তালে তালে নাচতে দেখেছে সীতা বেশ কয়েকবার। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, লাল পাড় শাড়ি পরে কোমর দুলিয়ে নাচছে—সবাই হাঁ করে দেখছে ফুলটুসিকেই। কিংবা এই জিনসের প্যান্ট আর টাইট গেঞ্জি পরে বয়ফ্রেন্ডের বাইকের পিছনে বসে উড়ে চলে গেল। আর একটা বয়ফ্রেন্ড? এ বেলা ওবেলা নতুন নতুন। কিন্তু ফুলটুসি এত মিষ্টি মেয়ে যে, কেউ তাতে দোষ দেখে না!

ফুলটুসির সেই সুন্দর স্বভাবের আঁচ লেগেছে যেন পুতুলের গায়ে। পুতুলকে দেখছে সীতা, ফুলটুসির একটা ঘেরের স্কার্ট আর টপ পরেছে পুতুল। চুলটা চুড়ো করে বেঁধেছে ক্লিপ দিয়ে। এই সকালে ঝকঝক করছে চোখমুখ। ভারী বুক দুটো পরিস্ফুট হয়ে আছে, হাসলে দুলে উঠছে, তাতে কোনও সংকোচ নেই পুতুলের। নাতাশাকে বলেই চলেছে ও ও বাড়ির গল্প। কেমন অনেক রাত অবদি গল্প হয় পুতুল আর ফুলটুসির, দু'জনে জেগে জেগে সিনেমা দেখে, ফুলটুসি লুকিয়ে সিগারেট খায়, কেউ জানে না । জানে কেবল পুতুল। এত বড় মেয়ে, বাইশ বছর বয়েস, এখনও বাবার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, বাবার কোলে গিয়ে বসে! —পুতুল কথা বলছে, সীতার মনে হচ্ছে পুতুলই ফুলটুসি হয়ে গিয়েছে কেমন যেন। স্কার্ট ঘুরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ ঘর, ও ঘর। ব্যালকনিতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে ঝুঁকিয়ে দিল শরীরটা, অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলোর সঙ্গে খুনসুটি করল একটু, তারপর শহুরে মেয়েদের মতো জুরাকে 'বাই বাই' করে চলে গেল। চলে গেল যেন একটা একঝলক হালকা ফুলকা বাতাসের মতো। রক্তাক্ত স্বামী, উদ্‌ভ্রান্তের মতো পলায়ন, ধর্ষিত হতে হতে বেঁচে যাওয়া— এইসব দুর্ঘটনার হাত থেকে, ভয়াল থাবা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে ও। কিছুর প্রতি, কারও প্রতি ওর এখন কোনও অভিযোগ নেই, কোনও আক্রোশ নেই। সদ্য বাল্যকাল উত্তীর্ণ এক সরল মেয়ে যেন পুতুল। কুরুচিকর জীবনের অভিজ্ঞতা যাকে ছোঁয়ইনি যেন কখনও। উচ্ছল, প্রাণবন্ত একটা অন্য মেয়ে।

যেতে যেতে পুতুল বলে গেল, কাল রবিবার, ও বাড়ির সবাই বারুইপুরের কোনও বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে যাচ্ছে আরও বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সহযোগে। যাচ্ছে পুতুলও। অতএব কাল সীতার সঙ্গে পুতুলের দেখা হবে না ।

অফিসে বেরোবে দিদি, উঠে স্নান করতে গেল। দুধ, কর্নফ্লেক্স, কলা, পোচ খাবে দিদি ব্রেকফাস্টে। বেরিয়ে জামাকাপড় পরবে যতক্ষণে, ততক্ষণে সীতার পোচ বানানো হয়েও বেশি। সে জুরাকে নিয়ে সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়াল। দেখল তুলতুলি পাশের পানের দোকান থেকে দুটো বড় বোতল কোল্ডড্রিঙ্ক কিনে গাড়িতে তুলল, তারপর চলে গেল। অনেক দিন পর দেখল সীতা তুলতুলিকে। এখন তুলতুলি অন্য মানুষ। সেই পাগলি পাগলি ভাবটা আর নেই। তুলতুলির বর এখন আর সারা বছর জাহাজে জাহাজে ঘোরে না। সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন বাড়িতেই কী একটা ব্যাবসা খুলে বসেছে। তুলতুলি এখন ঘোর সংসারী। বাচ্চা হয়নি ঠিকই তবু তুলতুলিকে অনেক সংযত, শান্ত দেখায়। মুখোমুখি পড়ে গেলে দুজনের কেউই আজও কথা বলে না, তবে একদিন আত্মীয়-পরিজনহীন শহরের রাস্তায় পিচ গলা গরমের মধ্যে অভুক্ত তাকে বের করে দিয়েছিল বলে সীতার তেমন কোনও বিদ্বেষ নেই তুলতুলির ওপর। সে এখন পাঁচ বাড়ি ঘোরা কাজের মেয়ে —জানে কিছুই আটকায় না কারও জন্যে, চলে যায় ঠিক মানুষের।

শুধু একটা প্রশ্ন নিজেকে অবাক হয়ে করল সীতা আজ—সে কেন কখনও পুতুলের মতো হেসে উঠতে পারল না? কেন হাসতে গেলেই তার মনে হয় হাসার সময় এখনও আসেনি?

দিদির মেজাজটা এত খুশি খুশি কেন তা বোঝা গেল একটু পরেই। বেরোনোর সময় দিদি বলল, "শোন, আজ আমার জন্মদিন! আজ অভী আমাকে আর জুরাকে ডিনার খেতে নিয়ে যাবে। তোর জন্যেও খাবার নিয়ে আসব, একটু রাত হয়ে যাবে হয়তো, কিন্তু তুই আজ আর রাতের জন্যে কিছু রান্নাবান্না করিস না সীতা, কেমন?"

সীতা বলল, "দিদি আজ তোমার জন্মদিন? তুমি বলোনি তো?"

"ধ্যাৎ, ও আবার বলার কী আছে? আমারই মনে ছিল না," নাতাশার চোখেমুখে অগাধ আনন্দ ফুটে উঠল, "মনে রেখেছে অভীই! সত্যি! কাল রাতে যখন ফোন করে উইশ করল তখন আমি অবাক! যাই হোক, আমি আজ সাতটার মধ্যেই ফিরে আসব। অভীও আসবে, তারপর রেডি হয়ে বেরোব!" দিদি চোখ মারল তাকে, "খুব সাজব আজ!"

এখন বেশ কিছুক্ষণ জুরা ঘ্যানঘ্যান করবে, অনেক খেলাটেলা দিয়ে ভোলাতে হবে ওকে। ব্যালকনি থেকে দিদিকে টা-টা করতে করতে সীতা মনে মনে ঠিক করল, চারটে নাগাদ বেরিয়ে একটু বেশি করে দুধ নিয়ে আসবে, চমকে দেবে নাতাশাকে পায়েস বানিয়ে। দিদির জন্যে কিছু করতে পারলে তার মনটা খুশিতে ভরে যাবে। সে জানে দিদির কেউ নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, স্বামী নেই—শুধু জুরা আছে! দিদিকে মুখ ফুটে বলতে পারবে না সে কখনও, কিন্তু তার বলতে ইচ্ছে করে, "আমিও আছি দিদি। তোমার সুখে দুঃখে আমিও আছি।" সে ভাবে, "আমার মতো কাজের মেয়ে তুমি অনেক পেয়ে যাবে দিদি, কিন্তু তোমার মতো ভাল দিদি আমি আগে কখনও পাইনি, আর পেতেও চাই না।" শুধু তার একটাই ভয়—দিদির কখন মন হবে, বিদেশ চলে যাবে জুরাকে নিয়ে। এই নিশ্চিন্ত সময়ে যত দিন যাচ্ছে ভয়টা বেড়েই চলছে তার মনে।

ফ্রিজ থেকে মাছ বের করছে সীতা। জুরা মাছ ভাজা খেতে খুব ভালবাসে, ওর জন্যে দু'টুকরো, তার নিজের এক টুকরো। দরজায় বেলের শব্দ পেয়ে প্যাকেটটা কিচেনে রেখে এসে আই হোল দিয়ে দেখল সে, কে! শিবনাথের ঘটনার পর আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছে সীতা। চোখের সামনে লোকটাকে দেখলেই ভয়ে আর ঘেন্নায় সিঁটিয়ে যায় সে। এদিকে দিদির ড্রাইভার ছেলেটা, নিত্যপ্রিয়—কী ভাল, মুখচোরা, লাজুক। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে আর পড়তে পারেনি টাকার অভাবে, ড্রাইভারি করছে। চাবি নিতে এসে জীবনে কখনও ফ্ল্যাটের ভিতরে পা রাখে না।

সীতা দেখল ছ'তলার ঠিকে কাজের মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন নাম—লক্ষ্মী! দরজা খুলে দিল সীতা, লক্ষ্মী বলল, "সীতা, একটু আসব ভেতরে?"

লক্ষ্মীর আবার কী দরকার তার সঙ্গে! 'এসো' বলল সে। যেন একটা, বিরাট লড়াই লড়ে এসেছে লক্ষ্মী—এইভাবে ঢুকে এসে ধপ করে বসে পড়ল হলের মেঝেতে। সে বলল, "কী হয়েছে গো?"

"আমাদের বস্তি ভেঙে দিচ্ছে সরকার, কাল পুলিশটুলিশ নিয়ে আসবে, বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেবে, বাধা দিতে গেলে নাকি গুলি চালাবে বলেছে।"

এই অঞ্চলে যারা কাজ করতে আসে তাদের অধিকাংশই থাকে লেক গার্ডেন্সের বস্তিতে। একটা-দুটো লোক? কয়েক হাজার! বস্তি ভেঙে দিলে, ঘর ভেঙে দিলে, তারা সব যাবে কোথায়! বিমলাদিও লেক গার্ডেন্সের বস্তিতে থাকে, তার চেনা অনেকেই তাই থাকে।

সে বুঝতে পারল না লক্ষ্মী তার কাছে কেন এসেছে?

লক্ষ্মীই বলল, "কী যে বিপদে পড়েছি সীতা, কী বলব! কাল আমরা সব হাতা, খুন্তি, কুড়ুল, দা, লাঠিসোটা—যে যা পারব তাই নিয়েই বাধা দেব পুলিশকে, আমাদের 'বস্তি বাচাও' কমিটির নেতারা আমাদের সেটাই করতে বলেছে। আগে থাকবে বাচ্চা আর মেয়েরা, পেছনে বেটাছেলেরা। কিন্তু সবাই বলাবলি করছে পুলিশ

যদি চায়, সরকার যদি চায় তা হলে আমাদের কী ক্ষমতা ওদের আটকাব? গুলিগোলা চললে শেষে প্রাণটাই যাবে!”

লক্ষ্মীর দাঁতগুলো সব ফাঁক ফাঁক, রোগা কালো শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই! শুধু চোখ দুটো বড় বড়, কালো পাতা ঘেরা, কিন্তু সেই চোখ দুটোয় কোনও আশা, ভরসা নেই, সুখদুঃখ নেই। এখনও, এই আশ্রয়চ্যুত হওয়ার বিপদের মধ্যে পড়েও খটখটে শুকনো।

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে লক্ষ্মী, “আমার শাশুড়ি অথর্ব, স্বামী নিরুদ্দেশ আজ কত বছর, ওই অথর্ব শাশুড়িকে আমিই আগলে আগলে রেখেছি। আর সব বাড়িতে মাথার ওপর একটা পুরুষমানুষ আছে, আমার কেউ নেই! এখন কী হবে জানি না, আমি একা বুড়িকে সরাব কোথায়? ওই বুড়িকে সুদ্ধই তো বুলডোজার চাপা দিয়ে চলে যাবে! আর আমিই বা যাব কোথায় বলো সীতা?”

সে চুপচাপ শুনতে লাগল, “ছতলায় বললাম, যে হোক করে বুড়িকে আমি দেশে দিয়ে আসব। তোমরা আমাকে একটু থাকতে দাও। আমি খুব বিশ্বাসী লোক, এত বছর এ পাড়ায় কাজ করছি, কেউ একটা বদনাম দিয়ে কথা বলতে পারবে না। তোমাদের বাড়িতে খাবও না, কিছুই না। রাতটুকু এসে এক কোণে পড়ে থাকব।”

“কী বলল ওরা?”

“না করে দিল! এ পাড়া ছেড়ে দূরে গেলে আমার কাজগুলো থাকবে না সীতা। তোমাদের মতো যদি সুন্দর চেহারা হত, ফরসা রং হত, আমাকে ঠিক বাড়িতে থাকতে দিত ওরা। কিন্তু আমাকে এত খারাপ দেখতে, ওরা তো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাই বলে না!”

শুনতে শুনতে অস্বস্তি হতে লাগল সীতার।

“চিরকালই আমাকে এত কুচ্ছিত দেখতে ছিল না গো সীতা—কী তোমাকে বলব? বেঁটে ছিলাম ঠিকই কিন্তু গড়ন পেটন ভাল ছিল, মাথা ভরতি চুল ছিল। রংটাও এমন কালি মাখানো ছিল না মোটেই। আমার বর তো জোর করে বিয়ে করেছিল আমাকে। এখন দ্যাখো, খাটতে খাটতে হাত-পায়ের অবস্থা কী হয়েছে, হেজেমজে একশা। ও বাড়ির বউদি একটা মলম দিয়েছিল লাগাবার জন্যে, দিনে দু’বার লাগাতে হবে শুকনো হাতে, এক ঘণ্টা হাতে জল লাগানো যাবে না। তাই হয়? ঘাটে ওঠা পর্যন্ত আমার হাতের জল শুকোবে না সীতা। মলম আমি লেকের জলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।”

“তুমি কিছু খেয়েছ লক্ষ্মীদি? কিছু খাবে? জানতে চাইল সে।”

“আজ তো সকাল থেকে কাজে আসতে পারিনি, তিন বাড়ি কাজ কামাই গেল। জলখাবারটাও পেলাম না! ‘বস্তি বাচাও’ কমিটির মিটিং-এ যেতে হয়েছিল। রোজই মিটিং হচ্ছে। সেখানে যেতেই হবে, অত মিটিং করলে কাজ করব কখন? কামাই দিলে কাজ চলে যায়। জানো না তো, পাখার তলায় সুখে আছ, খাচ্ছদাচ্ছ, বিকেলে বেড়াতে বেরোচ্ছ। বড়লোক বাড়ির আয়াদের তো সব দেখি, সেন্ট মাখানো কালি দিয়ে মুখ মুছছে, ঠান্ডা গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার যেমন কপাল। আমি শুধু ভাবি আমি যদি ওরকম একটা কাজ জোটাতে পারতাম!”

“তা হলে তুমি এখন কী করবে?”

“জানি না সীতা, সবাইকেই তো বলছি যদি একটু সিঁড়ির তলায়টলায়ও থাকতে দেয়। একেবারে ভিখিরি ঘরের মেয়ে তো ছিলাম না, বাবার ধানিজমি ছিল কয়েক কাঠা, বসত বাড়ি ছিল, ছোটবেলায় লণ্ঠনের তেল

পুড়িয়েও মা পড়তে বসতে বলত আমাদের। তাই বাক্সবিছানা নিয়ে ফুটপাতে এসে উঠতে একটু বাধছে।"

চারটে পাউরুটি সেঁকে, দুটো মিষ্টি দিয়ে লক্ষ্মীকে খেতে দিল সীতা। খেয়ে আরও কিছুক্ষণ বসে রইল লক্ষ্মী চুপচাপ, মনে হল ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছে। তারপর একসময় উঠে পড়ল। জুরাকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে স্নান করতে ঢুকল সীতা।

বিকেলের দিকে দুধ নিয়ে ফিরে সে যখন যত্নসহকারে পায়েস রাঁধছে তখনই এল ফোনটা, "সীতা বলছ?"

শিক্ষিত, ভদ্র, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর। কে রে বাবা, তাকে খুঁজছে?

"হ্যা বলছি! বলুন?"

"আমি অভীদা!"

"হ্যা অভীদা বলুন!"

"শোনো সীতা, তুমি বাড়িতেই থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি, প্রায় পৌঁছে গেছি! দিদিকে কিছু জানানোর দরকার নেই।"

"বেশ, ঠিক আছে।"

অভীদার গলার স্বরে যে প্রফুল্লতা ছিল তাতেই সীতা ধরে নিল এর মধ্যে দিদিকে চমকে দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। কলকাতায় থাকতে থাকতেই শিখে গিয়েছে সীতা এসব। যাকে কেন্দ্র করে আনন্দ করা সে কিছুই জানল না, সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেল, সে এসে ব্যাপারস্যাপার দেখে যত অবাক, ততই খুশি ! দিদির জন্মদিনে অভীদাও নিশ্চয়ই তেমনই কিছু করতে চাইছে। সীতা উৎসাহান্বিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অভিদার।

হাতে একটা বড় বাক্স, একটা ফুলের বুকে আর প্যাকেটে ভরতি জিনিসপত্র নিয়ে নিমেষে হাজির হল অভীদা। বাক্স আর ফুলটা ডাইনিং টেবিলের ওপর নামিয়েই কোলে তুলে নিল জুরাকে। তারপর কাচের টেবিলের ওপর উপুড় করে দিল প্যাকেটটা। বেলুন ছড়িয়ে পড়ল। অভীদা একদম টগবগ করে ফুটছে।

"তুমি বেলুন ফোলাতে পারো সীতা?"

লজ্জা পেতে লাগল সীতা,"না, আমি পারি না ভাল।"

"চেষ্টা করো, একটা সুতো নিয়ে এসো শিগগিরি, তাড়াতাড়ি করো, নাতাশা এক্ষুনি এসে পড়বে, আমাকে বলল বেরোচ্ছে, তোমার কাছে মোমবাতি আছে? এই যা, ওয়াইনের বটলটা গাড়িতে ফেলে এসেছি।"

জুরাকে নিয়েই চলে গেল অভিদা, ফিরে এল একটা কালো লম্বা বোতল হাতে।

অভীদা একাই একশো, ফটাফট ফুলিয়ে ফেলল বেলুন। গোছা বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে লাগল এ দিক ও দিক। জুরা তো দুটো বেলুন পেয়ে বেজায় খুশি। চেঁচাতে লাগল 'বলুন, বলুন' করে। অভীদার নির্দেশ মতোই একটা মোমবাতি এনে রাখল সীতা। বাক্স থেকে বেরোল ইয়া বড় একটা চকোলেট কেক। সেটাকে সাজানো হল কাচের টেবিলের মাঝখানে। দুটো লম্বা ডাঁটির গ্লাস অভীদাই বের করে আনল কাচের বাসন রাখার শোকেস থেকে।

"সব আলো জ্বেলে দাও সীতা বাড়ির," বলে উঠল অভীদা।

"টয়লেটেরও?"

"আরে না, না! ঘরের, প্যাসেজের," হেসে উঠল মানুষটা হা-হা করে। জুরাও অভিদাকে নকল করে হাসতে লাগল। অভীদা আজকাল প্রায়ই আসে। দেখে দেখে সীতা ভাবে, ইস, কেন যে দিদি নিজের জীবনটাকে নয়ছয় করল! কী লাভ হল তাতে? এই যে অভীদা যেটুকু সময়ের জন্য আসে, হাবভাবই বদলে যায় দিদির, মনে হয় কিশোরী যেন, হেসে গড়িয়ে পড়ছে, গান গেয়ে উঠছে! এই তো সেদিন তাকে বলছিল, "জীবনটাকে একা হাতেই চালানো যায় সীতা যদি মনে হয় পেছনে কেউ আছে, প্রয়োজন পড়লেই সামনে এসে দাঁড়াবে।"

কিন্তু অভীদার তো বউ আছে, দিদির পুরনো অ্যালবামে ছবি দেখেছে সীতা অভীদার বউয়ের, লম্বা চওড়া একটা মেয়ে, ছোট ছোট চুল। খুব স্টাইলিশ দেখতে। মনে হয় বেশ অহংকারী। দিদির মতো সহজ, খোলামেলা, উদার ধরনের নয়। পুরনো ভালবাসার জন্যে অভীদা কি বউকে ছেড়ে দেবে? দিদিকে এসব কথা খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করেছিল সীতা একদিন। দিদি বলল, "দ্যাখ আমি তো কখনও বলব না অভীকে যে পিউকে ছেড়ে আমার কাছে এসো! তা আমি বলতে পারি না। এদের মধ্যেই এমনিই অনেক কারণে বনিবনার অভাব, ভাঙলে সেই জন্যেও ভাঙতে পারে বিয়েটা। ভাঙবে কি ভাঙবে না সেই সিদ্ধান্ত অভীকেই নিতে হবে।"

খুব ভাল হত দিদির সঙ্গে অভীদার যদি শুধু একটা বন্ধুত্বের সম্পর্কই থাকত। যদি আবার না জেগে উঠত পুরনো প্রেম। দিদিকে মাঝে মাঝে খুব বোকা বলে মনে হয় সীতার। নিজের সন্তানের যে পিতা তাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল না, সহজেই যেতে দিল। আর এখন অন্যের স্বামী, তার আসার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে, ঘর-বার করে, আয়নার সামনে দাঁড়ায় বারবার গিয়ে, চুল ঠিক করে, অপটু হাতে কেক বানাতে চেষ্টা করে, চিংড়িমাছের মালাইকারি রাঁধতে চায় আর অভীদার কোলে জুরাকে দেখে অভিব্যক্তি থেকে ঝরে পড়ে সার্থকতা!

এমা, আজ এই শুভদিনে এসব কী ভাবছে সীতা? পায়েসটা এতক্ষণে জুড়িয়ে গিয়েছে। সীতা সেটা তাড়াতাড়ি ফ্রিজে চালান করে দিল। তারপর একে একে জ্বালিয়ে দিল সব ঘরের আলো। ঝলমল করে উঠল বাড়িটা। সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছে, এই এসে পড়ল বলে দিদি! ভাবামাত্রই বেল বেজে উঠল দরজায়, অভীদা ঝট করে সরে গেল ব্যালকনির দরজার পিছনে। সীতা দরজা খুলে ধরল, দিদি ঢুকতে ঢুকতে গলা তুলে বলল, "অ্যাই অভী, কোনও সারপ্রাইজ-টারপ্রাইজ নয়, বেরিয়ে এসো শিগগিরি!"

"এমা, তুমি কী করে বুঝলে?" হতাশ বেরিয়ে এল অভীদা।

"খুব চালাক না? আমি জুরার জন্যে একটা চকোলেট কিনতে ও দিকটা গিয়ে দেখি তোমার হাতির মতো গাড়িটা! সেটাকে একটু লুকিয়ে রাখতে পারোনি, বুদ্ধু কোথাকার!"

অভীদা বসে পড়ল সোফায়, "যা, সব পরিশ্রম মাঠে মারা গেল!"

দিদি অভীদার খাড়া নাকটা ধরে নেড়ে দিল, "তা কেন? সব তো আমারই জন্যে... তা হলে?"

অভীদা আর দিদি তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। নিঃশব্দে বলাবলি হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য কথা। সে সরে গেল কিচেনের দিকে। তবু বুঝতে পারল অভীদা বুকে টেনে নিচ্ছে দিদিকে, 'হ্যাপি বার্থ-ডে নাতাশা'! দেখতে না চেয়েও দেখে ফেলল সীতা, দিদি এলিয়ে পড়ছে অভিদার হাতের মধ্যে!

"আহ্, আমি মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ব!" বলল দিদি অভিনন্দিত হতে হতে।

হইহই করে কেক কাটা হল, সীতাও পেল একটা টুকরো। দিদি বলল, "এবার আমি একটু স্নান করে তৈরি হয়ে নিই অভী? যা বিচ্ছিরি গরম! সীতা, তুই জুরাকে গা হাত মুখ মুছিয়ে, তৈরি করে দে।"

আধ ঘণ্টা লাগল দিদির তৈরি হতে। তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম শাড়ি পরতে দেখল সে দিদিকে। একটা বেগুনি রঙের শিফন শাড়ি। স্লিভলেস ব্লাউজ, কানে ঝোলা দুল। চুলটা ছেড়ে রাখা। আলো পড়ে চকচক করছে ব্লাশার লাগানো গাল দুটো! অভীদা মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল দিদিকে, পিছন দিক থেকে এসে শুঁকল ঘাড়টা, "আহ্!"

দিদি বলল, "শানেল। চলো যাই? জুরাকে তুমিই কোলে নাও, আমি শাড়ি পরে বাচ্চা কোলে নিয়ে হাঁটতে গেলে পড়ে মরব।" জুরাকে লুফে কোলে তুলে নিল অভীদা। ওরা এক পা এগিয়েছে কি ঝনঝন করে বেজে উঠল ল্যান্ডলাইনটা। সীতা গিয়ে ধরল ফোন। কেউ বলল, 'নাতাশা?' নারীকণ্ঠ। সে বলল, "দিদি তোমাকে চাইছে!" দিদি গিয়ে ধরল ফোন, "কে?"

মুহূর্তের মধ্যে মুখটা শুকিয়ে গেল দিদির। কে যেন শোঁ করে টেনে নিল সমস্ত আনন্দ চোখমুখ থেকে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল দিদি, যেন দেখতে পেল কাউকে। এক দু'-সেকেন্ড থমকাল দিদি, তারপর বলল, "তুই ওপরে উঠে আয় না পিউ?"

পিউ শুনেই অভিদা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল কোল থেকে জুরাকে। এগিয়ে গেল ব্যালকনির দিকে সামান্য, তারপর ধীর পদক্ষেপে সোফায় গিয়ে বসল। সীতা দেখল অভিদার চোয়ালটা কঠিন হয়ে উঠছে, মাথা নত।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই চরম কৌতূহলে তার ইচ্ছে করল রাস্তায় যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখার। সেটা দেখতে গিয়েই তার নজর পড়ল আকাশের দিকে। অন্ধকার নেমে গিয়েছিল আগেই, তাই চোখে পড়েনি। প্রচণ্ড মেঘ করেছে আকাশে, থমথম করছে চারপাশ, একটা গাছের পাতা দুলছে না, আর এখান থেকে ওখান থেকে শব্দহীন চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুতের কিলবিলে রেখা। কালই টিভিতে বলছিল বর্ষা আসতে এবার দেরি হতে পারে, কিন্তু এই ফুঁসে ওঠা আকাশ দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামল বলে।

মহারানির পাশেই যে কেকের দোকানটা, ঠিক তার সামনে জিন্স্ আর কুরতি পরে দাঁড়িয়ে লম্বা, ছোট ছোট চুলের একটা মেয়ে। সীতার চিনতে ভুল হওয়ার কথাই নয়। অভীদার বউ— পিউ! দিদির বন্ধু—পিউ।

দিদিকে বলতে শুনল সীতা, "আয় না পিউ একবার! তোর সঙ্গে তো আমার কোনও ঝগড়া হয়নি?" পিউ কী বলল কে জানে, দিদি ফোন রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। জুরা বুঝতে পেরেছিল বেড়াতে যাচ্ছে, এখন তার বেড়ানোর মুড, আর থাকতে চাইছে না, সীতা ওকে কোলে তুলে নিয়ে টেবিলে রাখা চকোলেটটা দিল, দিদি এনেছে একটু আগে।

দিদি ফিরে এল পিউকে নিয়ে, বলল "আয়, বোস!"

পিউ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অভীদার দিকে। অভীদা মুখই তুলছে না! ঠিক অভীদার মুখোমুখি গিয়ে বসল পিউ, "আমি জানতাম আজ নাতাশার জন্মদিন, আমি জানতাম আজ তোমাকে এখানেই পাওয়া যাবে!"

অভীদা কোনও কথা বলল না, মাঝখান থেকে দিদি বলে উঠল, "আমিই ওকে বলেছিলাম একটু আসতে, আমার জন্মদিন। তোকেও বলতাম কিন্তু তুই তো আমার সঙ্গে কথাই বলিস না!"

সোজা দৃষ্টিতে তাকাল পিউ দিদির দিকে, "কারণ আমার দরকার নেই। কারণ আমি জানি তুই অভীর পাস্ট। আমি চাই না তোর সঙ্গে অভীর বা আমার কোনও যোগাযোগ থাকুক।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদি গিয়ে বসল সোফায়, "ভাল হল তুই চলে এলি। সামনাসামনি কথা হয়ে গেল। তুই যখন চাস না পিউ, অভীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকে, তখন তাই হবে। এমনিতেও যোগাযোগ তো ছিলই না।"

দিদিকে কথা শেষ করতে দিল না পিউ, "নাতাশা, তুই যেমন জীবনটাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছিস, খেলছিস, আমি তা করিনি রে! আমি অভীকে সিরিয়াসলি নিয়েছি, আমরা বিয়ে করেছি, আইনত, শাস্ত্রমতে। আমার পরিবার, ওর পরিবার দু'পক্ষই এই বিয়েটার সঙ্গে জড়িত। এটা কোনও ছেলেমানুষি ছেলেখেলা নয়! তুই বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই আমি কী বলছি?"

"এটা না বোঝার কী আছে?"

"অভী?" পিউ অভিদার দিকে তাকাল, "অভী, সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই ভুল বোঝাবুঝি হয়, মনোমালিন্য হয়, মান অভিমান হয়—তাই বলে তুমি আমাকে ছেড়ে অন্য একটা মেয়ের দিকে চলে যাবে? আমাদের সম্পর্কটা কি এতই নড়বড়ে, এতুই অকিঞ্চিৎকর? তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে অভী?" শেষ কথাগুলো বলতে বলতে গলা ধরে এল পিউয়ের। দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল অভীদা, দিদিও।

"তুমি বলো অভী। আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। তাই যদি হয় আমি একশো পা সরে যাব তোমার থেকে। তুমি চাইলে আমি এখুনি ডিভোর্স দিতে পারি তোমাকে।"

অভীদা পিঠে হাত রাখল পিউয়ের, "পিউ চলো!"

"না অভী, আমি এই থ্রেটটা নিয়ে বাঁচতে পারব না। তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে তুমি কী চাও।"

অভীদা হালকা ধমক দিল পিউকে, "ধ্যাৎ! অবুঝের মতো কোরো না তো! নাতাশার ব্যাপারটা তো তুমি জানো পিউ, এই মুহূর্তে ও একা, কালই হয়তো আর তা থাকবে না, নতুন করে জীবন শুরু করবে, এইরকম একটা সময়ে ওকে একটু-আধটু সাপোর্ট করা, একটু পাশে দাঁড়ানো—সেগুলো তোমাকে সাফার করানোর জন্যে নয়।"

পিউ জলভরা চোখে তাকাল অভীদার দিকে, "কিন্তু তুমি আমাকে লুকিয়েছ, অনেক কিছু লুকিয়েছ?"

"হ্যা, আমার ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না। এবার চলো। আজ ওর জন্মদিন, ও তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। মনে আছে এই বাড়িতেই আমি প্রথম তোমাকে মিট করেছিলাম, এই বাড়িতেই? ওকে একটা উইশ করো, তারপর চলো।"

"আমি ও সব মনে করতে চাই না। তখন তুমি ওর বয়ফ্রেন্ড ছিলে, পাগল ছিলে ওর জন্যে। আর এ তোমাকে জাস্ট ডাম্প করে ছেড়ে চলে গেল। নাতাশাকে বুঝতে হবে যা ও হারিয়েছে, হারিয়েছে। চাইলেই তা আর ফেরত পাওয়া যাবে না।"

পিউকে নিয়ে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে অভীদা। বড় বড় আলো যেন খেতে আসছে অবসন্ন পরিস্থিতিটাকে। আর মানাচ্ছে না এত আলো। সীতা একে একে নিভিয়ে ফেলল আলোগুলো। জুরা কার্টুন দেখছে, দিদি আধ

শোয়া হয়ে আছে সোফার ওপর। প্রায় নিঃশব্দে সীতা সরিয়ে নিয়ে গেল কেক, ছুরি, মোমবাতি। ঝাঁট দিল হলটা, কেকের গুঁড়ো পড়েছে সর্বত্র। রাত বাড়ছে। রাতের জন্যে কিছু রান্না করা দরকার। জুরাকেও খাওয়াতে হবে। আলুসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ ভাত করে ফেলতে পারে সীতা এক্ষুনি। মাছও আছে। সাহসে ভর দিয়ে দিদিকে প্রশ্ন করল সে, "দিদি, রাতের খাওয়াদাওয়া?"

দুলগুলো খুলে রেখেছে দিদি টেবিলের ওপর। বাকি সেই সন্ধের সাজপোশাক। তার কথায় চমক ভাঙল দিদির, "'হু? ও হ্যাঁ!" দিদি জুরার দিকে তাকাল। উঠে দাঁড়াল, "তৈরি হয়ে নে সীতা, আমরা বাইরে খেতে যাব।"

"আমিও যাব দিদি?"

"হ্যাঁ, তুই, আমি, জুরা।"

"আমার লজ্জা লাগে দিদি রেস্টুরেন্টে যেতে। সবার সামনে খেতে আমার লজ্জা লাগে।"

"চল না সীতা? প্লিজ!"

এভাবে অনুরোধ করল তাকে দিদি। দ্বিরুক্তি না করে তৈরি হয়ে নিল সীতা।

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। দুপুর থেকে শুরু হয়েছে, থামার নাম নেই। জলের তলায় চলে গিয়েছে রাস্তা। কিন্তু সীতাকে বেরোতেই হবে। দুধ আনতে যেতে হবে। তা ছাড়া টুকিটাকি আরও কিছু আনার আছে। কাল থেকে প্লে স্কুলে যেতে শুরু করেছে জুরা। তিন-চারটে দিন ছুটি নিয়েছে দিদি অফিস থেকে। এই প্রথম সপ্তাহটা মোটে দেড় ঘণ্টার স্কুল, তারপর থেকে আড়াই ঘণ্টা। ন'টা থেকে সাড়ে এগারোটা। স্কুলটা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে, এখান থেকে বেশি দূর নয়। সীতাই দিয়ে আসা নিয়ে আসা করবে। মিন্টো পার্ক এলাকা পর্যন্ত সীতা মোটামুটি রাস্তাঘাট চেনে। তবু দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতি শিখতে এই ক'দিন সে দিদির সঙ্গে যাচ্ছে।

জুরাকে নিয়ে দিদি ঘুমোচ্ছে নিজের ঘরে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। বৃষ্টির যা হাল চট করে ধরবে বলে মনে হয় না। ছাতা নিয়ে, দুধের ক্যান নিয়ে নীচে নামল সে। সিঁড়ি অবধি জল চলে এসেছে এ বাড়ির। সীতা রাস্তা পার হল। ও ফুটপাতে পৌঁছে তার সঙ্গে দেখা হল লক্ষ্মীর। কাকভেজা হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সেই সে দিন, দিদির জন্মদিনের দিন এসেছিল লক্ষ্মী তার কাছে—তারপর আর দেখা হয়নি। সে ডেকে উঠল, "লক্ষ্মীদি? তোমাদের কিছু ব্যবস্থা হল?"

তাকে হতবাক করে দিয়ে বলে উঠল লক্ষ্মী, "তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গো!" রোগা, খয়াটে, কালো, ভেজা শরীর নিয়ে দূর থেকে দুরে চলে যেতে দেখল সীতা লক্ষ্মীকে। হঠাৎ তার গা ছমছম করে উঠল কেমন। হঠাৎ তার নিজেকে মনে হল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ওই যে লাল বাড়িটায় কাজ করে বুড়িটা—সমস্ত বিকেল উবু হয়ে বসে থাকে বারান্দায়; একবার তাকে বলেছিল বুড়িটা, কোন যৌবন বয়েসে কাজ করতে এসেছিল এ পাড়ায় ওই বম্পাস রোডের ও দিকের কোনও বাড়িতে। তখনও ইংরেজ আমল শেষ হয়নি। মা রেখে চলে গিয়েছিল, তারপর আর ফিরে আসেনি, খোঁজ নেয়নি। কোনও দিনও আর দেখা হয়নি বাড়ির লোকেদের সঙ্গে। স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন পরের সংসারের জোয়াল টানতে টানতে একদিন দেখে চুল পেকে গিয়েছে। প্রায় প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে থিতু হয় বুড়ি এই বাড়িতে। সেই থেকে এই বাড়িতেই আছে। প্রতিদিন আরও বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, হাঁটুর জোর চলে গিয়েছে, শিরদাঁড়া বেঁকে গিয়েছে— দিনে দিনে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। কিন্তু

মৃত্যুচিন্তার থেকেও বড় চিন্তা যখন শরীর একদম পড়ে যাবে তখন কী হবে? এখনও বেঁচে আছে বাড়ির কর্তা-গিন্নি। ছেলেদেরেই কারও কারও ষাটের ওপর বয়েস। এখনও বুড়ির হাতের নিরামিষ তরকারি খাওয়ার লোক আছে সংসারে। একদিন আর সেটুকুও চলবে না হাত। ঘর নেই, বাড়ি নেই, দেশ বলে ফেরার মতো ছায়াঘেরা গ্রাম নেই কোনও সম্পত্তি বলতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। মাইনেটুকুও গুনে নেওয়ার সামর্থ্য নেই। হরির কাছে তার এখন একটাই প্রার্থনা, 'অনেক দিয়েছ ঠাকুর, আর একটু দয়া করো। অথর্ব করে ফেলে রেখো না, রান্না উনুনে বসিয়ে হাত ধুতে ধুতে যেন চলে যেতে পারি'।তা না হলে যে কী হবে তা বলতে গিয়ে বুড়ি শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলেছিল। সীতা দেখেছিল গর্তের মধ্যে ঢুকে যাওয়া চোখের চারপাশে উঁচু উঁচু হয়ে আছে অসংখ্য শিরা-উপশিরা! শিরাগুলো তীব্র ভয়ে কাঁপছে। এই বয়েসে পৌঁছেও অদেখা, অজানা ভবিষ্যৎ চিন্তায় শঙ্কিত প্রতিটা রোমকূপ, প্রতিটা স্নায়ু। বুড়ি বলেছিল, "শুয়ে থাকতে থাকতে শরীরে পোকা হয়ে যায়। সেরকম হলে কেউ কি ঝি-চাকর রেখে আমার সেবা করাবে? টান মেরে ফেলে দেবে না বাইরে?"

পুতুল বলছিল, যাতায়াত করতে করতে নয়নের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যায় ওর। কথা হয়, গল্পগাছা হয়। নয়নের সঙ্গে কথা বলতে নাকি ভীষণ ভাল লাগে পুতুলের। কোথায় একটা মিল আছে পুলকের সঙ্গে। সে আপত্তি করেছিল, "পুতুল, নয়ন কিন্তু লেক গার্ডেন্সের বস্তির ছেলে, আমরা কিন্তু বস্তির মেয়ে নই! একবার ভুল করেছিস জীবনে, আবার কিছু করার আগে বুঝে কর।"

পুতুল বিরক্তি ঝরিয়ে বলেছিল, "অবস্থার ফেরে পড়ে মানুষকে বস্তিতে গিয়ে উঠতে হয়। আমরা কী করছি? পরের বাড়ি কাজ করে হাত পেতে টাকা নিচ্ছি না? তোর পাঠানো টাকা কি মা রোদে শুকিয়ে তুলে রাখে? এক মাস না পাঠিয়ে দ্যাখ, আনচান করবে মা, সাতবার ফোনে খবর নেবে।"

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল সীতা। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে গিয়েছিল পুতুল, "পুলক আমাকে অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সে সব স্বপ্ন আমার ভেঙেচুরে গেছে— আমি এখন স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। যেটা মন চাইবে করব। এই তো বড়লোক বাড়ির মেয়েকে দেখছি, দুটো বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে এল, দু'জনকেই জড়িয়ে ধরল, চুমু খেল! কী আছে চরিত্রের? মন যা চাইছে করছে। নয়ন বস্তিতে থাকে বলেই নয়ন খারাপ? মোটেও নয়ন এমন কিছু খারাপ ছেলে নয়। তুই মন থেকে মিশতে পারিনি তাই বুঝতে পারিসনি।"

ক'দিনেই খুব কথা ফুটেছে পুতুলের মুখে। সব সময় চুল খুলে ঘুরে বেড়ায়। ভ্রূ প্লাক করে এসেছে পার্লার থেকে। দেড় হাজার টাকা মাইনে পেয়েছে, কী করেছে কে জানে টাকাটা দিয়ে! জুরার জন্যে একটা খেলনা কিনে এনেছিল।

সে রেগে গিয়েছিল, "যা খুশি কর! বিপদে পড়লে আমাকে বলতে আসিস না।"

"তোর প্রেমিককে টেনে নিচ্ছি বলে তোর রাগ হচ্ছে!"

বিস্ময় ঝরিয়ে সে বলেছিল, "নয়ন আমার প্রেমিক আবার কবে হল?"

চোখ ঘুরিয়েছিল পুতুল, "নয়ন তোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়নি?"

মাথা নামিয়েছিল সীতা, "তাতে আমার সায় ছিল না! নয়ন জোর করেছিল। আমি তখন হদ্দ গ্রামের মেয়ে, বোকাসোকা ছিলাম।"

"এখনও তুই খুব বোকা, কাজই করে যাস, কাজই করে যাস, নিজের কথা কিছুই ভাবিস না। এই ঐশ্বর্যা, এই টুলি, চন্দ্রা, প্রীতি, বাসবী, সুনন্দা সবারই তো প্রেমিক আছে, সবাই বেড়াতে যায়, সিনেমায় যায়, লেকে

ঘুরতে যায়, তুই শুধু জুরাকে কোলে নিয়ে বসে আছিস।”

“তুই এত বেইমান পুতুল? দিদি তোকে জায়গা দিল, আশ্রয় দিল!”

“এমনি এমনি দেয়নি। তুই প্রাণপাত করে সংসার সামলাস না দিদির? বাচ্চাকে বুক দিয়ে আগলাস না?”

রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল সীতা, “তোকে এসব কে শেখাচ্ছে? নয়ন?”

“যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা!” বলেছিল পুতুল শান্তভাবে।

“দ্যাখ পুতুল, কেন আমি এই লাইনে এসেছিলাম তা এখন আমার আর মনেই পড়ে না। বিধুপুরের কথা, অঞ্জনদার কথা মনে পড়ে না। অঞ্জনদার মুখটাই ভাল মনে নেই আমার। কিন্তু কী বল তো? আমি লোকের বাড়ি কাজ করে খাই কিন্তু মনে মনে আমি কাজের মেয়ে হয়ে যাইনি কখনও। একটা অভিমান হয়েছিল আমার অনেক বছর আগে, সেই অভিমানটা আমাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেশ কেটে যাচ্ছে আমার, তুই তোর মতো চল, আমাকে আমার মতো থাকতে দে।”

ক'দিন আগে পুতুলের সঙ্গে এসব কথা হয়েছিল সীতার। আজ লক্ষ্মীর চোখে রাগ এবং হিংসা দেখে লালবাড়ির বুড়িটার কথা মনে পড়ল তার। পুতুলের সঙ্গে কথোপকথন মনে পড়ল আর কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল সীতা। বৃষ্টি, জল, কাদা ঠেলে এগোতে এগোতে তার মনে হল সত্যিই তো চব্বিশ বছর বয়েস হয়ে গেল অথচ এখনও জানলই না পুরুষ মানুষ কী! আজ কত বছর বাড়িতে উপার্জিত অর্থের ভাগ পাঠাচ্ছে সে অথচ একবারও মুখ ফুটে মাকে বলতে পারল না, বাড়ি যাব!

দুধ নিয়ে ফিরতে ফিরতে সে নিজেকে বারবার বলতে লাগল ‘বাড়ি যাব,’ ‘বাড়ি যাব’, ‘আমি বাড়ি যাব!’ সেই কুলটা বিল, সেই মেলার মাঠ, সন্ধেবেলা ঘাটে বসে রেডিয়োতে গান শোনা। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে পোড়ো জমিদার বাড়িতে বসে ফেউয়ের ডাক শোনা। স্টেশনবাজারে নতুন জামাকাপড়ের গন্ধ, রেল কোয়ার্টারের দুগ্গাপুজো, কঙ্কালীর দিকে ভয় ও শ্রদ্ধা মিশিয়ে তাকিয়ে থাকা—কাজ করে এত বছর বাড়ির সবার পেট টানল না সে? তার কি একবার বাড়ি ফেরার অধিকার নেই? পুতুল যে গ্রামে ফিরতে পারছে না, তার তো একটা কারণ আছে; কিন্তু সীতা? সে তো খারাপ কাজ করেনি কিছু! চুরি-ডাকাতি করেনি, বাজে পথে হাঁটেনি, এমনকী তার হাত-পায়ে হাজা নেই, গা থেকে এঁটো বাসনের গন্ধ বেরোয় না—তা হলে কেন সীতা যেতে পারবে না বাড়িতে? এই যে ঐশ্বর্যা বলে, দেশে গেলে শুয়ে-বসে কাটায়, ইচ্ছে হলে মাকে খেজুরের রস জ্বাল দিতে সাহায্য করে, নইলে সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়ায় মাঠেঘাটে। সে-ও তাই করবে, জ্যোৎস্নায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এ দিক ও দিক, বাড়ি ফিরে রাঁধা ভাত খাবে। কত বছর তার কোনও বিশ্রাম হয়নি। কত বছর সে শুধু অন্যদের সময় মেনে চলেছে। ইচ্ছে হলে শুয়ে থাকতে পারেনি, গানের খাতায় গান লেখেনি। না, সে বাড়ি যাবেই! বাড়ি ঢোকার মুখে পিছন থেকে সীতাকে ডাকল কে—শুভঙ্করী। বেশ অনেক দিন পর দেখল সে শুভঙ্করীকে, একটা ভাল ছাপাশাড়ি পরেছে, শাঁখা-সিঁদুরের চিহ্ন নেই, মুখের ওপর পড়ে থাকা মোটা দুঃখের জালটা সরিয়ে ফেলেছে যেন কবে।ফুলো ফুলো লাল চোখগুলো হাসছে, ঝিকমিক করছে। শুভঙ্করী বলল, “কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি, বলো সীতা? আমার দিদি এসে সেই কখন থেকে আটকে বসে ছিল। এই দিদিকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম, এবার পাগলের জন্যে একটু শিঙাড়া কেনা।”

অন্য দিন হলে সে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে একটু কথা বলত শুভঙ্করীর সঙ্গে। আজ তার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। সে বলল, "ছাঁটে প্রায় ভিজে গেছি শুভঙ্করী, এখন আর দাঁড়াতে পারব না। তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব, কেমন?"

সরলভাবে ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল মেয়েটা। ফ্ল্যাটে ঢুকে সে দেখল দিদি উঠে পড়েছে, ব্যালকনিতে বসে বৃষ্টি দেখছে। তার শব্দ পেয়ে বলল, "সীতা, চা কর। নাহ্, কফি বানা। বড় মগে দিবি। আর একটু এগ পাকোড়া-টাকোড়া কিছু বানা না রে, খাই।"

সে কোনও উত্তর না দিয়ে কিচেনে ঢুকে দুধটা জ্বাল দিতে বসাল। একটু পরেই আবার 'সীতা, সীতা!' বলে ডেকে উঠল দিদি। পেঁয়াজ, আদা, কাঁচালঙ্কা কুচোচ্ছে তখন সে। ছুরিটা হাতে নিয়েই হল পার হয়ে ব্যালকনির দরজায় পৌঁছোল সে। দিদি বলল, "কী রে, সাড়া দিচ্ছিস না কেন? কতবার ডাকলাম!"

"শুনেছি, বানাচ্ছি পকোড়া।"

দিদি ভ্রু কুঁচকে তাকাল তার মুখের দিকে, "কী হয়েছে বল তো? কেউ কিছু বলেছে? নয়ন বিরক্ত করছিল?"

সে বলতে পারল না, নয়ন তাকে আর বিরক্ত করবে না।

"কিছু হয়নি, বৃষ্টিটা গায়ে লাগল, নাক সুড়সুড় করছে।"

"বেরোলি কেন? একটা দিন অন্য কিছু খেত জুরা। এমনিই তো মাঝে মাঝে দুধ খেতে চায় না। থাক, কফি না বানিয়ে একটু আদা দিয়ে চা বানা, আমাকেও তাই দে।"

সে সরে যাচ্ছিল, দিদি হাত ধরে টানল তার, "অ্যাই শোন, মিথ্যে কথা বলিস না। কী হয়েছে বল, মুখটা ভার ভার কেন? কখনও তো দেখিনি!"

সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল, পায়ের আঙুল খুঁটতে লাগল; তারপর একসময় বলল, "আমি দেশে যাব দিদি!"

দিদি অবাক হল, "দেশে যাবি? কেন? মা ফোন করেছিল? কিছু খারাপ খবর?"

মাথা নাড়ল সীতা। চোখ থেকে গড়িয়ে মেঝের ওপর পড়তে লাগল জল, "নাহ্, আমি এমনি বাড়ি যেতে চাই!"

"মন টেনেছে?"

"হ্যাঁ, খুব। যাব তো দিদি?"

"কেন যাবি না? আমি তো ভেবেই পাই না, তুই এত বছর গ্রামে যাসনি কেন? মা রয়েছে যেখানে, ভাইবোনরা রয়েছে।"

"তা হলে কবে যাব বলো..."

দিদি ভাবল, বলল, "আর তো কিছু নয় সীতা, শুধু তুই না থাকলে আমাকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে হবে। তুই বরং এক কাজ কর, জুরাকে নিয়ে দেশে চলে যা!"

"সত্যি?" সে বড় বড় চোখ করে তাকাল দিদির দিকে।

"ধ্যাৎ! বোকা মেয়ে, জুরা আমাকে না দেখে থাকতে পারবে?"

"জানি, তুমি মজা করলে।"

"না রে সীতা, আমার অসুবিধের জন্যে আমি তোকে আটকাব না। তুই ঘুরে আয়। স্কুল থেকে ড্রাইভার ওকে তুলে কাছের এই ক্রেশটায় দিয়ে দেবে, আমি অফিস থেকে ছ'টায় বেরিয়ে পড়ব রোজ, ম্যানেজ হয়ে যাবে। তেমন হলে ছুটিও নিতে পারি। রবিবার বেরিয়ে যা তুই।"

"পারবে তো দিদি?"

"একদম পারব। তুই নিশ্চিন্তে যা। খুব মজা করে আয়। এত বছর পরে যাচ্ছিস, সবার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে যাবি। আমি তোকে কিনে দেব।"

দিদির প্রতি কৃতজ্ঞতায় কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল তার। এমন দিদি সে আগে কখনও পায়নি, আর কখনও পাবে না! কতদিন হয়ে গিয়েছে অভীদা আর আসেনি। দিদি কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। একদিন অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে যাবে বলল কোথায়, সাজগোজ করল, তারপর বলল, "ধুর, যাব না! ভাল লাগছে না।" খুলে ফেলল সাজগোজ। সেদিন তাকে বলল, "যদি বিদেশ চলে যাই, এই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে যাব। তুই চিন্তা করিস না, তোর জন্যে একটা ব্যবস্থা করব ঠিক। একেবারে ফাঁকি দেব না তোকে। তুই অনেক করিস আমার জন্যে সীতা!" এমন কথা তো তাকে কখনও কেউ বলেনি! এমন ভরসা তাকে কেউ কখনও দেয়নি!

পরের দিন দীপক ডাক্তারের চেম্বারে ফোন করে জানিয়ে দিল সীতা যে রবিবার যাচ্ছে। মাকে যেন বলে রাখে মহীনকাকা। ফোন ছেড়েছে, পুতুল এল। পুতুলকেও জানাল সে খবরটা—যাচ্ছে, বিধুপুর যাচ্ছে সে। নিজের উচ্ছ্বাস সীতা গোপন করতে পারল না। পুতুলকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল কার জন্যে কী নেওয়া যায় উপহার, কোন জিনিসটা এখনও কিছুতেই খুঁজলে পাওয়া যাবে না তাদের গ্রামে। পুতুল তেমন গা করল না। নিজেকে নিয়েই ভাবছে পুতুল এখন। কেয়াতলায় একটা বেশি মাইনের কাজ পেয়েছে পুতুল। নয়ন সেই বাড়ির ড্রাইভার। বড়লোক ব্যাবসাদারের বিরাট বাংলো বাড়ি, গাড়ির সংখ্যাই চার-পাঁচটা। পুতুল বলল, "এ চত্বরে তো টাকা উড়ছে দিদি! সময় থাকতে থাকতে ধরে নেওয়াই ভাল। আর তা ছাড়া কী বল তো, ফুলটুসিদের বাড়ি আমার আর ভালও লাগছে না। সেই ভোর পাঁচটায় উঠে দিদিমাকে লেকে মর্নিংওয়াক করতে নিয়ে যাও, তারপর কথায় কথায় হাত- পায়ে সেঁক দিতে হবে, মাজা টিপে দিতে হবে। ও বুড়ির সেবা করতে আমার ভাল লাগে না বাবা। কানের কাছে বকবক করে যায়। আর ফুলটুসিও খুব সুবিধের মেয়ে নয়। জিনিস হারাবে আর আমাকে সন্দেহ করবে। লিপস্টিক হারিয়ে গেছে, দুল হারিয়ে গেছে তার আমি কী করব—আমি নিয়েছি? সে দিন তো আমি বলে দিয়েছি, 'ফুলটুসিদি তুমি ঘরে না থাকলে আমি আর তোমার ঘরে ঢুকব না।' তখন বলছে, 'ও খুব সততা দেখানো হচ্ছে?' আমিও তেমনি, বলে দিয়েছি, 'সততা দেখাব কেন? আমি কি ভান করছি? আমি কি অভিনয় করছি? আমি তো আর অভিনেত্রী নই!' পোষাবে না দিদি, এত মুখঝামটা সহ্য হবে না। মাস শেষ হয়ে এল, মাইনেটা নেব, নতুন কাজে ঢুকে যাব।"

বিধুপুর-ফেরার কথা একবার মুখেও আনল না পুতুল। দেখতে দেখতে কেটে গেল সপ্তাহটা। শনিবার বিকেলে দিদির সঙ্গে গড়িয়াহাট থেকে বাড়ির সকলের জন্য যা-যা কেনার কিনে আনল সীতা। একবার ভাবল সুপ্রভার জন্যে একটা শাড়িটাড়ি কিছু নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করল পরিকল্পনাটা। কে জানে এত বছরে রাগ কমেছে কি না জেঠিমার তার ওপর। তা ছাড়া জেঠিমারা ভদ্রলোক। সম্পন্ন গেরস্থ। তার ঝিগিরির টাকায় কেনা জিনিস নেবে কি নেবে না! কী দরকার!

ভোরে উঠেই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে দিদির ড্রাইভার নিত্যপ্রিয়। যত রাত করতে লাগল অদ্ভুত এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার শরীরে। ছ'বছর পরে বিধুপুরের মাটিতে পা রাখতে যাচ্ছে সে। এখন সেখানেও রাত। ভবানী নিশ্চয়ই শুতে গিয়েছে, শুয়ে শুয়ে ভাবছে কাল দুপুরের মধ্যে এসে পড়বে সীতা। বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে কি আর বলতে বাকি রেখেছে মা কথাটা? সে-ও গিয়ে পৌঁছোবে আর বিষ্ণুদিও অমনি এসে হাজির হবে। কালীর তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে কবে, ছেলে হয়ে গিয়েছে। পাশের গ্রামেই। সোমবার সীতা যাবে কালীর বাড়ি দেখা করতে। নাহ্, থাক, যাবে না! সবাই জিজ্ঞেস করবে, কলকাতায় সে কী কাজ করে? ও সব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াই ভাল, বিশেষত বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে। তা হলে ঠিক কী করবে সীতা গ্রামে গিয়ে? কার কার সঙ্গে কথা বলবে? কাকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে? সে কি একা একাই ঘুরে বেড়াবে এ দিক ও দিক? মায়ের সঙ্গে গল্প করবে? কোন কথাটা বলতে চাইবে সে মাকে? কোন কথাটা জানার আগ্রহ নিয়ে বসে আছে মা তার জন্যে?

ঘুমোতে না পেরে বিছানায় ছটফট করতে করতে একসময় উঠে বসল সীতা। তিন-চার দিন হয়ে গিয়েছে দীপক ডাক্তারের চেম্বারে ফোন করেছিল সে—জানিয়েছিল রবিবার ভোরে বেরিয়ে দুপুরে পৌঁছোবে। তিন-চার দিন হয়ে গেল, মা তো তাকে একবারও ফোন করল না? ছ'বছর পর সে আসছে, কেন আসছে, কখন আসছে, একা আসছে না কারও সঙ্গে আসছে—মায়ের কি আলাদা করে কিছুই জানার নেই?

কঙ্কালীতলায় যখন নামল সীতা বাস থেকে, তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বাসের এটাই শেষ স্টপ। গ্রাম্য লোকজন বৃষ্টির মধ্যে বাস থেকে নামার সময় অকারণ হাসতে থাকে। তাই হল। হুড়মুড়িয়ে ঠেলাঠেলি করে হাসতে হাসতে নেমে গেল সবাই। নেমে এক পা-দু'পা হাঁটতেই বিনা প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ভিজে যেতে লাগল সে। তার হিল তোলা জুতো, কলমকারির ঘাগরা জলেকাদায় মাখামাখি হয়ে গেল মুহূর্তে। রাত থাকতে উঠে সাজগোজ করেছিল সীতা। চোখের আইলাইনার ধুয়ে যাবে ভেবে দুটো ব্যাগ সামলে ভুরুর ওপর সে হাত চাপা দিল। সাইকেল স্ট্যান্ডে একটু দাঁড়ালে হয়, কিন্তু এ বৃষ্টি সহজে ধরবে না। তা ছাড়া এখন বুকের মধ্যে অস্থিরতা, 'বাড়ি'! 'বাড়ি'! দাঁড়াবার ধৈর্য তার নেই। কত বছর পর এই মাটিটায় পা রেখেছে সীতা—ভীষণ তাগিদ এখন বাড়ি পৌঁছোনোর। তার ভিতরে ভয়, উত্তেজনা। ভবানী কি খুশি হবে সে এসেছে বলে? রাগ করবে, বাঁকা বাঁকা কথা বলবে? ভাইবোনরা হেসে কথা বলবে তার সঙ্গে? জিনিসপত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে নিশ্চয়ই? চন্দ্রা? চন্দ্রার জন্যে সীতা কাচ বসানো শাড়ি কিনে এনেছে। যদি একবারও তার না বলে কয়ে কলকাতা চলে যাওয়া নিয়ে কোনও কথা তোলে ভবানী, তাহলে তুমুল ঝগড়া করবে সীতা মায়ের সঙ্গে। "ও, এত বছর আমার বাসন মাজার বিনিময়ে রোজগার করা টাকাগুলো আত্মসাৎ করতে লজ্জা করেনি? তখন তো একবারও বলোনি 'ফিরে আয়?' লোভী তুমি কম নও। এই তো সে দিন বলছিলে 'হাজার দশেক টাকা চা না দিদির কাছে? মাসে মাসে শোধ করে দিবি। বাড়িটা একটু সারাতাম, ঝড়ে গাছ পড়ে দেওয়াল ভেঙে বসে গেছে। পুকুরের দিকের ঘরটার'। ওই ঘরটাই তাদের রান্নাঘর। তাকে ফোন করা মানেই তো শুধু এই সব কথা মায়ের! বাড়ির জন্য এক বাক্স ভাল দোকানের সন্দেশ নিয়ে এসেছে সীতা। চাপে ভেঙে যায় যদি তাই সারা রাস্তা কত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে তাকে। ট্রেনে তার ব্যাগের ওপর ব্যাগ রাখতে গিয়েছিল একটা লোক, সে কিছুতেই রাখতে দেয়নি। বৃষ্টি এত যত্ন করে নিয়ে আসা জিনিসপত্র দিল সব নষ্ট করে।

সে দাঁড়াল না। সাইকেল স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে পিছনের পাড়ার পথ ধরল। তারপর প্রায় দৌড়োতে লাগল, আর একটু, আর একটু গেলেই বাড়ি। ওই তো বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হল 'বিষ্ণুপ্রিয়াদি!' হয়তো তাই ডেকে উঠত সীতা কিন্তু কণ্ঠনালি পর্যন্ত এসে বিস্ময়ে থেমে গেল চিৎকারটা। দাওয়ার ওপর একটা দু'-তিন বছরের ছেলে কোলে আর পাঁচটা গ্রাম্য বউয়ের মতো শাঁখা সিঁদুর পরা বিষ্ণুপ্রিয়া বসে আছে। পায়ের কাছে একটা বকনা বাছুর, ছেলেটাকে খেলা দিতেই যেন বাছুরটার সঙ্গে খুনসুটি করছে বিষ্ণুদি। পুতুল তো একবারও বলেনি বিষ্ণুপ্রিয়াদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলে হয়েছে? তাদের গ্রাম্য দেবীকে এখন ঠিক দেখাচ্ছে একজন সাদামাটা মা! সীতার বিশ্বাসই হচ্ছে না! আশ্চর্য লাগছে! সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেখতে পেল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা কোলে উঠে দাঁড়াল, হাসিতে ভরে গেল মুখটা—"সীতা না?" চেঁচাল বিষ্ণুপ্রিয়া। সে মাথা ঝাঁকাল জোরে।

"আয় সীতা!"

গ্রামে ঢুকে এই আহ্বানটুকু তার প্রাপ্য ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে কত ভালবাসত সে। বিন্দুমাত্র ভাবতে হল না সীতাকে, সে ঢুকে পড়ল বাড়িটায়। জিনিসপত্র নিয়ে সোজা দাওয়া পার করে ব্যাগ দুটো নামিয়ে রেখে মাটির ওপর বসে পড়ল সীতা। চুল থেকে জল পড়ছে, চোখ, নাক বেয়ে জল পড়ছে, পুরোই ভিজে গিয়েছে সে। একটু একটু হাঁপাচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়াদি দেখছে তাকে লক্ষ করে, সে-ও দেখছে বিষ্ণুপ্রিয়াদিকে। "এলি তা হলে?"

দুটো শব্দ! কিন্তু শব্দ দুটো সীতার চোখ ঠেলে জল বের করে আনল, ভারী বাষ্পকে অতিক্রম করে বেরিয়ে এল কথা। "আসব আসব করে হয়ে উঠছিল না বিষ্ণুদি!"

"আমার ভীষণ মনটা ছটফট করত সীতা তোর জন্যে। অঞ্জনের কথাগুলো তোকে বলে দিয়েছিলাম—হয়তো তাতেই আঘাত লেগেছিল তোর মনে। চলেই গেলি কেমন। আমি তো জানতেও পারিনি তুই ভাল আছিস না খারাপ আছিস। তোর মা তো তোর কথা তুলতেই দেয় না।"

"ভালই আছি!"

"আর পুতুল?" চোখ দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া তার মন পড়ে নিতে চাইল যেন। সীতা আমতা আমতা করল। বিষ্ণুপ্রিয়াদি বলল, "ভাল আছে কি না বল?"

সে তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে। ঘাড় নাড়ল, বাচ্চাটা হাঁচড়েপাঁচড়ে কোল থেকে নেমে ছুটে গেল সীতার ব্যাগগুলোর দিকে। বাচ্চাটা স্বাস্থ্যবান কিন্তু জুরার মতো নয়। জুরার কথা যে সীতার কতবার মনে পড়ছে। হাত, কোল খালি খালি লাগছে কেমন। এখন চারটে সাড়ে চারটে বাজে। জুরার ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়ে গিয়েছে। দুধ খাওয়াতে গিয়ে যথেষ্ট নাজেহাল হবে নাতাশা জুরার হাতে।

সে বাচ্চাটাকে ধরে ফেলে বলল, "তোমার ছেলের নাম কী গো?"

"হাবু! ওর বাবা ওকে সাঙাত বলে ডাকে। ও বড় হলেই ওর বাবা নাকি কীর্তনের বিরাট দল করে দেশবিদেশ গান করে বেড়াবে!"

"তোমার যে বিয়ে হয়েছে আমি জানিই না বিষ্ণুদি।"

বিষ্ণুপ্রিয়া তার সামনে এসে বলল, "তোকে একটা গামছা দিই সীতা, মাথাটা মোছ।"

"না থাক, একেবারে বাড়ি গিয়ে যা করার করব।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিষ্ণুপ্রিয়া একটা, তৃপ্তির শ্বাস, "মা মারা যাওয়ার পর আমি একটা কীর্তনের দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গান করে বেড়াতাম। হাওড়া, কলকাতাতেও গেছি!"

"তাই?"

"ওইরকম ঘুরতে ঘুরতেই রাজু দাসের সঙ্গে আলাপ, আমার। বড় ভাল কীর্তন গায় লোকটা। পদ লেখে, সুর দেয়। শুনিস একদিন এসে। তুই তো থাকবি? অবশ্য কবে ফিরবে জানি না। গেছে গান গাইতে দলের সঙ্গে। বর্ষা বলে আমি আর যাইনি। ছেলেটার বড্ড সর্দিকাশির ধাত। তোকে একটা কথা বলি সীতা, রাজু দাস আমার থেকে বয়েসে চার বছরের ছোট!"

"ওরকম বিয়ে তো কত হয় কলকাতায় !"

"হয় বুঝি? আমার যেন এখনও কেমন কেমন লজ্জা লাগে।"

"তা হলে বিয়ে করলে কেন?"

বিষ্ণুপ্রিয়া নাক কুঁচকাল, "আহা, অত দরের গাইয়ে, লোকে কত প্রশংসা করে, খাতির করে, চেহারাটাও খুব মিষ্টি, দিনরাত ভাবের ঘরে আছে— সেরকম মানুষ পেয়েও তাকে ধরে রাখব না? সেরকম লোকের দেখা পাইনি বলেই তো আমি বিয়ে করিনি সীতা!"

বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনে, হাওয়ায় দুলতে লাগল সীতার মন। কিংবা ওই সিনেমায় যেমন দেখায় শুকনো, ঝরে যাওয়া পাতা উড়ে যাচ্ছে—ভিতরটায় তেমনিই কি একটা ওড়াউড়ি। হৃদয়বৃত্তি, প্রেম, বিবাহ এ সব সীতার কাছে বড় স্পর্শকাতর শব্দ। শুনেই মনে হয় তার জন্যে নয়!

হঠাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া বলল, "তোকে দেখে কেউ চিনতে পারলে হয়! সাজগোজ তো পালটে গেছেই, রংটাও ফরসা হয়ে গেছে খুব!"

"ধ্যাৎ!" সীতা লজ্জিত হল।

"বলছি, শোন! কলকাতার জল!"

সে উঠে পড়ল এবার। "সন্ধের দিকে যাব ক্ষণে একবার,"বলল বিষ্ণুপ্রিয়া, "ছাতা নিবি?"

ছাতা নিল না সীতা। এক দৌড়ে পৌঁছে গেল পুকুরঘাটের সামনে। দেখল জল উঠে গিয়েছে এ বর্ষায় প্রায় খিড়কির দরজা অবদি। ঘাট শুনশান। খিড়কির দরজা খোলা। তখনই সে শুনতে পেল ভবানীর গলা, "সীতা?"।

ভেঙে পড়া ঘরের জানলায় সে দেখল মায়ের মুখ। ছ'বছর পরে।

পরের দিন ভোরবেলা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল সীতা। স্বপ্নে সে দেখল প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে বিধুপুরে। হচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে বৃষ্টি দু-তিন দিন টানা। সে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। পুকুরের জল উঠে এসেছে খিড়কির দরজা পার করে উঠোনে। চারপাশ নিস্তব্ধ। ঘাটে একটা লোক নেই, জনমনিষ্যির সাড়া নেই, লোক চলাচলের শব্দ, রিকশার ঘন্টি, সাইকেলের ঘন্টির শব্দ নেই। শুধু ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ব্যাং ডাকছে। সমস্ত গ্রাম ডুবে আছে অন্ধকারে। আর নির্বিকার ঘুমোচ্ছে ভবানী। ঘুমোচ্ছে চন্দ্রা ভাইবোনরা ঘুমোচ্ছে। শুধু সে জেগে বসে আছে একা। সে ঘুমোত চাইছে না—সময় কেটে যাচ্ছে ভীষণ, সময় কেটে যাচ্ছে। সীতা মশা মারছে বসে বসে, হাত পা চুলকাচ্ছে, এমন নির্জনতা তার ভেঙেচুরে খানখান করে দিতে ইচ্ছে করছে।

এক একবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুচ্ছে সীতা, আবার উঠে বসছে। তার ভয় করছে যদি কোনও কারণে ঘুমিয়ে পড়ে তা হলে কঙ্কালীতলা থেকে ভোরের প্রথম বাসটা ধরা হবে না। আর সেটা ধরতে না পারলে পরের বাসটা অনেক বেলায় ছাড়বে, তা হলে কলকাতায় ফিরতে দেরি হয়ে যাবে তার। দেরি হয়ে যাবে তা হলে জুরার দুধ আনতে। এ দিকে দিদিকে কথা দেওয়া আছে ফিরবেই সে। পৌঁছোতে না পারলে সময়ে অনেক বিপদ। স্বপ্নেই সীতা যেন বুঝতে পারছে সে নেই দেখে প্রীতি ঘুরঘুর করছে দিদির কাছে এসে। বলছে, "সীতা কবে আসবে না আসবে—আমাকে রাখো না দিদি!" পলিও দু'- দু'বার ঘুরে গিয়েছে দিদির কাছে, বক্তব্য একই। পলি মিথ্যে কথাও বলছে, "দেশে গেলেই ওকে বিয়ে দিয়ে দেবে, ও আর আসবে না দিদি!" নাতাশার ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে শুনে, "তাই? কই সীতা তো বলেনি?" নাতাশা জানে কথাটা সত্যি নয়, সীতার জিনিসপত্র রয়েছে সব, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র রয়েছে নাতাশার কাছে। দু'জোড়া সোনার দুল, রুপোর পায়জোড় রেখে গিয়েছে সীতা দিদির জিম্মায়, ফিরবে তো বটেই। তবু দ্বিধা হচ্ছে নাতাশার।

সীতা দেখছে লেক রোড, ল্যান্সডাউনের যত কাজের মেয়ে সব তার ঝামেলা ঝঞ্ঝাটহীন সুখের কাজটা হাতাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে! স্মৃতিতে ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়ার পর এক প্রত্যন্ত গ্রাম বিধুপুরের প্রতি তার আর কোনও সনাতন টান ভালবাসা অবশিষ্ট নেই। স্বপ্নেই তা বুঝতে পারছে সীতা। বিধুপুর থেকে বেরিয়ে কলকাতায় ফেরার আকাঙক্ষায় স্বপ্নের ভিতর তাই ভয়ংকর ছটফট করছে সীতা।

চোখ মেলার পর ল্যান্সডাউন রোডের ওপর প্রায় নিজস্ব হয়ে ওঠা ঘরটায় নিজেকে শুয়ে থাকতে না দেখে বাস্তবিক বোকা বনে যাচ্ছে সীতা অতঃপর। স্বপ্নটা তাকে চমকে দিয়েছে। সত্যি প্রীতি, শেফালি, দেবিকা, পলিদের কোনও বিশ্বাস নেই!

এবং তার কানে আসছে ভবানীর গজরানি। তেড়ে গাল পাড়ছে ভবানী চন্দ্রাকে। বারবার একই কথা আউড়ে যাচ্ছে ভবানী, এক বছরের ওপর ললিতের দেখা নেই। ভবানী নিশ্চিত এবার মরে গিয়েছে লোকটা। মরতই আজ না হোক কাল। মরলে হাড় জুড়োয় ভবানীর কিন্তু পাগলটা কেমন তার ঘাড়ের ওপর ফেলে রেখেছে বউ, ছেলেমেয়ে? বছরের পর বছর? আর ভবানী মুখে রক্ত তুলে ওদের মুখে অন্ন জোগাচ্ছে? তার কি দায় চন্দ্রাকে, রুগ্ণ মালাকে বহন করার? স্বামী দেখে না, সতিনের বুকে চেপে বসে থাকতে লজ্জা করে না চন্দ্রার? প্রচণ্ড আক্রোশে ললিতকে বারবার চন্দ্রার স্বামী বলে উল্লেখ করে চলেছে ভবানী। ভবানী ভুলেই গিয়েছে ললিতের সঙ্গে তারও একটা সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক কোনও সুদূর অতীতকে অতিক্রম করে, ভবানী চাক না চাক, অন্তিম ভবিষ্যৎ অবদি প্রসারিত।

ভবানী চিৎকার করছে ঠিকই কিন্তু চন্দ্রা নিশ্চুপ! ভাঙা ঘরের সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে চন্দ্রা, চোখ বুজে। চন্দ্রার কপালে এখন বড়সড় আলুর মতো চিব একটা। বাঁ চোখটা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। জেলার হাসপাতালে দেখানোর পর জানা গিয়েছে ওটা টিউমার। খারাপ টিউমার। চন্দ্রা মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ব্যথাযন্ত্রণা নেই কিন্তু বমি হয় প্রায়ই। সেই জীবনীশক্তি হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও খুব জেদি চন্দ্রা। ভবানীর ভাল কথাও চন্দ্রা কানে তোলে না। বস্তুত চন্দ্রা এখন কারও কোনও কথাই কানে তোলে না। বসে বসে ললিতের অপেক্ষা করে সে। মৃত্যুর আগে সে একটিবার ললিতের সাক্ষাৎপ্রার্থী। সন্তানদের সে ললিতকে সমর্পণ করে যেতে চায়। চন্দ্রার এমন উচ্চাশা উন্মত্ত, হিতাহিতজ্ঞান শূন্য করে দিয়েছে ভবানীকে।

সীতা শোনে ভবানী চেঁচাচ্ছে, গলার নলি ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, "ও, তোর বরই তোকে এত বছর টেনেছে? বেইমান মেয়েছেলে? আমি খাওয়ালাম, আমি পরালাম, বয়ে বয়ে ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল করলাম—আর আমি কেউ না?" মর্মান্তিক শোনায় ভবানীর কণ্ঠস্বর, "আমি কেউ না? ওই পাগলটা এসে তোর ছেলেমেয়ে দেখবে? একটা বদ্ধ উন্মাদ, হুঁশ নেই কবে থেকে, নিজের নামটা পর্যন্ত মনে নেই যার, গায়ের কাপড় থাকে না—সে কিনা এসে তোর ছেলেমেয়ে আগলাবে? সেই তোর আশাভরসা? এত পিরিত? কোলে মাথা রেখে মরবে বলে বসে আছে দ্যাখো হাপিত্যেশ করে! যাত্রা দলের সখী চন্দ্রাদেবী! পার্ট করছে, পার্ট! আমি খাটতে খাটতে মরছি, ও চুল এলো করে পথ চেয়ে বসে আছে! বিশ্বাসঘাতক! মুখের ভাত তুলে তোর ছেলেমেয়েকে আমি খাওয়াইনি?"

সীতা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায়। তার মনে হয় ভবানীর কৃশ লম্বা শরীরটা হাহাকারে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে উঠোনে। তার ভয় হয় দেওয়ালে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাবে ভবানী এবার। কিন্তু তাকে দেখেই ভবানীর চোখমুখ পালটে যায় নিমেষে। লুটিয়ে পড়া আঁচল তুলে নিতে নিতে বলে ওঠে, "উঠেছিস? বলবি তো? চল, তোকে চা দিই।" যেন কিছুই হয়নি এরকমভাবে সরে যায় ভবানী সামনে থেকে। ভেঙে পড়া ঘরে ঢুকে চা বসাতে উদ্যোগী হয়।

সীতা দিনের আলোয় জরাজীর্ণ বাড়িটার দিকে তাকায় তখন। অবশ হয়ে বসে থাকা চন্দ্রাকে দেখে। ভীষণ মানানসই। নাতাশা একদিন কি কথায় যেন তাকে বলছিল, 'মাথার ওপর অত রং নীল আকাশ থাকতে ঘরের রং লোকে নীল করায় কেন? কেমন যেন লাগে আমার! বাজে!' সীতা বুঝতে পারে বৃষ্টি ধরেনি, উঠোনে জলকাদা; চন্দ্রাকে, ভবানীকে, যাবতীয় সব কিছুকে সে তার শহুরে চোখ দিয়ে দেখছে। তার বাথরুম পেয়েছে কিন্তু বৃষ্টি মাথায় করে পুকুরের পাশ দিয়ে দু'-তিন বাড়ির দ্বারা ব্যবহৃত, ভাঙা সিড়ির ঘরটায় তার অনীহা হচ্ছে যেতে। ঘেন্না হচ্ছে!

চন্দ্রার পাশে মাটিতে পড়ে আছে দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট। বৃষ্টির ছিটে লেগে লেগে গলে পাঁক হয়ে গিয়েছে বিস্কুট দুটো। বিস্কুট দুটোর ওই দুর্দশা দেখেই আজ খেপে উঠেছিল ভবানী। হাজার বারোশো টাকা যাই সে পাঠাক না কেন মাকে, সেই টাকাটা ছাড়া এ বাড়ির কী হত ভেবে শিউরে উঠল সীতা। কাল যখন জিনিসপত্রগুলো উৎসাহ নিয়ে দেখাচ্ছিল সকলে, তখন কী অশান্তি ভবানীর, 'এটা কত? তিনশো টাকা? ওটা? দুশো? দুল, ক্লিপ এসব কার? মালার? ও সেজে কোথায় যাবে? বর্ষা নেমেছে, এসব হাবিজাবি না এনে টাকাটা আমার হাতে দিতে পারতিস! দু'বস্তা চাল কিনে রাখতাম। কখন আবার বন্যাটন্যা হবে, বিপদে পড়ব, অন্তত ঘরে চাল, আলুটা থাকলে...!"

সব দেখানো হয়ে গেলে মা তার চোখের দিকে তাকিয়েছিল, "পুতুল কিছু পাঠাল না?"

সে বলেছিল, "নাহ্!"

"বলিস না গিয়ে এবার ওকে, মাকে কিছু কিছু তো পাঠাতে পারে। ওর হাতে তো এখন ভাল টাকা," তারপরই ভবানীর মনে পড়ে গিয়েছিল, "তুই যে বছরের মাঝখানে ঢুকলি, তোকে দিদি বোনাসটা দেবে তো পুজোয় সীতা?"

বিরক্তিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, "অত ভাবার কী আছে? দেড়-দু'হাজার টাকা খরচা করে এগুলো কে কিনে দিল? দিদিকে কিছু বলতে হয় না। দিদির মন আছে, মন দিয়ে সব বুঝে নেয়!"

ভবানী নিশ্চিন্ত হয়েছিল খুব, "তা হলে..."

ঠোঁট কামড়ে সীতা বলেছিল, "তা হলে কী?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসেছিল ভবানী, "বোনাসের টাকা সীতা তুই তোর নিজের কাছেই রাখিস।"

সীতা বোকা বনে গিয়েছিল একেবারে।

সে এসে পড়তে ভবানী তাকে বুকে টেনে নেয়নি, আবার দূরে সরিয়েও রাখেনি। অবেলায় মা-মেয়েতে তারা যখন ভাত খেতে বসল, ভবানী দু'- একটা কথা বলেই জিজ্ঞেস করেছিল, "ক' দিনের ছুটি নিয়ে এলি? দিদি তো তোকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে!"

তাকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি, "পরশু একটা ফোন করব দিদিকে, ও গলা শুনেই বুঝে যাব ও দিকের কী অবস্থা। তেমন বুঝলে মঙ্গলবার ভোরে চলে যাব।"

"আর কটা দিন থাকবি না? এত কষ্ট করে এলি? এত বছর পর!" এমন একটা প্রশ্ন সে সত্যিই আশা করেছিল মায়ের কাছে, বদলে ভবানী বলল, "জেঠিমার সঙ্গে দেখা করিস একবার সীতা।"

চা খেয়ে, ভাল করে স্নান করে সীতা তাই দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে টিউবওয়েল পার হয়ে চলল অঞ্জনদাদের বাড়ি, যেখানে এখন অঞ্জনদা নেই, অঞ্জনদার বউ, ছেলেমেয়ে কেউ নেই। জেঠিমা একাই থাকে।

সদর দরজা খোলাই ছিল। ওড়না মাথায় ঢেকে দৌড়ে এসেছে সীতা। দম নিয়ে ভিতরে পা দিল সে। সকালের রোদ যখন ভরিয়ে দিত বাঁধানো চাতালটা তখন ছিল জেঠিমার লম্বা টানা দাওয়ায়, চেয়ারে বসে চা খাওয়ার সময়। এখন বেলা গড়িয়েছে ঢের, এগারোটা বাজে। সীতা দেখল এখনও চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে জেঠিমা। তাকে দেখে চোখের মণি নড়েচড়ে উঠল না জেঠিমার, "তোকে অনেক দিন পর দেখলাম রে সীতা!" বলল জেঠিমা অবশ্য, কিন্তু কথাগুলো উত্থানপতনহীনভাবে বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। সে বারান্দায় লাল মেঝের ওপর বসল গিয়ে ধীরেসুস্থে। সে টের পাচ্ছিল সেই এক আনুগত্য তার রয়ে গিয়েছে আজও জেঠিমার ওপর। এই যে সে লোকের বাড়ি কাজ করে, সারাক্ষণ, বছরের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত কতকগুলো জিনিস সীতা বহন করে চলে শরীরে, মনে। সে প্রমাণ করতে থাকে যে সে বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী, আজ্ঞাবাহী, পরিচ্ছন্ন, ত্যাগী এবং অবশ্যই বাড়ির বাকি সমস্ত সদস্যদের তুলনায় অতি তুচ্ছ, নগণ্য এক মানুষ। এ সব সে প্রমাণ করতে চায় শুধু টিকে থাকা নামক এক প্রকার চক্রান্তের বশবর্তী হয়ে। জেঠিমার পায়ের কাছে বসে তার মনে হল, অঞ্জনদার বাড়িতে টিকে থাকাটা এখন এক অতীত তবু তার অন্তঃকরণ কেমন হেলে যাচ্ছে জেঠিমার দিকে। জেঠিমা যদি বলে কিছু সে শুনবে কথাটা, না শুনে পারবে না।

সে বলল, "তুমি এখনও এখানে বসে আছ জেঠিমা?"

"বসেই থাকি, যতক্ষণ পারি। চালকলের ও দিক থেকে একটা বউ এসে সব করে দিয়ে চলে যায়। বেলায় উঠে আমি ভাতে ভাত সেদ্ধ করে খাই। এই সময় হয়ে এল।"

কত বয়েস হবে জেঠিমার? ষাট? ছ'তলার বাঁ হাতের ফ্ল্যাটে যে দিদা থাকে, সেই দিদার বয়েস পঁচাত্তর হবে। প্রতিদিন বিকেলে হাতকাটা ব্লাউজ পরে, পাটভাঙা শাড়ি পরে, ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক পরে দিদাটা গাড়ি চড়ে বেড়াতে বেরোয়। সে-ও হয়তো তখন জুরাকে নিয়ে লেকে যাচ্ছে ঘুরতে। দেখা হয়ে যায় তার দিদাটার সঙ্গে। "কোথায় যাচ্ছ দিদা?" জিজ্ঞেস করে সীতা। কোনওদিন দিদা বলে "এই তো, বোনের নাতি হয়েছে, দেখতে যাচ্ছি!" কোনওদিন বলে, "জায়ের শরীর ভাল না, একটু যাই দেখা করে আসি।"

কোনওদিন বলে, "আজ খুব গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে ইচ্ছে হল সীতা। বাড়িতে তো বসে থাকতে পারি না!" সেই দিদার তুলনায় জেঠিমা কত ছোট কিন্তু তবু বয়েস কেমন ফাটল ধরিয়েছে জেঠিমার শরীরে। দিন ফুরোনো মানুষের মতো হতাশ বসে থাকার ভঙ্গি। বিধুপুর নামক এক অখ্যাত গ্রামের বিচিত্র একঘেয়েমির সঙ্গে এক হয়ে বসে আছে যেন।

"বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে আসি জেঠিমা?" বলল সীতা। ঘাড় নেড়ে সায় দিল জেঠিমা। সে দোতলায় উঠে এল। চুপিসারে দাঁড়াল অঞ্জনদার ঘরের সামনে। দরজায় তালা কিন্তু পাশের খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের ভিতরটা। এসব খাট, আয়না লাগানো আলমারি ঘরটার সঙ্গে তার পুরনো পরিচয়ে থাবা বসাল যেন। একদিন এই ঘরটার সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল তার, সেকথা ভাবার আর কোনও কারণই থাকল না। ঘরটার ধরনধারণ বদলে গিয়েছে। আলনায় ঝুলছে একটা লাল সায়া, কালো ব্লাউজ। আয়নাটা স্টিকার টিপে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। মুখের ভিতরটা কেমন তিতকুটে হয়ে গেল সীতার। সরে আসতে আসতে সে দেখল ঘরের মেঝেতে ধুলো পড়ে গিয়েছে পুরু হয়ে। অঞ্জনদারা কি একদমই আসে না? নেমে এসে জেঠিমাকে এই প্রশ্নটাই করল সে ঘুরিয়ে।

জেঠিমা বলল, "অঞ্জন তো ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।"

সে অবাক হল, "সে কী? কেন?"

"অঞ্জন এখন শ্বশুরের সম্পত্তি দেখাশোনা করে। মজুর খাটায়, একে ধমকায়, ওকে তাড়ায়, ক্যাশবাক্সে টাকা গুনে রাখে। ওদের তো কতকগুলো দোকান, অঞ্জনই তো ব্যাবসা চালাচ্ছে শুনছি এখন। কত দায়িত্ব, শ্বশুরের বয়েস হচ্ছে না?"

তার কেমন অস্থির অস্থির লাগতে থাকে যেন। সে বুঝতে পারে না অঞ্জনদার পক্ষে এ সবই ভাল হয়েছে কি না। ধনদৌলত, ক্ষমতা, অর্থ পেয়ে অঞ্জনদা খুশি তো? সে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবে অঞ্জনদার এখন কত টাকা আর সে লোকের বাড়িতে ঝিগিরি করে? তারপর সীতা হাসে মনে মনে, অঞ্জনদার টাকা থাকলে তার কী? হঠাৎ জেঠিমা বলে, "তোর আর আমার ওপর কোনও রাগ নেই তো সীতা?"

"তা হলে আসতাম তোমার কাছে?"

"তুই তা হলে আমার কাছেই থেকে যা, সেই আগের মতো!"

একটু আগেই তার মনে হয়েছিল জেঠিমার কোনও কথাই সে ফেলতে পারবে না। এখনও এত মানে সে জেঠিমাকে, কিন্তু প্রস্তাবটা তাকে স্পর্শই করল না যেন। সে উঠে পড়ল এবার, "একটু বিষ্ণুদির কাছে যাব জেঠিমা।" তার মনেও হল না জেঠিমাকে আজ একটা দিন ভাতে ভাত সিদ্ধটা সে-ই বেঁধে দিতে পারত। সে শুধু শ্রদ্ধা, ভালবাসায় পরিপূর্ণ প্রণাম সেরে নিল একটা।

জেঠিমা বলল, "বিষ্ণুপ্রিয়াটার কী হল দ্যাখ!"

সে চমকে গেল এই কথা শুনে, "কী হল?" কালই তো দেখা হল তার বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে।

"সেই গত বছর রাসের আগে কবে কোথায় গান গাইতে যাচ্ছি বলে গেল বিষ্ণুর স্বামী—সে আজও ফেরেনি! কোন এক মেমসাহেবের সঙ্গে সে মথুরা, বৃন্দাবন চলে গেছে। এখন এগুলো রটনা না ঘটনা কেউ জানে না!"

সীতা দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। জেঠিমা বলতে লাগল, "কী যে মিষ্টি ছেলেটা রাজু, তোক কী বলব সীতা! যেমনি ভাসা ভাসা দুটো চোখ, তেমনি মন ভুলোনো কথা। আর কী যে কীর্তন গায়, জ্বালা, যন্ত্রণা মনস্তাপ জুড়িয়ে যায় যেন। সে কিনা বিষ্ণুপ্রিয়াকে এমন ঠকিয়ে চলে গেল?"

সে পায়ে পায়ে এগোল দরজার দিকে। শুনল জেঠিমা বলছে, "ছেলেটা যখন আছে তখন আসবে ঠিক ঘুরেফিরে একদিন। তোর বাবার মতো পাগলই ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে কেমন।"

সীতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি গেল না। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই সে হাঁটতে লাগল কঙ্কালীতলার দিকে। ওখানে একটা ফোনের বুথ দেখতে পেয়েছিল সে, কাল বাস থেকে নেমে। পৌঁছে সে ফোন করল দিদির মোবাইলে। তার গলা পেয়েই দিদি একদম হাউমাউ করে উঠল যাকে বলে, "সীতা, আমার এখন পাগল পাগল অবস্থা। একটা জিনিস খুঁজে পাচ্ছি না এমন গুছিয়ে রেখে গেছিস সব! কী করিস বল তো?"

সে খুব শান্ত স্বরে বলল, "কাল ভোরে বেরিয়ে বিকেলে পৌঁছে যাব দিদি, গিয়ে সব খুঁজে দেব!"

থমকে গেল নাতাশা ফোনের ও প্রান্তে, "ব্যস! চলে আসছিস?"

"হ্যাঁ"।

"কেন রে? থাকলি না?"

"পরে আবার আসবখণ দিদি। বর্ষাটর্ষাগুলো কাটুক। এখন যা হতচ্ছাড়া দশা। জলকাদায় থইথই। ভাল লাগছে না। গ্রাম দেশ তো দেখোনি কখনও। দেখলে বুঝতে। বাব্বাঃ ..." সে অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটাল একবার।

হাসতে লাগল দিদি, "আমার রোগে ধরেছে তোকে শিয়োর! মতিগতি ঠিক নেই! আচ্ছা আয় তা হলে। জুরা তো তোর ওপর খুব রেগে গেছে। বারবার তোর ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র টান মেরে ফেলে দিয়ে আসছে!"

পথ চিনে এসেছে উপেন গুছাইত। শার্ট, প্যান্ট পরে এসেছে। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। অনেক ভোরে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই। ভটভটি ধরে বিদ্যেধরী পার হয়ে চুনাখালি, সেখান থেকে শিয়ালদা, শিয়ালদা থেকে দিদির বাড়ি, দিদির বাড়ি থেকে খুঁজে খুঁজে লেক রোড। চোখেমুখে চুলে আটকে আছে ধুলো। খাওয়াদাওয়া যে হয়নি, তা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এসেছে কিন্তু দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছে না।

লোকটা এসেছে তাকে নিয়ে যাবে বলে। ওই মেয়েটা নাকি চলে গিয়েছে নিজে থেকেই। এবার শুভঙ্করীর কথা মনে পড়েছে উপেনের। চোদ্দো- পনেরো বছরে বিয়ে করে নিয়ে আসা বউয়ের কথা মনে পড়েছে!

কিন্তু শুভঙ্করী আর ফিরবে না হলুদসোঁতা গ্রামে। নেপালকাকা উপেন গুছাইতকে জানিয়ে দিতে গিয়েছে সে কথা। রাস্তার চায়ের দোকানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিড়ি ধরিয়ে নেপালকাকা সেই কথা যেই বলছে উপেনকে, লোকটার চাউনি বদলে যাচ্ছে অমনি। কাঁধ ঝুলে পড়ছে, ফ্যালফেলে চোখে তাকিয়ে লোকটা বলছে, 'শুভঙ্করী যাবে না বলল?' নিজের কানকে বিশ্বাসই হচ্ছে না যেন উপেন গুছাইতের।

ভোরবেলা এই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল শুভঙ্করীর। ভোর মানে কাকভোর। সে দেখল তার শরীরে এতটুকু সুতো নেই, পাগলের শরীরেও তাই। নগ্ন সে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে পাগলকে। তার আলিঙ্গনাবদ্ধ মানুষটা ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে, মুখটা হাঁ হয়ে আছে একটু। নিজের মুখে, গলায় হাত বুলাল শুভঙ্করী। কাল রাতে একদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি দিয়ে মুখ, গলা, বুক সব ঘষে দিয়েছে পাগল, তাই জ্বালা জ্বালা করছে এখন।

অদ্ভুত স্বভাব তার। পাগল তার স্তনবৃন্ত ছিঁড়ে নেওয়ার উপক্রম করলেও সে হাসে, না হেসে পারে না, আর পাগল ভাবে সে মজা পাচ্ছে। ভেবে আরও তাণ্ডব করে মানুষটা। সামলানো দায় হয় তার পক্ষে। যমুনা বলে, বাঁজা মেয়েমানুষের শরীর নাকি অনেক বেশি শক্তপোক্ত। তাই হবে নিশ্চয়ই। নইলে এমন উন্মাদের দুর্বিনীত আদর শুভঙ্করী সহ্য করছে কী করে? যত দিন যাচ্ছে সময় বেড়ে যাচ্ছে পাগলটার, মাথার কাছে চক্রাকারে ঘুরে যাচ্ছে ঘড়ির কাঁটা।

অন্য দিন শুভঙ্করী সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় একতলায়। কাল রাতে সে ঘুমিয়ে পড়ল এখানেই। আসলে মনের কোনায় তেমন ভয় ছিল না তার কাল আর। দু'দিন পরে দুগ্গাপুজো। পুজোর আগেই নিজের বাড়ি ফিরে গিয়েছে কঙ্কাবতী, চিরকালের মতো। বাপ-মায়ের মুখ চেয়ে মেয়েটা চেষ্টা করেছিল থাকতে, স্বামীর ঘর করতে; কিন্তু সবার মধ্যে তো পাগলকে ভালবাসার, গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই, থাকে না। আর ছোটখোকা তো সত্যিই স্বাভাবিক নয়! মাঝে মাঝে চুপচাপ, উদাস, ঘর থেকে বেরোয় না। কারও সঙ্গে কথা বলে না। বউভাতের দিন থেকে কঙ্কাবতী সেই যে সিঁটিয়ে গেল তো গেলই। কিছুতেই ভাব হল না দু'জনের। বেড়াতে যাওয়ার টিকিট ফিকিট সব কাটা ছিল—কঙ্কাবতী গেলই না। তারই মধ্যে বড়খোকা একদিন গেট খোলা পেয়ে নেমে এসে কঙ্কাবতীকে দেখে এমন কাণ্ড করল যে, ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল মেয়েটা। এই ক'মাস মেয়েটা শুধু গোপনে চোখের জল ফেলেছে। যাওয়ার সময় গিন্নি বললেন, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু ঘরবাড়ি সব তোমার। এই সংসার তোমার। যে দিন মনে হবে সে দিনই ফিরে আসতে পারো। তোমার জন্যে এ বাড়ির দরজা চিরকাল খোলা থাকবে। আমি লেখাপড়া করে রেখে যাব।" কঙ্কাবতী শুনেছে। একটাও শব্দ উচ্চারণ করেনি, একবারও ফিরে তাকায়নি। প্রতিমা ফিসফিস করে বলেছিল, "স্বামী জিনিসটা কী তাই বুঝল না মেয়েটা তো ঘরবাড়ি! টাকাপয়সার টান সবার থাকে না। একটা দিনও ছোটবউয়ের গলা দিয়ে ভাত নামেনি। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতাম খাওয়ার সময়।"

কঙ্কাবতী নেই, থাকলেও লক্ষ করত না। আর হেনাও পুজোর ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে। যমুনাকে শুভঙ্করীর ভয় নেই, যমুনা সব জানে। পাগলের সঙ্গে তো সম্পর্ক তৈরি হয় না সুস্থ মানুষের। শুভঙ্করী সেটা টের পায়, তবু তাকে কাছে পেলে শান্ত থাকে বড়খোকা। ইদানীং তার আঁচলে থাকে কোলাপসিবল গেটের চাবি। সে আসে-যায়, ঢোকে, কাজ করে, পাগলকে খাওয়ায়। নিজের মনে গান গায় পাগল। কখনও তাকে দেখে, কখনও দেখে না; কখনও কথা বলে, কখনও বলে না; কখনও খোঁজে, কখনও খোঁজে না—তবু সে জানে যে পাগল তার, গোটা একটা মানুষ—তার! তার নিজস্ব!

এই বোধ নিয়ে, এই উপলব্ধি নিয়ে ভয়হীন, কান্নাহীন, বেদনাহীন শুভঙ্করী উঠে বসল বিছানায়। জানলা সব বন্ধ আঁট করে, তবু খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একটু একটু বোঝা যাচ্ছে ভোর হয়েছে। পাগলের ঘরে কোনও পরদা নেই, চাদির ওপর চাদর পাতা হয় না, ফ্যান খুলে নেওয়া হয়েছে। ইলাস্টিক দেওয়া পাজামা পরে পাগল। ঠেলেঠুলে পাজামাটা পরিয়ে দিল শুভঙ্করী মানুষটাকে। তারপর গুছিয়ে নিল নিজেকেও। এবার সে নীচে যাবে। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারবে। তারপর বেরোবে পাড়ায়। একটু বেলা বাড়লেই এসে পড়বে দুগ্গাঠাকুর। কেমন ঠাকুর, কেমন করে ঠাকুর তোলা হবে বেদিতে, এসব দেখার তার ইচ্ছে খুব। দেখার স্বভাবটা তার এখনও যায়নি। এখনও সে রাস্তায় বেরোলে এ দিক সে দিক চলে যায়। লোকজন, বাজার-

দোকান, মিটিং- মিছিল, ঝগড়া কাজিয়া, পুলিশ, ভিখিরি, বড়লোকের লোমওয়ালা কুকুর সবই দেখে হাঁ করে। তারপর আবার পাগলের কথা মনে পড়ে যায় তার—সে তখন বাড়ির পথ ধরে।

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

প্যান্টি ও অন্যান্য গল্প

যোগিনী

রুহ্‌

শঙ্খিনী